পাতালঝড়

অনীশ দেব

পাতালঝড়

অনীশ দেব

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

pathagar.net

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১৩

pathagar.net

—একশ টাকা—

প্রচ্ছদপট
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নামপত্র অলঙ্করণ
বিজন কর্মকার

PATALJHAR

A novel by Anish Deb. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 100/-

ISBN : 81-7293-918-3

শব্দগ্রন্থন
লেজার বাইট, ৭ কামারডাঙ্গা রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কতৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭২ শিশির ভাদুড়ি সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে প্রদীপকুমার বদ্যোপাধ্যায় কর্তক মুদ্রিত

গৌতম সরকার
সতী সরকার
পইমি সরকার

প্রিয়জনেষু—

pathagar.net

pathagar.net

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই উপন্যাসের তথ্য সংগ্রহের কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। যেমন, পুলিশি তদন্ত, ইন্ডিয়ান পিনাল কোড ও আইন-আদালত সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে বইপত্র এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন নিষ্ঠাবান, সৎ পুলিশ অফিসার এবং সাহিত্যিক মনোতোষ মিশ্র, আর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অলোকেন্দু মুখার্জি। এ ছাড়া ডাক্তারি তথ্যের জন্য হাত পেতেছি নিকট-আত্মীয় সায়ন্তন পালের কাছে— যে আর বছরখানেক পরে ডাক্তারি পড়া শেষ করবে।

আপনাকে বলছি

২০০৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত 'পাতালঝড়' 'নবকল্লোল' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বই হয়ে বেরোনোর সময় আদ্যন্ত সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদি সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছি। এই কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আরতি বসু। ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই সুযোগে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অরুণকুমার মজুমদার ও প্রবীরকুমার মজুমদারকে। ওঁদের ইচ্ছে আর উৎসাহ আমাকে এই উপন্যাসটি লেখার সুযোগ করে দিয়েছে। না হলে এই উপন্যাস কখনও লেখা হত কি না কে জানে!

আর সবশেষে আগাম ধন্যবাদ আপনাকে যিনি কোনও-না-কোনও সময় আমার কোনও-না-কোনও লেখা পড়েছেন। এবং 'পাতালঝড়' পড়বেন।

আর যদি 'পাতালঝড়'ই আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগের প্রথম লেখা হয়, তা হলে সবিনয়ে জানতে চাইব, গত দশবছর আপনি কোথায় ছিলেন?

pathagar.net

pathagar.net

লেখকের অন্যান্য বই

অন্তরে পাপ ছিল
অশরীরী অলৌকিক
মার্ডার ৬ট কম
বইল না আর কেউ

পা তা ল ঝ ড়

pathagar.net

ঘটনাটা যখন ঘটে তখন সুচরিতা বাড়িতে একা ছিল। পরমেশ, প্রমিতা, বুবু—ওরা কেউ ছিল না।

পরমেশ ওর মারুতি গাড়ি নিয়ে নিউ মার্কেটে গিয়েছিল—সঙ্গে ছিল বুবু। আর প্রমিতা হাতিবাগানে গিয়েছিল দুটো ফুলের তোড়া কিনতে।

সুচরিতা বাড়িতে বেশ ব্যস্ত ছিল। রঙিন কাগজের ফুল, বেলুন, রুপোলি কাগজের ফিতে এইসব দিয়ে ড্রইংরুমটা সাজাচ্ছিল। একটা খাটো টুল নিয়ে তাতে উঠে দাঁড়িয়ে সেলোটেপ দিয়ে কাগজের অলংকারগুলো দেওয়ালে, সিলিং ফ্যানে, জানলার গ্রিলে—নানা জায়গায় আটকে দিচ্ছিল।

একঘেয়ে ভাবটা কাটাতে বেশ জোরালো ভলিয়ুমে এফ. এম. চ্যানেল চালিয়ে দিয়েছিল সুচরিতা। তাতে হিন্দি গান বাজছিল, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে প্রেজেন্টার নানারকম গলা করে হাই স্পিডে মজার-মজার কথা বলছিল। গানের মাঝে বিজ্ঞাপনের ব্রেক এলেই প্রেজেন্টার ছেলেটি অদ্ভুত গাঢ় গলায় বলছিল, 'অ্যাই, কোথাও যেয়ো না, প্লিজ। সঙ্গে থাকো। একটু পরেই তোমাদের সামনে আসছে...।'

এই কথা শুনে সুচরিতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠছিল, 'কোথায় আবার যাব! তোমার সঙ্গেই তো আছি!'

সুচরিতার খুব শখ ও এফ এম চ্যানেলে প্রেজেন্টার হবে, তারপর টিভিতে—'ডি জে' অথবা 'ভি জে'। তাই মাঝে-মাঝেই ও প্রেজেন্টারের সঙ্গে গলা নকল করে কায়দাটা প্র্যাকটিস করছিল।

ঘর সাজানোর কাজের মধ্যেই ওর চোখ বারবার ছিটকে চলে যাচ্ছিল দেওয়ালের কোয়ার্টজ ঘড়ির দিকে।

সাড়ে ছ'টা প্রায় বাজে। হয়তো সাড়ে সাতটা থেকেই গেস্টরা আসতে শুরু করবে। তাই তাড়াতাড়ি হাত চালাল সুচরিতা।

আজ বুবুর জন্মদিন।

না, ঠিক-ঠিকভাবে বলতে গেলে জন্মদিনটা গেছে গত শুক্রবার। আজ রোববার সেইজন্য গেট টুগেদার। অতিথির সংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। সব মিলিয়ে জনা-কুড়ি। বুবুর স্কুলের পাঁচজন বন্ধু, আজ তাদের বাবা-মা। সুচরিতার তিনজন বন্ধু। আর ছোটকাকা, ছোটমাসি, ছোটমেসো। মেজোমাসিরা কলকাতায়

pathagar.net

নেহ মুম্বই গেছে তাই আসতে পারবে না।

সব সাজানোর কাজে সেই বিকেল থেকেই প্রমিতা সুচরিতার সঙ্গে হাত লাগিয়েছিল। দেখে পরমেশের মনে হচ্ছিল, মা-মেয়ে নয়—দু-বোন যেন প্রবল উৎসাহে সাধারণ মেয়েটাকে সাজগোজ করিয়ে অসাধারণ করে তুলতে চাইছে।

পাঁচ বছরের বুবু দিদি আর মায়ের ফরমাশ খাটছিল। আর পরমেশ ঘরের এককোণে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বউ আর মেয়েকে টুকটাক জ্ঞান দিচ্ছিল—যদিও ওরা কেউ পাত্তা দিচ্ছিল না।

সুচরিতা আর প্রমিতা মাঝে-মাঝেই নানান কথার ফাঁকে-ফাঁকে খিলখিল করে হেসে উঠছিল। মাস-খানেক আগে পাড়ার এক বন্ধু রিঙ্কির জন্মদিনের ফাংশানে গিয়ে সুচরিতা একটা কাণ্ড করে বসেছিল। সেটা নিয়েও মা আর মেয়ে হাসাহাসি করছিল।

রিঙ্কির বয়েস সুচরিতার মতোই—সতেরোর এদিক-ওদিক। ওর বাবা-মা দুজনেই চাকরি করে। বাবা 'ফ্রেঞ্চ কসমেটিক্স'-এর মার্কেটিং ম্যানেজার, মা 'নেক্সাস মোবাইল'-এর এক্সিকিউটিভ। রিঙ্কি সামনের বার 'লা মার্ট' থেকে আই. এস.সি. দেবে। ওর খুব ইচ্ছে, ফ্যাশন ডিজাইনার হবে। তাই সেভাবেই নিজেকে তৈরি করতে চেষ্টা করে। ওর হাঁটা-চলা, কথা বলা, সবটাই অন্যরকম।

সেই রিঙ্কির জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিল সুচরিতা। অন্য গেস্টদের মাঝে নিজেকে ভীষণ বেমানান লাগছিল ওর। সবাই কলকল করে ইংরেজিতে কথা বলছিল। সুচরিতা সেসব কথার অর্থ বুঝতে পারলেও ইংরেজি বলার অনভ্যাসের জন্য ওকে চুপ করে থাকতে হচ্ছিল। তাই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

দু-চারজন পুরুষ ওর কাছে এগিয়ে এসে আলাপ করার চেষ্টা করছিল। একটি সুপুরুষ ছেলে তো প্রায় গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলেই বসল, 'হু আর য়ু? সিন্ডারেলা, অর মোনালিজা?'

সুচরিতা হাতটা মোলায়েমভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি সুচরিতা—রিঙ্কির বন্ধু।'

'ও, আই সি—' ছেলেটি রিঙ্কির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল, 'রিঙ্কি, হু ইজ দিস এঞ্জেল?'

রিঙ্কি একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, 'ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস, অঞ্জন। শি ইজ সুচরিতা।'

চোখ বড় বড় করে অঞ্জন বলেছিল, এতদিন ওর ধারণা ছিল, এইরকম সাঙ্ঘাতিক সুন্দরীরা শুধুমাত্র স্বপ্নেই দেখা দেয়।

সুচরিতা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে ভালোও যে লাগেনি তা নয়।

pathagar.net

ছোটবেলা থেকেই ওকে সবাই সুন্দর বলে। বলে, ও নাকি শো-কেসের ডল পুতুলের মতো দেখতে। তাই এসব শোনা ওর অভ্যেস আছে। তবে অরিন যখন ওকে বলে, 'সুচরিতা, তুই কি জানিস, তোকে কী দারুণ দেখতে!' তখন ওর গায়ে কাঁটা দেয়।

সেদিন রিঙ্কি অনেকের সঙ্গে সুচরিতার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

ওইরকম একটা আনন্দময় হইহই পরিবেশে বার্থ-ডে কেক কাটার আয়োজন শুরু হল। রিঙ্কি যখন অতিথিদের উজ্জ্বল চোখের সামনে বার্থ-ডে কেক কাটছে, সুচরিতা তখন কেকের চারপাশে সাজানো রঙিন মোমবাতিগুলো গুনছিল।

এরপর সবাই যখন সুর করে 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু য়ু' বলতে শুরু করল তখন নেহাতই বেরসিকের মতো সুচরিতা 'রিঙ্কি, রিঙ্কি—থাম, থাম! একটা মোমবাতি কম আছে রে!' বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

সতেরোটা হওয়ার কথা...সে-জায়গায় মোমবাতি মাত্র ষোলোটা!

সুচরিতার চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে উৎসবের তাল কেটে গিয়েছিল।

রিঙ্কির মা পারফিউমের ঝাপটা তুলে চলে এল সুচরিতার সামনে। চোখ সরু করে তেরছাভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ভুল করছ, ডিয়ার। ক্যান্ড্‌ল ঠিকই আছে। রিঙ্কি ইজ ওনলি সিক্সটিন!'

রিঙ্কির মুখ-চোখ লালচে হয়ে গিয়েছিল। রিঙ্কির বাবা বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল—চোয়াল শক্ত।

সুচরিতা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। অনেক দেরিতে ও বুঝতে পেরেছিল, মোমবাতির ব্যাপারটা মোটেই ভুল নয়—বরং জনগণের কাছে রিঙ্কির বয়েস কমানোর অভিসন্ধি!

সেই দমবন্ধ-করা অস্বস্তিকর মুহূর্তে অঞ্জন হঠাৎ হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কাম অন, ফোক্‌স, সিক্সটিন ইজ সুইটার দ্যান সেভেনটিন। হ্যাপি বার্থ-ডে টু য়ু...।'

সুর করে শুভেচ্ছা-সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছিল অঞ্জন। সঙ্গে আর সবাই।

সেইদিনের পর থেকে রিঙ্কির সঙ্গে বন্ধুত্বে কোথায় যেন চিড় ধরে গিয়েছিল। অথচ সুচরিতা ওকে অপমান করার জন্য মোমবাতির কথাটা বলেনি। ও স্পষ্ট সোজাসাপটা কথা বলাটাই পছন্দ করে। সেইজন্যই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু রিঙ্কি সেটা বুঝতে চায়নি।

এইজন্যই প্রমিতা প্রায়ই বলে, 'তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

এখন সেই পুরোনো কথা নিয়ে দুজনে হাসাহাসি করছিল। সুচরিতা বলল,

pathagar.net

'মাম, তুমি যেন আবার মোমবাতি কমিয়ে বুবুর বয়েস কমিয়ে দিয়ো না!'

তখন হঠাৎই পরমেশের মনে পড়ে গিয়েছিল, নিউ মার্কেটের দোকান থেকে বুবুর বার্থ-ডে কেকটা নিয়ে আসতে হবে। তিনদিন আগেই ওটা অর্ডার দেওয়া ছিল।

পরমেশ চট করে চলে গেল বেডরুমে। সেখানে একটা জানলা ঘেঁষে ওর পড়াশোনার টেবিল। টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে ও কেকের দোকানের কার্ডটা বের করল। তারপর বিছানার পাশে রাখা সাইড টেবিলের কাছে গেল। টেবিলে বসানো টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ফোন করল কেকের দোকানে। বলল, ও আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। কেকটা যেন রেডি করে রাখা হয়।

ড্রইংরুমে এসে কেক-কাহিনি প্রমিতাকে বলেই সদর দরজার দিকে প্রায় ছুট লাগাল পরমেশ।

কিন্তু যা ভেবেছিল তাই! ঘর সাজানোর কাজ থামিয়ে প্রমিতা একরকম চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যি, তোমার আক্কেল বলে কিছু নেই। আসল কাজটা ভুলে মেরে দিয়ে তখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছ! দ্যাখো তো, আমার যা-যা দায়িত্ব ছিল সেগুলো কেমন পরপর কমপ্লিট করে দিয়েছি!'

মাকে থামাল সুচরিতা। বলল, 'মাম, তুমি তো জানো, মাস্টারমশাইরা একটু অন্যমনস্ক হয়। বাপি সারাদিন অনেক কাজ করে—তো একটা ভুল হতেই পারে...।'

প্রমিতা সুচরিতাকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'আগে বল তুই কার দলে! এত বড় একটা ভুল, আর তুই তোর বাবার হয়ে ওকালতি করছিস!'

বুবু দৌড়ে এসে প্রমিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাম, আমি তোমার দলে।'

পরমেশ দু-হাতের বুড়ো আঙুল শূন্যে তুলে নাড়াল। হেসে বলল, 'বুঝেছি, তোরা সব মামের দলে। বাপির দলে কেউ নেই। দাঁড়া, আমাকেও একটা প্ল্যান কষতে হবে। আগে কেকটা নিয়ে আসি....।'

বুবু মাকে ছেড়ে ছুট্টে গেল ওর বাবার কাছে। পরমেশের ডানহাতটা আঁকড়ে ধরে বলল, 'বাপি, আমি তোমার সঙ্গে কেক আনতে যাব।'

পরমেশ ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে নকল শাসানির ঢঙে আঙুল তুলে বলল, 'আগে বল তুই কার দলে?'

বুবু দাঁত দিয়ে বাঁহাতের নখ কাটছিল। মায়ের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মিনমিন করে বলল, 'এখন তোমার দলে।'

পরমেশ ওকে কোলে তুলে নিয়ে জাপটে ধরল। ওর গালে চুমু খেয়ে বলল,

'পরে আবার দল বদল করবি না তো!'

পরমেশের কাঁধে মুখ গুঁজে বুবু বলল, 'কেক আনার পর আবার মামের দলে চলে যাব।'

সুচরিতা হাততালি দিয়ে উঠল।

প্রমিতা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

পরমেশ কপট হতাশায় মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, এই বিচ্ছু ফ্যামিলিতে আমার জেতার কোনও আশা নেই।'

বুবুকে কোল থেকে নামিয়ে হাত ধরে টান মারল পরমেশ : 'তাড়াতাড়ি চল, দেরি হয়ে যাবে।' দরজা থেকে ফিরে তাকাল ও : 'প্রমি, আমি যাব আর আসব। হার্ডলি ফরটি টু ফিফটি মিনিট্স। রিতু, চটপট হাত চালিয়ে ডেকরেশান কমপ্লিট কর। যদি সাজানো ভালো হয়, তা হলে তোকে একটা প্রাইজ দেব।'

'প্রাইজ আমি আদায় করেই ছাড়ব—দেখো।' হেসে জবাব দিল সুচরিতা।

পরমেশ ভেবেছিল, ও আর বুবু চলে যাওয়ার পর বাড়িতে মা আর মেয়ে থাকবে।

কিন্তু সেটা হয়নি।

কারণ, প্রমিতাকে হঠাৎ বেরোতে হয়েছে হাতিবাগানে।

কাগজের রঙিন ফুল, ফিতে, কাঁচি আর গঁদের আঠা নিয়ে কাজ করছিল সুচরিতা। মাঝে-মাঝে উঠে গিয়ে ঘর সাজানোয় মাকে সাহায্য করছিল। কাঁচি আর আঠার কাজ শেষ করে ও ওয়াশ-বেসিনে সাবান দিয়ে হাত ধুতে গেল।

হঠাৎই ওর মনে হল, ড্রইংরুমে ঢোকার দরজার দুপাশে দুটো ফুলের তোড়া সাজালে হয়। নইলে জায়গাটা কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগছে।

ব্যস! হুজুগ তুলতে সুচরিতার জুড়ি নেই। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে ওর আবদার।

'মাম, চলো, হাতিবাগান থেকে চট করে দুটো ফুলের বুকে কিনে নিয়ে আসি।'

প্রমিতা বলল, 'দুজনে বেরিয়ে গেলে তো মুশকিল। যদি গেস্টদের কেউ একটু আগে চলে আসে! তুই-ই তো কাল বলছিলি, সরিতা....।'

মাকে থামিয়ে দিয়ে সুচরিতা বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ তো! সরিতা বলছিল, আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে তারপর ওদের বালিগঞ্জের দিকে কোথায় যেন যাওয়ার আছে—তাই ও একটু তাড়াতাড়ি আসবে....।'

'তা হলে তুই যা, তোড়া দুটো নিয়ে আয়—আমি বাড়িতে থাকি।'

'ধ্যাৎ, তা কখনও হয় নাকি!' হাত নেড়ে বলে উঠল সুচরিতা, 'আমার

pathagar.net

বন্ধু আসবে, আমি না থাকলে কখনও হয়! তার চেয়ে তুমি যাও। দেরি করবে না কিন্তু—যাবে আর আসবে—ফটাফট।'

pathagar.net

সুতরাং প্রমিতাকেই বেরোতে হয়েছে। বেরোনোর আগে মেয়েকে বারবার সাবধান করেছে ও: 'সাবধানে থাকবি। ভালো করে না দেখে হুটহাট করে দরজা খুলে দিবি না।'

সুচরিতা হেসে ফেলেছে। ওকে নিয়ে মামের সবসময় ভীষণ চিন্তা। ও যে বড় হয়ে গেছে সেটা মাম কিছুতেই মানতে চায় না।

তাই ও হাত তুলে মাকে অভয় দিয়ে বলল, 'আরে বাবা তুমি যাও তো! কোনও চিন্তা নেই। তবে দেরি কোরো না কিন্তু!'

সুতরাং বাড়িতে সুচরিতা একা হয়ে গেল।

এ-পাড়াটায় যে সেরকম ভয়ের কিছু আছে তা নয়। তবে একটু নির্জন। সামনের রাস্তাটায় গাড়ি চলে খুব কম। লোকজন যারা চলাফেরা করে তারা বেশিরভাগই পাড়ার লোক। তাই অচেনা কোনও লোক পাড়ায় ঢুকলে সে সকলের চোখে পড়ে যায়।

সুচরিতাদের বাড়িটা পরেশনাথ মন্দিরের খুব কাছাকাছি। বাড়ির উলটোদিকেই দুটো বড়-বড় গোডাউন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে গেলেই মানিকতলা খাল। খালধারে ছ'-সাত মাস আগেও অসংখ্য ঝুপড়ি ছিল—এখন প্রায় নেই বললেই চলে। সরকারি চেষ্টায় মাটি কেটে খালটাকে অনেক গভীর করা হয়েছে, চওড়াও করা হয়েছে বেশ—কিন্তু তাতে বর্ষার জল জমে এখন ঘোলাটে নদীর চেহারা নিয়েছে। ঝুপড়ি উচ্ছেদ করার পর থেকে খালধারের রাস্তাটা সত্যি ভীষণ নির্জন হয়ে গিয়েছে।

সুচরিতাদের বাড়িটা দোতলা, তবে ওই নামেই। দোতলার ছাদের একপাশে একটা দশ বাই আট চিলেকোঠা—সেখানে সুচরিতার আস্তানা। আর একতলায় পুরোনো ধাঁচের আড়াইখানা ঘর।

বেখাপ্পা চেহারার এই বাড়িটাকে পরমেশ ভেঙেচুরে সারিয়ে একেবারে নতুন করে নিতে পারেনি, তবে ঘরগুলোর ভেতরটা যতটা পেরেছে সংস্কার করে সাজাতে চেষ্টা করেছে। অবশ্য সাজিয়ে তোলার আসল কাজটা প্রমিতাই করেছে। তখন সুচরিতার বয়েস চার কি পাঁচ বছর।

প্রমিতা চলে যাওয়ার পর ড্রইংরুমের দরজা বন্ধ করে দিল সুচরিতা। এই দরজা দিয়ে বেরোলেই বেশ চওড়া খানিকটা বারান্দা। বারান্দায় গ্রিল বসানো। তার গায়ে লাগানো কোলাপসিব্‌ল গেট। শুধু রাতে কোলাপসিব্‌ল গেট টেনে বন্ধ করে তাতে তালা দেওয়া হয়—অন্য সময় গেটটা খোলাই থাকে। এখনও খোলাই ছিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রমিতার একবার মনে হল, সুচরিতাকে কোলাপসিব্‌ল গেটটায় তালা দেওয়ার কথা বললেই ভালো হত। পথ চলতে-চলতে হঠাৎ করে একবার দাঁড়িয়েও পড়েছিল ও। কিন্তু তারপরই ভাবল, এই তো, সামনের বড় রাস্তা থেকে অটো ধরে হাতিবাগান যাবে আর আসবে। কতক্ষণই বা লাগবে তাতে!

সে-কথা ভেবে প্রমিতা আবার হাঁটতে শুরু করেছিল বড় রাস্তার দিকে।

বড় রাস্তাটা ওদের বাড়ি থেকে খুব কাছে নয়। প্রায় এক-দেড়খানা বাস স্টপের দূরত্ব হবে। রোজ এই পথ দিয়ে ওরা হাঁটাচলা করে বলে দূরত্বটা আর তত বেশি মনে হয় না। সুচরিতার কথা ভাবতে-ভাবতে তাড়াতাড়ি পা চালাল প্রমিতা।

মা বেরিয়ে যেতেই এফ. এম. চ্যানেল চালিয়ে দিয়েছিল সুচরিতা। একইসঙ্গে সেলোটেপ নিয়ে ঘর সাজানোর বাকি কাজে হাত দিয়েছিল। বাড়িতে ও একা আছে বলে ওর মনের মধ্যে কোনওরকম ভয়-ডর কাজ করেনি।

একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে কাগজের একটা ফুল ঠিকঠাক করে বসাচ্ছিল সুচরিতা, ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠল।

ও একলাফে নেমে পড়ল টুল থেকে। রেডিয়োর গানের তালে-তালে মাথা নেড়ে প্রায় দৌড়ে পৌঁছে গেল টেলিফোনের কাছে।

দেওয়াল ঘেঁষে একটা ছোট্ট টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা রয়েছে। তার ওপরে লেসের কারুকাজ করা ঢাকনা চাপা দেওয়া। ঢাকনা সরিয়ে রিসিভার তুলে নিল সুচরিতা।

'হ্যালো—।'

'রিতু, বাপি বলছি।' পরমেশের গলা শোনা গেল টেলিফোনের ও-প্রান্তে। মোবাইল ফোন থেকে ফোন করেছে বাড়িতে।

'বলো।'

'শোন, কেক নেওয়া হয়ে গেছে। ফ্যান্টাস্টিক বানিয়েছে। বুবুর খুব পছন্দ হয়েছে। তুই দেখলে একেবারে চমকে যাবি।'

'তাই? আমার এক্ষুনি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'এই তো, আমরা এখনই ব্যাক করছি। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। মাকে একটু দে।'

'মাম নেই—এইমাত্র হাতিবাগানে গেছে।'

'কেন রে?'

'দুটো ফুলের তোড়া আনতে...।'

pathagar.net

'নিশ্চয়ই তুই পাঠিয়েছিস!'

উত্তরে খিলখিল করে হেসে উঠল সুচরিতা।

পরমেশও হাসল ও-প্রান্তে। তারপর বলল, 'সাবধানে থাকিস। আমরা জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার তার মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

'ও কে ড্যাড।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

পরমেশের সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পরই সুচরিতার মনে হল, অরিনকে একটা ফোন করলে হয়। ওর কাছ থেকে ইংলিশের কিছু নোট্‌স নেওয়ার আছে। ওরা দুজনে একই ইংলিশ কোচিং-এ পড়ে—মানিকতলার কাছাকাছি। গত বুধবার সুচরিতার জ্বর মতন হয়েছিল, তাই কোচিং-এ যায়নি, আর নোট্‌সগুলোও অরিনের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি।

অবশ্য এসব কথা ও ভাবছে অরিনের বাবা কিংবা মায়ের জন্য—ওঁরা কেউ ফোন ধরলে এসব নোট্‌স-এর কথাই বলবে। আর অরিন যদি ফোন ধরে...।

টেলিফোনের বোতাম টিপে রিসিভার কানে চেপে ধরল সুচরিতা।

অরিন ফোন ধরল।

সুচরিতা চট করে কী বলবে ভেবে না পেয়ে নোট্‌স-এর কথাই বলতে শুরু করল।

ওপাশে অরিন বলল, 'এসব বাজে কথা বলার জন্যে ফোন করেছিস? আমি ফোন রেখে দিচ্ছি।'

'বাজে কথা মানে? নোট্‌সগুলো দরকার বলেই বলছি।'

'তোকে লাস্ট থার্সডে বললাম না, নেক্সট বুধবার ওগুলো নিয়ে নিবি! সেসব ভুলে গেছিস? যাকগে, ভালো কথা কিছু বলার থাকলে বল।'

'ভালো কথা মানে?'

'যে-কথা শুনতে আমার ভালো লাগবে।'

সুচরিতার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। দু-আড়াই মাস আগেও এরকম করে উঠত না।

'কী কথা?'

'তুই কি জানিস, তোকে কী দারুণ দেখতে?'

'না, জানি না—জানতে চাই না।' সুচরিতার গায়ে কাঁটা দিল। ওর বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা শব্দ শুরু হল।

'তুই জানতে চাস না?' হেসে জিগ্যেস করল অরিন, তারপর বলল, 'কিন্তু আমি জানাতে চাই। শুধু তোকে নয়, সব্বাইকে।'

'তাতে কী লাভ?'

'লাভ-ক্ষতি জানি না। শুধু জানাতে ইচ্ছে করছে, তাই।'

'আমি ফোন রেখে দিচ্ছি।' নকল রাগ দেখাল সুচরিতা।

'না, না—শোন। তোকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। সবসময় দেখতে ইচ্ছে করে।'

সুচরিতা চুপ করে রইল।

অরিন বলল, 'অ্যাই, জানিস, টেলিফোনের ভেতর দিয়ে আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি।'

'ধ্যাৎ।'

'হ্যাঁ। তুই একটা গ্রিন চুড়িদার পরে আছিস। কপালে টিপ। আর....।'

হেসে ফেলল সুচরিতা। বলল, 'হোপলেস! শুধু টিপটা মিলেছে। আর সব বাজে কথা। ফোন রেখে দিচ্ছি—মাম এসে যাবে এক্ষুনি।'

'ও. কে., বুধবার তা হলে দেখা হচ্ছে।'

আজকের গেট টুগেদারে অরিনকে বলতে পারেনি সুচরিতা। বললে বাপি বা মাম হয়তো পঞ্চাশটা প্রশ্ন করত। অথচ অরিন এলে ওর খুব ভালো লাগত।

দু-পাঁচ সেকেন্ড যেতে-না-যেতেই ফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলল সুচরিতা।

পরমেশ ফোন করেছে আবার।

'অ্যাই, রিতু, আমরা জ্যামে ফেঁসে গেছি। "হিন্দ" সিনেমার পর থেকে বউবাজার পর্যন্ত জ্যামে ঠাসাঠাসি। কী-একটা মিছিল নাকি বেরিয়েছে।'

'তোমরা এখন কোথায়?'

'কোনওরকমে গুটিগুটি করে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত এসেছি। তোর মা ফিরেছে?'

'না, তবে এক্ষুনি মনে হয় এসে পড়বে—।'

ঠিক তখনই দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল।

'মাম বোধহয় এসে পড়েছে। এক মিনিট...।' রিসিভারটা টেলিফোনের পাশে নামিয়ে রেখে দরজার দিকে পা বাড়াল সুচরিতা।

পরমেশ তখন ফোনে চেঁচাচ্ছে, 'কী হল? দেখেশুনে দরজা খুলিস। তোর...।'

এই কথাগুলো সুচরিতার কানে যায়নি। ও এফ এম চ্যানেলের প্রেজেন্টারের ঢং নকল করে বলল, 'ছোট্ট একটা ব্রেক নিচ্ছি, বাপি। প্লিজ, কোথাও যেয়ো না—সঙ্গে থাকো।'

pathagar.net

চটপটে পা ফেলে দরজার কাছে এগিয়ে যেতে-যেতে সুচরিতা ভাবল, মাম কি চটজলদি ফুলের তোড়া কিনে ফিরে এল হাতিবাগান থেকে? নাকি সরিতা এসে গেল সবার আগে, মাতৃতাড়াতাড়ি?

কিন্তু সরিতা বলেছিল, সাতটা নাগাদ আসবে। সাতটা বাজতে তো এখনও প্রায় কুড়ি মিনিট দেরি!

তা হলে কে এল এখন?

মাম, না সরিতা?

প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে মনে-মনে একটা কয়েন টস করল সুচরিতা। কয়েনটা শূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে নেমে আসছিল ওর হাতের তালুর দিকে।

মাম, না সরিতা? সরিতা, না মাম?

আসলে মাম বা সরিতা—কেউই আসেনি। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল তৃতীয় একজন ব্যক্তি—সুচরিতার নিয়তি।

দুই

বন্দোবস্ত সব শেষ। এবার আসল কাজ শুরু। নাটকের সেট সাজানোর পর শিল্পনির্দেশক আর পরিচালক যেভাবে সেটটাকে জরিপ করে, নাটক শুরু করার আগে যেভাবে শেষবারের মতো দেখে নেয়, সুদেব সামন্ত ঠিক সেইভাবে ব্যাপারটা জরিপ করতে লাগল। মেঝেতে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে একমনে দেখতে লাগল।

ঘরের সিলিং-এর নীচে বেশ বড়সড় কাঠের লফ্‌ট। লফ্‌টের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে রয়েছে কয়েকটা মরচে-ধরা পেরেক আর হুক। নানা সময়ে ওগুলো কাজে লাগে। যেমন এখন লাগছে।

সেইরকমই একটা হুক থেকে টান-টান হয়ে ঝুলছে সুপার এনামেল কোটিং দেওয়া বাইশ গেজের একটা তামার তার। টিউবলাইটের ফ্যাকাশে আলোতেও ঝকঝক করছে। ফুটচারেক লম্বা তারটার নীচে বাঁধা রয়েছে একটা ছোট স্টিলের ক্যান। ক্যানটা মাঝে-মাঝেই নড়ছে, দুলছে। কারণ, ঢাকনা বন্ধ ক্যানটার ভেতরে রয়েছে একটা ইঁদুর। যাতে ওটার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কোনও কষ্ট না হয়, সেইজন্য ঢাকনায় কয়েকটা ফুটো করা রয়েছে।

সুদেব ক্যানটার দিকে চকচকে চোখে তাকিয়ে ছিল—যেন ওর খিদে পেয়েছে।

আসলে খিদে তো বটেই! এক অদ্ভুত খিদে—পেটের খিদের চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক।

হাতের নাগালে রাখা গরম তাতালটা তুলে নিল সুদেব। এইবার আসল খেলা শুরু।

তাতালটা যথেষ্ট গরম হয়েছে কি না সেটা বোঝার জন্য ওটা নিয়ে একটা টিনের পাতের ওপরে রাখা রজনের ডেলায় ঠেকাল সুদেব।

ধোঁয়া বেরোল। রজনের ডেলা খানিকটা গলে গেল। রজনের অদ্ভুত পোড়া গন্ধ সুদেবের নাকে এল।

খুশি হল সুদেব। নিঃশব্দে হাসল। ওপরের দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। দুষ্টুমির চোখে তাকাল স্টিলের ক্যানটার দিকে। তারপর গরম তাতালটা ধীরে-ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেল। ক্যানটার গায়ে ওটা ঠেকিয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ক্যানটা প্রবলভাবে ঝটকা মেরে নড়ে উঠল। ওটার ভেতর থেকে কিচকিচ শব্দ ভেসে এল। তামার তারটা হুকের গায়ে ঘষা খেতে লাগল বারবার।

তাতালটা এবার ক্যানের তলায় ঠেকাল সুদেব। নেশা-ধরা চোখে লক্ষ করতে লাগল ক্যানটাকে। ওটা এখন পাগলের মতো নাচছে, আর নাচছে।

হাতকয়েক দূরে একটা পুরোনো টেবিল-পাখা ঘুরছিল। বেঁকাট্যাড়া ব্লেডগুলো

BanglaBook.org

বোধহয় পাখার খাঁচার গায়ে ঠেকছিল—তাই খনখন শব্দ হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও পাখাটা প্রাণপণে বাতাস চালান দিচ্ছিল সুদেবকে লক্ষ করে।

অথচ সুদেব ঘামছিল। ওর শরীরের ভেতরে কোনও এক অজানা কেন্দ্রবিন্দুতে অসহ্য তাপ তৈরি হচ্ছিল। সেই তাপ হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষিপ্রভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল শরীরের প্রতিটা জায়গায়।

লতিকামাসির কথা মনে পড়ছিল সুদেবের।

তখন ওর বয়েস ষোলো কি সতেরো। সবে পড়াশোনা ছেড়ে গাঁয়ের ইলেকট্রিক মিস্তিরি তারক পালের দোকানে হেল্পারি করছে। মাসে পঞ্চাশ টাকা আর ফ্রি বিশ-পঁচিশটা বিড়ি পায়। তার বদলে ইলেকট্রিকের কাজ শেখে, তারকদার সঙ্গে যন্ত্রপাতি থলে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তারকদা যখন কাজ করে তখন ঘড়াঞ্চি চেপে ধরে, স্ক্রু-ড্রাইভার কি রেঞ্চটা তারকদার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়, প্লাস্টিকের তারের কভারটা দাঁতে কামড়ে ছাড়িয়ে দেয়।

ইলেকট্রিকের দোকান থেকে ছুটির পর পুকুরপাড়ে লুকিয়ে বিড়ি খেতে যেত সুদেব।

একদিন সন্ধের মুখে পুকুরপাড়ে কচুবনের গোড়ায় বসে বিড়ি টানছিল সুদেব। হঠাৎই জলের ছপ-ছপাং শব্দ পেল ও। চোখ তুলে কচুডাঁটার ফাঁক দিয়ে দেখল লতিকামাসি পুকুরে গা ধুতে নেমেছে।

সুদেবদের ভাতারমণিখোলা গাঁয়ে এই একটাই বড়সড় এ-ক্লাস পুকুর। এখানে অন্য ছোটখাটো পুকুরগুলোর মতো পানা, শালুক আর হোগলার উপদ্রব নেই। তাই অনেকেই টিপকলের বদলে এই পুকুরটায় স্নান করতে ভালোবাসে।

সুদেব বিড়ি খাওয়া ভুলে হাঁ করে লতিকামাসিকে দেখছিল।

তা দেখার মতোই জিনিস বটে! এর আগে সুদেব বেশ কয়েকবার লতিকামাসিকে স্বপ্নে দেখেছে। স্বপ্নগুলো শেষ পর্যন্ত ভেজা-স্বপ্ন হয়ে গেছে।

সুদেবদের ঘরের পাঁচ-ছ' ঘর দূরেই লতিকামাসির ঘর। বছরচারেক আগে বিয়ে হয়েছিল কোথায় যেন। তারপর স্বামীর সঙ্গে কীসব গন্ডগোল হওয়ায় ফিরে এসেছে—আর যায়নি।

বছরখানেক হল লতিকামাসি সুদেবকে দেখলেই কেমন সব যেন কথা বলে। অনেকবার বাড়িতে যেতে বলেছে—সুদেব যায়নি। কোনও-কোনও সময় বলেছে, 'আই, আমাদের লাইট খারাপ হলে সারাতে আসবি তো?'

সুদেব বলেছে, 'তারকদা যাবে। তারকদা গেলে সঙ্গে আমি যাব।'

'দূর! তারকদা তো বুড়ো—ও লাইট সারাতে পারবে না।'

তার মানে? বয়েস হয়ে গেলে কি লাইট সারানোর ক্ষমতা চলে যায়? কিন্তু তারকদা তো ভালোই সারায়!

ওসব হেঁয়ালির মানে বোঝেনি সুদেব। তবে কাউকে ওসব কথা বলেওনি। কারণ, লতিকামাসির চোখের নজরটা ওর কেমন যেন ঠেকেছিল।

আর-একদিনের কথা মনে পড়ল সুদেবের।

লতিকামাসি স্টেশনের পথ দিয়ে হেঁটে আসছিল। গায়ে লাল শাড়ি, কপালে টিপ, গোটা শরীর থেকে স্নো-পাউডারের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বোধহয় কোথাও বেড়াতে-টেরাতে গিয়েছিল।

সুদেব যন্ত্রপাতির থলেটা হাতে নিয়ে ইটভাটার দিকে যাচ্ছিল। ওটা পেরিয়েই রাইস মিল। তার পাশেই কৈলাস নন্দের বাড়ি। তারকদা সাইকেল নিয়ে দু-জায়গা ঘুরে তারপর সেখানে যাবে। সুদেবকে বলে গেছে তিরিশ গজ প্লাস্টিক তার আর ড্রিলটা নিয়ে ওখানে সোজা চলে যেতে। দেরি হলেই আবার খ্যাচখ্যাচ করবে। তাই চটপট পা চালাচ্ছিল সুদেব। তখনই—।

'কীরে, ছুট্টে-ছুট্টে কোথায় যাচ্ছিস?'

লতিকামাসি।

সুদেব কৈলাস নন্দের বাড়ির কথা বলল।

খিলখিল করে হাসল লতিকামাসি। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'তোকে হেভি দেখতে লাগছে।'

সুদেব লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল। ওর ফরসা মুখ লালচে হয়ে গেছে।

'শোন, আমাদের ঘরের একটা ডুম কেটে গেছে। ওটা পালটে দিস তো!'

'তাই? কত পাওয়ারের ডুম?'

'চল্লিশ। কখন এসে পালটে দিবি বল?'

'কাল সকালে।'

'ধুৎ! সকালে নয়—তুই দুপুরবেলা আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাব। তুই আগে কখনও দেখিসনি—।'

'কী দেখাবে?'

'সাতশো পাওয়ারের ডুম।'

'তুমি হাসালে, লতিকামাসি। সাতশো পাওয়ারের ডুম হয় না। পাঁচশোর পরই হাজার।'

লতিকামাসি হাসল, বলল, 'তুই এইটুকু ছেলে, ইলেকট্রিকের কতটুকু জানিস! আমি বলছি শোন—ডুমটা পাঁচশোর চেয়ে বড়, কিন্তু হাজারের চেয়ে ছোট। তাই বলছি সাতশো পাওয়ারের ডুম। তাও একটা নয়—তোকে একজোড়া দেখাব—তুই লাইফে কখনও দেখিসনি।' ফস করে সুদেবের গাল টিপে দিল লতিকামাসি : 'লক্ষ্মী ছেলে! আসবি কিন্তু।'

কথা ক'টা বলেই লতিকামাসি চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সুদেব সেখানে

pathagar.net

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ।

সাতশো ওয়াটের বাল্ব। তাও আবার একটা নয়, দুটো!

সুদেবের শরীরের ভেতরে হঠাৎই গরম তেল ফুটতে শুরু করল। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। ও তাড়াতাড়ি পা চালাল কৈলাস নন্দের বাড়ির দিকে।

সেই রাতে ও আবার লতিকামাসিকে স্বপ্নে দেখেছিল। সাতশো পাওয়ারের ডুম...।

তারকদাকে শুধু চল্লিশ পাওয়ারের ডুমের ব্যাপারটা বলেছিল সুদেব। পরদিন সুদেবকে অন্য কাজ দিয়ে দোকানে বসিয়ে তারকদা নিজেই গিয়েছিল লতিকামাসিদের বাড়ি।

তারকদা ফেরার পর তার শুকনো মুখ দেখে সুদেবের মনে হয়েছিল, না, তারকদা সাতশো পাওয়ারের ডুম দেখতে পায়নি।

স্টিলের ক্যানের লাফানিটা কমে গিয়েছিল। তাই একটু অবাক হয়ে ক্যানটার দিকে ঝুঁকে পড়ল সুদেব—তাতালটা শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরা।

ও, এই ব্যাপার! তুমি এইখানে এসে শেলটার নিয়েছ, চাঁদু!

ক্যানের ঢাকনার ফুটো দিয়ে ইঁদুরটার খুদে-খুদে নখ বেরিয়ে আছে। ক্যানের তাপ সহ্য করতে না পেরে ইঁদুরটা লাফাতে-লাফাতে একসময় ঢাকনার ফুটোগুলোর নাগাল পেয়ে গেছে। তাই মরিয়া হয়ে সেই ফুটো আঁকড়ে ঝুলছে। হাঁপাচ্ছে, এবং বিশ্রাম নিচ্ছে।

'নেওয়াচ্ছি বিশ্রাম।' বিড়বিড় করে বলল সুদেব।

এবং তারপরই গরম তাতালের ডগা চেপে ধরল খুদে নখের ওপরে।

ধোঁয়া বেরোল। গন্ধও বেরোল একটা। নখটা গরমে গলে গেল নাকি! ইঁদুরটার কিচকিচ কানে এল সুদেবের। সেইসঙ্গে ক্যানটা আবার পাগলের মতো লাফাতে লাগল।

সুদেব এবার তাতালটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পালা করে ক্যানটার সব জায়গায় ঠেকাতে লাগল। এবং ক্যানের ছটফটানি দেখে খুশি হল।

সুদেবের কপালের পাশ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বাইরের গরমটা ও তেমন ভ্রূক্ষেপ করছিল না। ওকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ভেতরের গরমটা। সেই পুকুরপাড়ের মতো।

ও যেন চোখের সামনে লতিকামাসিকে স্পষ্ট দেখতে পেল।

লতিকামাসির গা ধোওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন জল গায়ে পুকুর থেকে উঠে আসছে। আসছে কচুগাছের আড়ালের দিকেই।

সুদেব হাতের বিড়িটা চট করে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর শিকারি চিতার মতো দম বন্ধ করে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল। ও টের পাচ্ছিল, ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। এও টের পাচ্ছিল, শরীরের ভেতরটায় হতচ্ছাড়া এক আগুন জ্বলছে।

ওর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল লতিকামাসি—কিন্তু পিছন ফিরে থাকায় ওকে দেখতে পায়নি। সেইজন্যই বোধহয় সহজভাবে গায়ের ভেজা শাড়িটা সরিয়ে-সরিয়ে গামছা দিয়ে গা মুছে নিচ্ছিল।

চুল মুছে গামছা দিয়ে শব্দ করে চুল ঝাড়ল লতিকামাসি। তারপর ঘাসের ওপরে রাখা শুকনো জামাকাপড় হাতে তুলে নিয়ে গায়ে লেপটে থাকা ভেজা শাড়িটা খুলতে শুরু করল।

সুদেব পিছন থেকে গাঢ় নজরে সবকিছু দেখছিল। হয়তো ভাবছিল, শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্ত এসে গেছে কি না। আর ঠিক তখনই...।

ঠিক তখনই সুদেবের প্রাণপণ মৌন প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে লতিকামাসি সুদেবের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আর সুদেব যেন হাজার ভোল্টের শক খেল।

সাতশো পাওয়ারের ডুম ও লাইফে কখনও দেখেনি। এখন দেখল। দুটো। ওর মনে হল, সাতশো কেন, আটশো পাওয়ারেরও হতে পারে।

সুদেবের ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল। চোখে প্রায় ঝাপসা দেখার মতো অবস্থা। এমন সময় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ওর নজরে পড়ল।

লতিকামাসি ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

সুদেবের মাথাটা কেমন চক্কর খেয়ে গেল। এসব রহস্যের মানে কী?

মানেটা স্পষ্ট হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

লতিকামাসি ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, বলল, 'আয়। কাছে আয়।'

সঙ্গে-সঙ্গে সুদেবের পৃথিবীটা ওলটপালট হয়ে গেল। ও লতিকামাসির কথা শুনল এবং কচুবনের মধ্যেই শিকার-শিকারির ঝটাপটি শুরু হল।

সুদেবের বোধহয় জ্ঞান ছিল না। কারণ, ওই আনন্দ আর যন্ত্রণার মধ্যেই ওর ডানহাত কখন যেন পৌঁছে গিয়েছিল লতিকামাসির গলায়। এবং আঙুলগুলো চেপেও বসেছিল।

লতিকামাসির গলা থেকে একটা ভাঙা ঘড়ঘড় শব্দ বেরোতে শুরু করেছিল। তারপর গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করতে শুরু করেছিল লতিকামাসি। এবং ছটফট করতে-করতেই কীভাবে যেন সুদেবের ডানগালে জোরালো কামড় বসিয়ে দিয়েছিল।

তখন সুদেবের চেতনা ফিরে এসেছিল। উত্তেজনার ঢেউটা কেউটের ফণার মতো ফুঁসে উঠে আছড়ে পড়েছিল, রেণু-রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে স্তিমিত হয়েছিল অবশেষে।

ঘামে একেবারে স্নান করে ফেলেছিল সুদেব। একইসঙ্গে নিজেকে অল্প-অল্প চিনতে শিখেছিল।

pathagar.net

তারপর থেকে সেই চেনার কাজ একপলকের জন্যও থামেনি। একটার পর

একটা পরদার আড়াল সরিয়ে যতই সুদেব নিজের কাছে পৌঁছয় ততই অবাক হয়। এত রহস্য লুকিয়ে আছে ওর ভেতরে!

যে-সুদেব সামন্ত এই মুহূর্তে গরম তাতাল হাতে করে একটা ইঁদুরকে জ্যান্ত শিককাবাব বানাচ্ছে, আর ভাতারমণিখোলা গ্রামের কচুবনের সেই কিশোর সুদেব সামন্ত—ওরা দুজন কি একই মানুষ?

তাতালটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল সুদেব। ওটার প্লাগটা এক হ্যাঁচকায় খুলে নিল দেওয়ালের সকেট থেকে। তারপর একটা প্লাস্টিক তারের দুটো প্রান্ত হাতে তুলে নিল। ভালো করে দেখে নিল সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না।

হ্যাঁ, ঠিকই আছে। তারটা ছোট মাপের একটা সিরিজ ল্যাম্প হয়ে চলে গেছে আর-একটা প্লাগ পয়েন্টে।

সুতরাং, তামার তারের দুটো প্রান্ত স্টিলের ক্যানের দুপাশে ঠেকাল সুদেব। সার্কিট জুড়ে যাওয়ামাত্রই সিরিজ ল্যাম্পটা জ্বলে উঠল এবং ক্যানের ভেতরের ইঁদুরটা শক খেল। ক্যানটা ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে উঠল। ল্যাম্পের হলদে আলো ঠিকরে পড়ল সুদেবের মুখে। ওর ফরসা সুন্দর মুখটা আর ততটা সুন্দর লাগছিল না। কপাল, নাকের ডগা, দু-গাল, ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেরিয়ে থাকা দাঁতের পাটি—সব কেমন চকচক করছিল।

একটা তারের মুখ ক্যানের গা থেকে সরিয়ে নিল সুদেব।

সঙ্গে-সঙ্গে কানেক্শান কেটে গিয়ে বাল্বটা নিভে গেল। এবং ক্যানের ছটফটানি কমল।

কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম দিয়ে তারের দু-প্রান্ত আবার ক্যানের দুপাশে ঠেকাল ও।

আবার বাল্বটা জ্বলে উঠল এবং ইঁদুরটার ছটফটানি শুরু হল।

দাঁত বের করে আপনমনেই হাসল সুদেব। ঠিক যেন বিশ বছর আগের কচুবনের সেই ছটফটানি! লতিকামাসি ছটফট করছে। আহা রে!

কিছুক্ষণ পরেই লোম আর চামড়া পোড়া গন্ধ সুদেবের নাকে এল।

আঃ, কী দারুণ! এই গন্ধটা সুদেবের এত ভালো লাগে!

ইঁদুরটার কিচকিচ ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্যানটাও দিব্যি এপাশ-ওপাশ লাফাচ্ছিল।

সুদেব হঠাৎই তারের কানেক্শান কেটে দিল। অমনি সিরিজ ল্যাম্প নিভে গেল।

দু-সেকেন্ড পরেই ক্যানের গায়ে তার ঠেকিয়ে ল্যাম্পটা আবার জ্বালাল সুদেব।

আবার পোড়া গন্ধ, আবার কিচকিচ।

ল্যাম্প নিভে গেল আবার। তারপর আবার জ্বলল। তারপর...।

ল্যাম্পটা বারবার জ্বলছে, নিভছে, জ্বলছে, নিভছে...।

সুদেবের মুখ লালচে হয়ে গেছে। গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। কয়েক ফোঁটা লালাও গড়িয়ে পড়ল কষ বেয়ে।

হঠাৎই ল্যাম্প আর তার-জোড়া সাবধানে নামিয়ে রাখল ও। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে ক্যানটা চেপে ধরল। কান পেতে শুনতে চাইল ভেতরে কোনও প্রাণী নড়াচড়া করছে কি না। নাঃ, সেরকম কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কোনও কাঁপুনিও টের পাওয়া যাচ্ছে না হাতের ছোঁয়ায়।

ক্যানের ঢাকনা খুলে ভেতরে হাত ঢোকাল সুদেব। আধপোড়া ইঁদুরটাকে খপ করে চেপে ধরল। তারপর ক্রিকেট মাঠে দুরন্ত ফিল্ডিং দেওয়ার ভঙ্গিমায় ওটাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুড়ে মারল টেবিল-ফ্যানটার দিকে।

ফট করে শব্দ হল। ছোট্ট প্রাণীটার পোড়া দেহ লোহার ব্লেডে লেগে থেঁতলে গেল। ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

সেদিকে তাকিয়ে রইল সুদেব। আনমনাভাবে ডানহাতটা নাকের কাছে নিয়ে এসে শুঁকল। তারপরই নাক কুঁচকে মুখ বিকৃত করে হাতটা ঝট করে সরিয়ে নিল।

তখনই ওর চোখ পড়ল মেঝেতে লেগে থাকা রক্তের দিকে। ইঁদুরটার ছিটকে পড়া দেহ থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। লাল রক্ত। না, লাল ঠিক নয়— একটু কালচে।

লাল রং। দোলের লাল রং।

বহু বছর আগের দোলের দিনের কথা মনে পড়ে গেল সুদেবের। ওর বাঁহাতের আঙুলের ডগা ঢুকে পড়ল ঠোঁটের ফাঁকে। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগল। না, দোলের দিনের ঘটনাটার জন্য ও মোটেই দায়ী নয়—দায়ী লতিকামাসি।

লতিকামাসির সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিয়ে গ্রামে একটু-আধটু টিটি-গোছের পড়েছিল। বন্ধুরা কেউ-কেউ ওর ভাগ্যকে হিংসে করত। আর সুদেব কী এক নেশার টানে ছুটে যেত লতিকামাসির কাছে। কখনও লতিকামাসির বাড়িতে, কখনও কচুবনে, কখনও ইটভাটার মাঠে, কখনও-বা ধানখেতে।

ভালোবাসাবাসির সময়ে সুদেবের জ্ঞান থাকত না। লতিকামাসিকে হিংস্র পশুর মতো আঁচড়ে-কামড়ে দিত। একদিন ঠাস করে এক থাপ্পড়ও মেরেছিল। ব্যাপারটা সুদেবের কাছে আদরের থাপ্পড় হলেও লতিকামাসির ব্যথা লেগেছিল। গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল।

হঠাৎই একদিন লতিকামাসি ভাতারমণিখোলা থেকে উধাও হয়ে গেল। একইসঙ্গে উধাও হল গ্রামের মহাজন নিত্যানন্দ পালের ছোট ছেলে উৎপল।

pathagar.net

দিনটা ছিল দোলের দিন।

রাতে খবরটা পেয়ে সুদেব পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। এতদিনে ওর খিদের

তাড়না অনেক বেড়েছে। সেই খিদে ও এখন কোথায় মেটাবে! সারাটা রাত ও জ্বালা-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ওর জীবনটা যেন আচমকা ফাঁকা হয়ে গেল।

সেই ফাঁকা জায়গা ভরাতে সুদেব বন্ধুবান্ধব আর নেশায় মেতে উঠল। ইলেকট্রিকের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজেও হাত পাকাতে লাগল। আর দোলের দিনটা এলেই ওর মনখারাপ হয়ে যেত। কেমন এক অস্বাভাবিক তাড়নায় ও গ্রামের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। অন্যরকম চোখে মেয়েদের দিকে তাকাত। ওদের সবাইকে সুদেবের লতিকামাসি বলে মনে হত। মনে হত, লতিকামাসি যেভাবে ওকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে তার একটা বদলা নেওয়া দরকার, হেস্তনেস্ত করা দরকার।

ঘটনাটা ঘটেছিল লতিকামাসি চলে যাওয়ার ঠিক পাঁচ বছর পর। হিসেবটা সুদেবের মনে আছে, কারণ, সেদিনটাও ছিল দোলের দিন।

ওরা চারজন বন্ধু মিলে সারাদিন জমিয়ে হইহুল্লোড় করেছে। রং মেখেছে। নেশা করেছে। তারপর বেশ বেলার দিকে ওরা বড় পুকুরটার কাছে চলে এসেছিল। এসে দ্যাখে, ছ'টা মেয়ে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। ওদের কেউ সাবান ঘষে গায়ের রং তুলছে, কেউ রং-মাখা শাড়ি-ব্লাউজ পুকুরের জলে জলকাচা করে নিচ্ছে, কেউ-বা ভিজে চুল শুকোচ্ছে।

নষ্টামির বুদ্ধিটা সুদেবই জোগাল। বলল, এদের সবক'টাকে ধরে রং মাখালে কেমন হয়! আর রং মাখানোর নাম করে যেটুকু ফস্টিনস্টি করার করা যাবে।

তারপর ওরা তাই করেছিল। তবে সুদেব করেছিল ফস্টিনস্টির চেয়ে অনেক বেশি।

ও পকেট থেকে লাল আর কালো রং বের করে নিজের সারা মুখে মেখে নিয়েছিল। সেই রং মাখার সময়েই ওর শরীরে আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। তারপর দলের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়েসি যে-মেয়েটা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল, সুদেব তাকে গিয়ে নেকড়ের মতো জাপটে ধরেছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ের চিৎকার আর কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুদেবরা সংখ্যায় চারজন থাকায় যে-দুজন বেঁচে গিয়েছিল তারা পড়িমরি করে ছুট লাগিয়েছিল।

ততক্ষণে সুদেবের তিনবন্ধু তিনজনকে পুকুরপাড়েই তুমুল লোভে চটকাতে শুরু করেছে। আর মুখে রং-মাখা ভূত সুদেব কিশোরী মেয়েটাকে টানতে-টানতে নিয়ে গেছে কচুবনের ভেতরে। লতিকামাসির ওপরে বদলা নেওয়ার তাড়নায় ও তখন গনগনে আঁচে জ্বলছে।

বড় জোর দশ কি বারো মিনিট। সুদেবের তিনবন্ধু তিন শিকারকে আশ মিটিয়ে কচলানোর পর ছেড়ে দিয়েছে। ওরা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে। একজন ছুটে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তাই দেখে সুদেবের বন্ধুরা হেসে

উঠেছে। মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল সামলাতে-সামলাতে আবার ছুট লাগিয়েছে।

তিনবন্ধু যখন হোলির মজা উপভোগ করছে, নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করছে, তখন ওদেরই একজন হঠাৎ জিগ্যেস করেছে, 'অ্যাই সালা, সুদেব কোথায়? ও হারামজাদাটা এতক্ষণ ধরে কী করছে?'

সুদেব তখন থাবা চাটতে-চাটতে কচুঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসেই ওদের বলেছে, 'এখানে আর এক মিনিটও নয়। চল, ফুটে যাই।'

ওরা সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। তখন সুদেবের তিনবন্ধু জানত না, কিশোরী মেয়েটাকে কচুবনে চরম হেনস্থা করার পর সুদেব ওকে গলা টিপে খুন করে ফেলেছে।

ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ-কেস হয়েছিল, কোর্টকাছারিও হয়েছিল। কিন্তু তাতে সুদেবের তিনবন্ধু সাজা পেলেও সুদেব ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। কারণ, সারা মুখে রং মেখে থাকায় পাঁচজন মেয়ের কেউই ওকে শনাক্ত করতে পারেনি।

ঘটনাটা সুদেবের আজও মনে আছে। ও জানে, যত অন্যায়ই ও করুক না কেন, যদি ওকে কেউ চিনতে না পারে, শনাক্ত করতে না পারে, তা হলে কোনও সাজাই ওর হবে না।

ইঁদুরটার পড়ে থাকা দেহের দিকে তাকাল ও। এখনও কি ওটাতে প্রাণ আছে? অল্প-অল্প নড়ছে মনে হচ্ছে যেন...।

না, ওটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। সুদেব জানে, ইঁদুরটার পক্ষে কখনও সুদেবকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে নিয়ম। নিয়মের বাইরে যাওয়া ঠিক নয়।

সুতরাং, দু-পা ফেলে ইঁদুরটার কাছে এগিয়ে গেল সুদেব। একটা কাঠের পাটা মেঝে থেকে তুলে নিল। তারপর ইঁদুরটার ওপরে ঝুঁকে পড়ে পাটা দিয়ে ওকে পাগলের মতো পেটাতে লাগল। খতম, খতম, খতম।

কাজ শেষ করে মেঝেতে বসে পড়ল সুদেব। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগল। স্পষ্ট টের পেল, মনটা এখন বেশ ভালো লাগছে। আ—আঃ!

pathagar.net

তিন

pathagar.net

দরজা খোলার আগে আজিক আই-এ এক চোখ রাখল সুচরিতা। ফরসা একটা মুখ নজরে পড়ল। বেশ সুশ্রী, ধারালো নাক-চোখ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুল।

লোকটা কেমন যেন ফ্যালফ্যালে চোখে সুচরিতাদের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর নার্ভাস ভাবটা কাটাতে ডানহাতের আঙুল ঠোঁটের ফাঁকে দিয়ে দাঁতে নখ কাটছে।

লোকটার নামটা মনে না পড়লেও মুখটা সুচরিতার চেনা। ইলেকট্রিক মিস্তিরি। হালসীবাগান ছাড়িয়ে নীরোদবিহারী মল্লিক রোডের ওদিকটায় ওর ইলেকট্রিকের দোকান—দোকান মানে পাখা, মোটর, জেনারেটার এসব সারাইয়ের কারখানা। বছরখানেক আগে সুচরিতাকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পথে বাপি এই লোকটার দোকানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন সারানোর ব্যাপারে কীসব কথাবার্তা বলেছিল। তখনই লোকটার চাউনি সুচরিতার ভালো ঠেকেনি। বাপির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ওর চোখ বারবার ছিটকে আসছিল সুচরিতার দিকে। সেটা এমনিতে খুব দোষের নয়, কারণ, সুচরিতা ওরকমভাবে দেখার মতোই সুন্দরী। কিন্তু লোকটার দৃষ্টিতে তেষ্টা ছিল। এবং সেই তেষ্টাটা ও চেপে রাখতে চেষ্টা করেনি—চোখে-মুখে ফুটে বেরোচ্ছিল।

বাপিকে সে-কথা পরে বলেছিল সুচরিতা, 'বাপি, তোমার ওই ইলেকট্রিক মিস্তিরির নেচার ভালো না।'

পরমেশ আনমনাভাবে বলেছিল, 'মিস্তিরি ক্লাস...নেচার আর কত ভালো হবে! তবে লোকটা দারুণ কাজ জানে।'

কথাগুলো এই মুহূর্তে মনে পড়ল বটে কিন্তু লোকটার নাম মনে পড়ল না কিছুতেই।

ইস, কী যেন নামটা?

বাড়িতে এখন কেউ নেই। সুতরাং, দরজা খোলার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুচরিতার কৌতূহল হল। লোকটা এ সময়ে এসেছে কেন?

দরজা না খুলেই সুচরিতা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে?'

'আমি ''সামন্ত ইলেকট্রিক''-এর সুদেব—আপনাদের পাখাটা নিয়ে এসেছি। পরমেশবাবু বলেছিলেন, আজ সন্ধের আগে এসে লাগিয়ে দিতে—কী যেন এমার্জেন্সি আছে।'

সত্যিই তো! সুচরিতার মনে পড়ে গেল। বাপিদের ঘরের সিলিং ফ্যানটা ক'দিন

আগে হঠাৎই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাপি ইলেকট্রিকের দোকানে খবর দিয়েছিল। দিনতিনেক আগে এই লোকটা এসে পাখাটা খুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে বাপি খবর নিয়ে এসে বলেছিল, 'ইলেকট্রিকের দোকানের ছেলেটি বলল, রোববার বিকেলের মধ্যে দিয়ে দেবে।'

সুচরিতা দোটানায় পড়ে গেল। কী করবে এখন? পাখাটা লাগানো সত্যিই খুব জরুরি। কারণ, গেস্টরা এলে গরমে কষ্ট পাবে। অথচ...।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুদেব সামন্ত দরজার জোড়ের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'দিদি, এখন অসুবিধে হলে থাক। আমি কাল এসে পাখাটা লাগিয়ে দেব। পাখা আর ব্লেডগুলো বরং আপনাদের কাছে রেখে দিন।'

'এক মিনিট—' বলে দৌড়ে ফোনের কাছে গেল সুচরিতা।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল, 'বাপি, মাম আসেনি—ইলেকট্রিক মিস্তিরি তোমাদের ঘরের ফ্যানটা লাগাতে এসেছে।'

'ওঃ হো! একেবারে ভুলে গেছি। ওটা তো লাগাতেই হবে।' কিছুক্ষণ কী চিন্তা করল পরমেশ, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। ওকে ফ্যানটা লাগাতে বল। আর তুই পাঁচ-সাত মিনিট পর আমাকে ফোন করিস। এর মধ্যেই মনে হয় তোর মাম ফিরে আসবে।'

'ও. কে., বাপি।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সুচরিতা।

এফ. এম. চ্যানেল তখন গাইছে : 'যেদিন তুমি ভালোবেসেছিলে নিঃস্বার্থ, যেদিন তোমার বাবা আমায় বলেছিল অপদার্থ...।'

গানের তালে-তালে হাত-মাথা নেড়ে দরজার দিকে এগোল সুচরিতা। একঝলকের জন্য ওর মনে উঁকি দিয়ে গেল : বাপি নিশ্চয়ই অরিনকে কখনও অপদার্থ বলবে না।

গানটা গুনগুন করতে-করতে দরজা খুলে দিল সুচরিতা।

দরজার বাইরে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সুদেব সামন্ত সুচরিতাকে দেখে একটু হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু ও ভালো করে হাসতে পারল না। ওর মুখটা যেন মুখোশ—আর হাসতে গিয়ে সেই মুখোশের চামড়ায় যেন টান ধরল।

ভারী থলে হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সুদেব। আড়চোখে দেখতে লাগল সুচরিতাকে। কী দারুণ দেখতে! লতিকামাসির চেয়ে ঢের-ঢের বেশি সুন্দরী। তবে বাল্‌ব ওই সাতশো পাওয়ারের মতোই। সুদেবের তাতাল গরম হতে শুরু করল। বিনবিনে ঘাম দেখা দিল কপালে আর মুখে।

দরজাটা খোলাই রেখে দিল সুচরিতা। ড্রইংরুম থেকে খোলা দরজা দিয়ে বারান্দার গ্রিল অনেকটাই চোখে পড়ছে। বারান্দায় লাগানো বালবের আলো খানিকটা ঠিকরে পড়েছে ঘরের ভেতরে। ঘরের টিউবলাইটের সাদা আলো আর

pathagar.net

বাল্‌বের হলদে আলো মেঝেতে এক অদ্ভুত মিশেল তৈরি করেছে।

ড্রইংরুম পার হয়ে বেডরুমের দিকে যাওয়ার সময় ঘরের সাজগোজগুলো সুদেবের নজরে পড়ল। আজ মনে হয় কিছু একটা উৎসব আছে।

তাই? নাকি ছিল উৎসবের ব্যাপারটা মিটে গেছে?

সুদেব এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল। আর একইসঙ্গে ওর কান সজাগ ছিল খরগোশের মতো। আর কারও শব্দ কি পাওয়া যাচ্ছে? আর কেউ কি বাড়িতে নেই? যদি না থাকে...।

সুচরিতার পিছন-পিছন পরমেশদের শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ল সুদেব। এবং চটপট কাজে লেগে গেল।

থলে থেকে পাখা আর ব্লেড বের করে মেঝেতে রাখল। তারপর উবু হয়ে বসে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ব্লেডগুলো টাইট করে লাগাতে শুরু করল।

সুচরিতা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সুদেবের কাজ লক্ষ করছিল। আর একইসঙ্গে নজর রাখছিল খোলা সদর দরজার দিকে।

সুদেব মাথা নিচু করে কাজ করছিল, তবে চোরা নজরে সুচরিতার পায়ের দিকে দেখছিল। ফরসা পায়ের পাতা। কী সুন্দর-সুন্দর আঙুল। নিটোল গোড়ালি। তারপরই চুড়িদারের হলুদ সালোয়ার শুরু হয়েছে। যদি মেয়েটা সালোয়ার পরে না থাকত তা হলে একটু ওপরে চোখ তুললেই ফরসা পায়ের গোছ দেখা যেত। তার ওপরে হাঁটু। হাঁটুর ওপরে উরু। তারপর...।

সুদেব চটপট কাজ সারতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, বাড়িতে আর কেউ নেই—শুধু মেয়েটা একা। মেয়েটা আর সুদেব।

পাখাটা যেদিন সুদেব খুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন পরমেশ ওর সঙ্গে হাত লাগিয়ে সাহায্য করেছিল। তাই ব্লেডগুলো লাগানো শেষ করে উঠে দাঁড়াল সুদেব। হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে সুচরিতাকে জিগ্যেস করল, 'দাদা নেই? আমাকে একটু হেল্‌প করলে ভালো হত। পাখাটা ওপরে তুলে লাগাতে হবে তো...।'

সুচরিতা আলতো করে বলল, 'না, বাপি নেই। কী করতে হবে বলুন...আমি হেল্‌প করছি।'

সুদেব সামন্তর বুকের ভেতরে ঘোড়া দৌড়তে শুরু করল। 'বাপি নেই' কথাটা বারবার ওর কানে বাজতে লাগল, ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।

কথা বলতে গিয়ে সুদেবের গলা বোধহয় কিছুটা কেঁপেও গেল : 'আমি টুলের ওপরে উঠে দাঁড়ালে আপনি পাখাটা একটু আমার হাতে তুলে দেবেন...তা হলেই হবে...।'

সুচরিতা ঘাড় নাড়ল।

এরপর সুদেব ওর কাজ শুরু করল। বেডরুমের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে

তার ওপরে একটা টুল দাঁড় করাল। তারপর অভ্যস্ত কায়দায় উঠে পড়ল টুলের ওপরে।

আগের দিন ঠিক এইভাবেই ও পাখাটা সিলিং থেকে খুলে নামিয়েছিল। পরমেশ সেটা ধরে মেঝেতে রেখেছিল।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলল সুদেব। চেয়ার আর টুল জায়গামতো রেখে পাখাটা বারদুয়েক চালিয়ে টেস্ট করে নিল। তারপর থলেটা তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে এল। সুচরিতাকে বলে বেসিনে ভালো করে হাত ধুয়ে নিল। তারপর হাত-টাত মুছে সদরের দিকে এগোতে-এগোতে বলল, 'আপনি বরং দাদাকে একটু ফোন করে বলে দিন, পাখা লাগিয়ে দিয়েছি। পরে দাদার সঙ্গে কথা বলে নেব।'

এতক্ষণ কাজ করছিল বটে সুদেব, কিন্তু মনে-মনে ও হিসেব কষছিল। আর কোনওরকমে শরীরের পাগল-করা উত্তেজনাটাকে দমিয়ে রাখছিল। সেই হিসেব কষা শেষ হতেই ও সুচরিতাকে বলেছে পরমেশকে ফোন করার জন্য।

সুচরিতা সেই ফাঁদে পা দিল—ফোন করল পরমেশকে।

সুদেব তখন সদর দরজার পাল্লা ধরে একটু আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে।

'বাপি, রিতু বলছি—।'

'হাঁ, বল।'

'পাখাটা মিস্তিরি লাগিয়ে দিয়ে গেছে—।'

'লোকটা চলে গেছে?'

সদর দরজার দিকে একপলক দেখল সুচরিতা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, চলে গেছে।'

'যাক, বাঁচা গেছে। কিন্তু এখানে এখনও টেরিফিক জ্যাম। আমরা সবে "হিন্দ" সিনেমার মোড়টা পেরিয়েছি—।'

সুদেব সুচরিতার সব কথা শুনছিল। 'হ্যাঁ, চলে গেছে—।' কথাটা শোনার পরই ও ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে আবার। নাইট ল্যাচ লাগানো দরজার পাল্লাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছে। হাতের থলেটা নামিয়ে রেখেছে দরজার কাছেই।

এবার সুচরিতাকে লক্ষ করে খ্যাপা কুকুরের মতো ছুট লাগিয়েছে।

কানে রিসিভার চেপে ধরা অবস্থাতেই সুচরিতা সুদেবকে দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়েছিল ওর পালটে যাওয়া মুখ। একটু আগে দেখা মুখের সঙ্গে এই মুখটার কোনও মিল ছিল না।

লোভাতুর চোখ। বিকৃত ঠোঁট—ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। কপালে আর মুখে গুটিবসন্তের মতো ঘামের ফোঁটা। হাত দুটো সামনে বাড়ানো। এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ছুটে আসছে সুচরিতার দিকে।

মেয়েটা ভেবেছিল একটা চিৎকার করবে, কিন্তু একটা ঝিমঝিমে ভয় ওকে অসাড় করে দিল। ওর শরীরটা শুকনো কাঠ হয়ে গেল। হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ল মেঝেতে। এবং শরীরের সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সুচরিতা সালোয়ার ভিজিয়ে ফেলল। ওর বোবা চোখ ছুটে-আসা সুদেবের দিকে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইল।

পরমেশ এখন টেলিফোনে চেঁচাচ্ছে : 'রিতু, কী হল রে! রিতু...অ্যাই, রিতু...!'

সুচরিতা চিৎকার করে উঠতে পারে, এ-কথা ভেবেই সুদেব দৌড় শুরু করেছিল। ও ছুটন্ত অবস্থাতেই সামনে বাড়ানো ডানহাতে সুচরিতার গলা টিপে ধরল এবং গতিজাড্যের নিয়ম মেনে সুচরিতাকে প্রবল শক্তিতে আছড়ে দিল দেওয়ালে।

মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে সুচরিতা আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেল। রঙিন কাগজের শিকল আর ফুল দিয়ে সাজানো ঘরটা ওর চোখের সামনে ওলটপালট হয়ে পাক খেয়ে গেল কয়েকবার। ও মেঝেতে কাত হয়ে খসে পড়ল। সেইসঙ্গে সুদেবও। কারণ, ও একমুহূর্তের জন্যও সুচরিতার গলার বাঁধন ঢিলে করেনি।

সুচরিতা অজ্ঞান হয়ে যায়নি। ওর মনটা মানসিক ধাক্কায় পঙ্গু হয়ে গেলেও শরীরটা লড়াই করছিল। হাত-পা ছুড়ছিল, ছটফট করছিল। সুদেব ওর গলা টিপে ধরে থাকলেও চাপের হেরফের হওয়ায় দু-একটা চাপা শব্দের টুকরো সুচরিতার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছিল। আর সুদেব দু-হাতের থাবায় ওকে আঁকড়ে ধরে অপেক্ষা করছিল—ছটফটে জেব্রার গলা কামড়ে ধরে বাঘ যেমন অপেক্ষা করে কখন সে নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

টেলিফোন রিসিভারটা ওদের কাছ থেকে হাতদুয়েক দূরে মেঝেতে পড়ে ছিল। আচ্ছন্ন অবস্থাতেও সুচরিতা শুনতে পাচ্ছিল বাপি পাগলের মতো চিৎকার করছে : 'রিতু! রিতু! রিতু...!'

পরমেশ সত্যিই পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। মোবাইল ফোনটাকে প্রাণপণে কানে চেপে ধরে ও মেয়ের নাম ধরে ডাকছিল বারবার।

টেলিফোনে ভেসে আসা অস্বাভাবিক শব্দগুলো পরমেশকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। কেউ কি ঢুকেছে ঘরে? কী হচ্ছে ওখানে? জিনিসপত্র উলটে পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ছোট-ছোট কয়েক টুকরো ডুকরে ওঠা চিৎকার। রিতু! রিতু! তোকে কি কেউ কষ্ট দিচ্ছে? রিতু! রিতু! তোর মা এক্ষুনি ফিরে আসছে না কেন? কেন ফিরে আসছে না প্রমিতা?

পরমেশের বুকটা ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। ওর মন অসহায়ভাবে মাথা খুঁড়ছিল বারবার। ওর চোখে জল এসে গেল।

বুবু অবাক চোখে দেখছিল বাপির দিকে। পরমেশের মুখের চেহারা, চোখের কোণে জল, আর সুচরিতার নাম ধরে পাগলের মতো বারবার ডেকে ওঠা— এসব দেখে বুবু ভয় পেয়ে গেল। কান্না পেয়ে যাচ্ছিল ওর।

পরমেশ চোখ বড়-বড় করে সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা নানা রঙের গাড়ি, তাদের উজ্জ্বল লাল টেইল লাইট ও দেখতে পাচ্ছিল কি না কে জানে! সামনে-পিছনে থেকে-থেকেই গাড়ির হর্নের প্যাঁ-পোঁ শব্দ বেজে উঠছিল। জ্যাম-জমাট গাড়ির সারের ফাঁকফোকর দিয়ে মানুষজন ব্যস্তভাবে রাস্তা পার হচ্ছিল।

পরমেশ এত জোরে মোবাইল ফোনটা কানে চেপে ধরেছিল যে, ওর কান ব্যথা করছিল। সমস্ত মনোযোগ জড়ো করে ও ফোনে-শুনতে-পাওয়া শব্দের প্রতিটি কণা প্রবল আগ্রহে শুনছিল। অথচ একইসঙ্গে ও ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিল যাতে ও এই মুহূর্তেই বদ্ধ কালা হয়ে যায়।

পরমেশের দিশেহারা চোখ পাগলের মতো এপাশ-ওপাশ দেখছিল আর ফোনে বারবার 'রিতু! রিতু!' বলে চেঁচিয়ে মেয়েকে ভরসা জোগাতে চাইছিল। আচ্ছা, এখন যদি ও গাড়ি থেকে নেমে দৌড়য় বাড়ির দিকে, তা হলে কি ও সুচরিতাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে? কিন্তু বুবুকে এখানে ফেলে রেখে ও যাবে কেমন করে! অথচ ওর আদরের মেয়ে বিপদে পড়েছে। কিন্তু ঠিক কী বিপদ হয়েছে রিতুর? কেউ কি ডাকাতি করতে ঢুকেছে বাড়িতে? একজন, না কয়েকজন? রিতু ওদের দরজা খুলতে গেল কেন? আর খুললই যদি, তা হলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পাড়াপড়শিদের জড়ো করছে না কেন?

যতই নিজেকে এসব প্রশ্ন করছিল, ততই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল পরমেশ। ওর বুকের ভেতরে পাথর হয়ে থাকা কান্নাটা হঠাৎই উথলে বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

আর বাপিকে আচমকা চিৎকার করে কেঁদে উঠতে দেখে বুবুও কেঁদে ফেলল। প্রাণপণে জাপটে ধরল বাপিকে।

এমন সময় ঝাপসা চোখে একজন পুলিশ কনস্টেবলকে দেখতে পেল পরমেশ। জ্যাম সামাল দিতে গাড়ির সার ঘেঁষে ধীরে-সুস্থে হেঁটে আসছে।

পরমেশ আর দেরি করল না। হুট করে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।

সুচরিতা একটা চিৎকার করতে যাচ্ছিল। ওকে হাঁ করতে দেখেই সুদেব সেটা বুঝতে পারল। তা ছাড়া ডানহাতের তালুতে ওর ভোকাল কর্ডের কাঁপুনিও টের পেল।

pathagar.net

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটুগেড়ে উঠে বসল সুদেব। হিংস্র মুঠোয় মেয়েটার চুলের গোছা ধরে ঠুকে দিল মেঝেতে।

একবার, দুবার, তিনবার।

সুচরিতার কালোয়ার ভেজানো জল মেঝেতে উদ্দেশ্যহীনভাবে গড়িয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে ওদের ধস্তাধস্তি চলছিল। বাথরুমের কড়া গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। আর সেটা সুদেবকে মাতাল করে দিচ্ছিল। নেশায় পাগল জন্তুর মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ও সুচরিতার ওপরে হামলে পড়তে চাইছিল বারবার।

মেঝের সঙ্গে মাথার ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের পর সুচরিতা কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ওর মাথার পিছনটা বোধহয় সামান্য ফেটে গিয়ে থাকবে, কারণ, সরু রক্তের রেখা মেঝেতে দাগ কাটতে শুরু করল। আর সুদেব চট করে চেপে ধরল ওর ডান পায়ের গোড়ালি। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল শোওয়ার ঘরের দিকে।

শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে সুচরিতার পা-টা ছেড়ে দিল সুদেব। ওর মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। বিড়বিড় করে কাকে যেন নোংরা গালাগাল দিচ্ছে।

সেই অবস্থাতেই ঝুঁকে পড়ে সুচরিতার জামাকাপড় ধরে পাগলের মতো হ্যাঁচকা টান মারল। কামিজ, সালোয়ার ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গেল। আর তখনই ও দেখল, মেয়েটা নড়ছে, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে।

সুদেবের মাথার ভেতরে আগ্নেয়গিরি ফুঁসে উঠল। নড়ছে, এখনও নড়ছে! এখনও লড়াই করতে চাইছে!

যে-কোনও একটা হাতিয়ারের খোঁজে চারপাশে তাকাল ও।

সামনেই রেফ্রিজারেটার—চেরিফলের মতো গাঢ় লাল রং। শিথিল হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটাকে একলাফে ডিঙিয়ে ফ্রিজের কাছে পৌঁছে গেল সুদেব। হাতল ধরে একটানে দরজা খুলে ফেলল। দরজার ভেতরদিকে পরপর সাজানো জলের বোতল। তার ওপরের র‍্যাকে একটা টমেটো সসের শিশি।

সস ভরতি শিশির গলাটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল ও। সুচরিতার কাছে এসে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল। তারপর সসের শিশিটা প্রবল শক্তিতে মুগুরের মতো বসিয়ে দিল সুচরিতার কপালে।

মেয়েটা অল্পসল্প নড়ছিল। কোনওরকমে উঠে বসার চেষ্টায় মাথাটা সামান্য উঁচু করেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। শিশিটা কপালে আছড়ে পড়তেই ওর সব নড়াচড়া থেমে গেল। কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল এদিক-ওদিক। লাল রঙের টমেটো সসে মেয়েটার মুখ প্রায় ঢাকা পড়ে গেল।

সুদেব মনে-মনে বলল, 'খতম! খতম! খতম!'

তারপর সুচরিতাকে জবরদখলের কাজ শুরু করল।

এফ. এম. চ্যানেলে তখন প্রেজেন্টার মেয়েলি ঢঙে বলছে, 'আমি শুভম, তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরাও আছ আমার সঙ্গে। এখন আমরা আনন্দে যা-খুশি করব, খুশি থাকব, সুখী থাকব, আর তার সঙ্গে থাকবে দারুণ-দারুণ ব্যাপক সব গান—গান আমার প্রাণ। এসো, তা হলে যা-খুশিতে মেতে যাই...।'

সুদেব সামন্ত বাধ্য ছেলের মতো প্রেজেন্টারের নির্দেশ মানছিল। মন-প্রাণ দিয়ে যা-খুশি তাই করছিল। আর লতিকামাসির কথা বারবার মনে পড়ছিল ওর।

মোবাইলটা কানে চেপে ধরা অবস্থাতেই ছুটতে লাগল পরমেশ। গাড়ির জটলার গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে লোকজনকে ধাক্কা মেরে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে-ছুটতে ও গিয়ে হাজির হল পুলিশ কনস্টেবলটির সামনে।

তাকে বিপদের কথা বলতে গিয়ে সর্বহারা শরণার্থীর মতো হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল পরমেশ। ওর কথাগুলো সব কেমন জড়িয়ে গেল।

কনস্টেবলটি অবাক হয়ে পরমেশকে দেখছিল। পাগল মানুষটা মোবাইল ফোন কানে চেপে ধরে হাত-পা ছুড়ে হাউহাউ করে কাঁদছে।

অনেকক্ষণের চেষ্টায় হাঁপাতে-হাঁপাতে হোঁচট খাওয়া জড়ানো গলায় পরমেশ কোনওরকমে বলল, 'আমার...আমার বাড়িতে...ডাকাত পড়েছে! আমার মেয়েটা...বাড়িতে একা...। ওকে বাঁচান, প্লিজ...ওকে বাঁচান! ওকে ওরা মেরে ফেলছে! প্লিজ...এক্ষুনি কিছু একটা করুন...প্লিজ...!'

কনস্টেবল ভদ্রলোক পরমেশের সব কথা বুঝতে না পারলেও বিপদটা আঁচ করতে পারল। পরমেশকে হাত ধরে টানতে-টানতে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল সে। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'শিগগির চলুন, ওইখানটায় আমাদের স্যার আছেন—স্যারের কাছে ওয়াকিটকি আছে। স্যারকে সব বলুন, বাড়ির অ্যাড্রেস দিন—স্যার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। চলুন, জলদি চলুন—।'

পরমেশ অসহায়ের মতো কাঁদছিল। মোবাইল ফোনে সেরকম আর কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। যানজটে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির লাল ব্রেকলাইট লাইটগুলো ওর ভেজা চোখে কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। ও যন্ত্রের মতো পা ফেলে কনস্টেবলটির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল।

একটু পরেই ও একজন পুলিশ অফিসারকে দেখতে পেল। সুঠাম লম্বা চেহারা। দেখলেই ভরসা হয়। একটা মোটরবাইকের পাশে ওয়াকিটকি হাতে দাঁড়িয়ে।

পরমেশ ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। অসহায়ের মতো কাঁদতে-কাঁদতে

pathagar.net

নিজের সর্বনাশের কথা জানাল। 'রিতু! রিতু!' বলে মোবাইল ফোনে আর্তভাবে ডাকল মেয়েকে।

কিন্তু মেয়ে কোনও সাড়া দিল না।

pathagar.net

সুচরিতা তখন সাড়া দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ওর অসাড় দেহ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে ছিল মেঝেতে। আর টমেটো সস মাখা মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিল! কারণ, লাল সসের মধ্যে একটা ফোকর দিয়ে ওর একটা খোলা চোখ নিষ্প্রাণভাবে তাকিয়ে ছিল সিলিংয়ের দিকে।

সুদেবের বুকের ভেতরে ঢেঁকির পাড় পড়ছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাতে হবে। ঘরের দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল ও। বাকি কাজ সারার জন্য চটপট হাত চালাল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ফ্রিজের হাতলটা মুছে দিল। তারপর ঘরের একপাশে সাজানো ডাইনিং টেবিলের দিকে ওর নজর গেল। টেবিলে সুন্দর-সুন্দর চিনেমাটির পাত্রে থরে-থরে খাবার। তার পাশে একথাক কাচের প্লেট আর ডজনখানেক কাচের গ্লাস।

সুদেব চট করে ভাবতে চাইল। ফ্রিজের হাতল ছাড়া আর কোথাও কি ও হাত দিয়েছে যেখানে ওর হাত দেওয়ার কথা নয়?

ভালো করে মনে পড়ল না। সুতরাং কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখা খাবারের পাত্রগুলোর দিকে ব্যস্তভাবে এগোল সুদেব। এক-একটা পাত্র তুলে নিয়ে তার সর্বস্ব ঢেলে দিতে লাগল মেঝেতে পড়ে থাকা মেয়েটার গায়ে এবং চারপাশে। রান্না করা খাবারের ঝোল, তেল, মশলা, আলু আর মাংসের টুকরোয় সুচরিতার দেহটা একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল।

সুদেব খালি পাত্রগুলো চটপট আবার সাজিয়ে দিল টেবিলে। রুমাল দিয়ে ঠিকঠাকভাবে মুছেও দিল—যাতে আঙুলের ছাপ-টাপ না পাওয়া যায়।

হঠাৎই টের পেল গলা শুকিয়ে গেছে। জিভ খসখসে। একটু জল খেলে হয়। কিন্তু সময় বড় কম।

প্রায় ছুটে ফ্রিজের কাছে গেল ও। হাতল ধরে টান মারল। দরজা খুলতেই জলের বোতল পেয়ে গেল। তারপর ঠান্ডা জল ঢকঢক করে গলায় ঢালল। আ-আঃ! বুকের ভেতরের ঢিপঢিপ শব্দটা বোধহয় একটু কমল।

ব্যস, কাজ শেষ। মেয়েটা ওকে কোনওদিনও বিপদে ফেলতে পারবে না। পুলিশের কাছে ওকে চিনিয়ে দিতে পারবে না। মেয়েটার গায়ে আর আশেপাশে এত খাবার ও ঢেলে দিয়েছে যে, পুলিশের কুকুর হাজার গন্ধ শুঁকেও কিচ্ছু হদিশ

পাবে না। আর বেমক্কা কোনও জায়গায় সুদেবের ছিটেফোঁটা হাতের ছাপও পাবে না পুলিশ। সব ঘেঁটে গেছে।

দোতলার দিক থেকে একটা আওয়াজ এল না! চমকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে তাকাল। তারপর প্রায় ছুটে চলে গেল দরজার কাছে। মেঝে থেকে থলেটা চট করে তুলে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। দরজার পাল্লাটা টেনে দিতেই নাইটল্যাচ 'ক্লিক' শব্দ তুলে লক হয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে এপাশ-ওপাশ তাকাল সুদেব।

নাঃ, দোতলার আওয়াজটা নিশ্চয়ই ওর মনের ভুল। তা ছাড়া বাড়ি থেকে ওকে কেউ বেরোতে দেখেনি।

কিন্তু কোনও ঝুঁকি নিল না ও। ডানদিকের পথ ধরে খালের দিকটায় পা বাড়াল। ওই নির্জন রাস্তাটা ধরে অনেকটা পথ পেরিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরে ওকে দোকানঘরে পৌঁছতে হবে। তা হোক, তবু ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

সুদেব সামন্ত খালধারের রাস্তার দিকে চলে যাওয়ার প্রায় মিনিটপনেরো পর প্রমিতাকে দেখা গেল। দুটো ফুলের তোড়া প্লাস্টিকের প্যাকেটে ঝুলিয়ে হনহন করে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। মনের মতো তোড়া তৈরি করিয়ে আনার যে এত ঝকমারি তা প্রমিতা জানত না। তাই বাড়িতে ঢুকেই মেয়েকে তোড়া নিয়ে দু-চার কথা শুনিয়ে বেশ বকুনি দেবে বলে ও মনে-মনে কোমর বাঁধছিল।

ও জানত না, সুচরিতা তখন সব বকুনির বাইরে চলে গেছে।

pathagar.net

চার

pathagar.net

সাব-ইনস্পেকটার রাজতনু চ্যাটার্জির বমি পেয়ে যাচ্ছিল। নাভির কাছ থেকে বুক-গলা বেয়ে একটা মস্ত ওয়াক উঠে আসতে চাইল।

সঙ্গে-সঙ্গে ও ছুটল বাথরুমের দিকে। মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়ল বেসিনের ওপরে। ডানহাতে চটপট কলটা খুলে দিল।

বারকয়েক হেঁচকি উঠল। তারপর একটা লালার সুতো গড়িয়ে পড়ল বেসিনে। ছুটন্ত জলের ধারা এক হ্যাঁচকায় লালার সুতোটাকে টেনে নিল।

বাথরুমের দরজায় কে একজন এসে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল, 'খুব আনইজি লাগছে?'

বারকয়েক থুতু ফেলে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঘুরে তাকাল রাজতনু। দেখল, ফোরেনসিক টিমের রায় না বসু—কী যেন নাম।

শূন্যে হাত নাড়ল রাজতনু। বলল, 'আই অ্যাম ও. কে.। এরকম ডিসগাস্টিং ক্রাইম বহুদিন দেখিনি।' তারপর হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, 'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলেন?'

ফোরেনসিকের ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যাপারটা মনে হচ্ছে সাইকোপ্যাথের কাজ।'

রাজতনু ছোট্ট করে 'হুঁ' বলল। তবে ভেতরে-ভেতরে বিরক্ত হল। কারণ, ফোরেনসিকের লোকজন তাদের বিষয় নিয়ে মতামত দেবে এটাই স্বাভাবিক। সেখানে এলাকার বাইরে গিয়ে 'সাইকোপ্যাথের কাজ' এই মন্তব্য করাটা নিতান্ত অনধিকার চর্চা। তার ওপর এই এলাকাটা রাজতনুর।

'ফোরেনসিক এক্সপার্ট হিসেবে আপনার ওপিনিয়ান বলুন—।'

'হুঁ—।' গলাখাঁকারি দিলেন রায় অথবা বসু। তারপর প্যান্টে হাত ঘষতে-ঘষতে বললেন, 'যতটা পারি স্যাম্পল কালেকশান করেছি। সেরোলজিক্যাল টেস্টগুলো না করে কিছু বলা যাবে না। যদি মার্ডারার সিক্রেটর হয় তা হলে উই আর লাকি। আর যদি নন-সিক্রেটর হয় তা হলে আমাদের কপাল খারাপ বলতে হবে।'

রাজতনুর কপালে ভাঁজ পড়ল।

সাধারণত মানুষ দুরকমের : সিক্রেটর, আর নন-সিক্রেটর। সিক্রেটর যারা, তাদের ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা যায়। তাদের ব্লাড গ্রুপের মধ্যে যেসব বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অন্যান্য বডি ফ্লুইডেও—যেমন ঘাম, থুতু, চোখের জল, নাকের কফ, এরকম সবকিছুতেই—একইরকম বিশেষত্ব থাকে। এর কোনও নড়চড় হয় না।

আর যারা নন-সিক্রেটর, তাদের বেলায় এরকম কোনও মিল ফোরেনসিক বিজ্ঞান বের করতে পারেনি। তবে ভাগ্য ভালো বলতে হবে, নন-সিক্রেটরের সংখ্যা শতকরা চোদ্দোজনের বেশি নয়।

রাজতনু বলল, 'দেখুন, কী-কী পাওয়া যায়।'

ওরা দুজনে ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে চলে এল। শোওয়ার ঘরের দরজার কাছটায় তখন হইহই কাণ্ড।

অল্পবয়েসি একজন ফটোগ্রাফার নানান অ্যাঙ্গল থেকে সুচরিতার ডেডবডির ছবি তুলছে। ডক্টর মনোজ সরকার হাঁটুগেড়ে বসে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। একবার মেয়েটার পায়ের কাছে যাচ্ছেন, একবার মাথার কাছে। আঙুলের ডগা দিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে দেখছেন, বাঁ চোখের নীচের চামড়া টেনে সাদা অংশটা ঝুঁকে পড়ে জরিপ করছেন, হাতের আঙুল পায়ের আঙুল ছুঁয়ে দেখছেন, হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখছেন। সর্বত্র রান্না করা ঝোল, তরকারি, আলু, মাংস ইত্যাদির টুকরো ছড়িয়ে থাকায় খুব সাবধানে ওঁদের কাজ করতে হচ্ছিল।

রাজতনুকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর সরকার। হাত থেকে রবারের সার্জিক্যাল গ্লাভ্‌স খুলতে-খুলতে বললেন, 'লোকটা খুব স্ট্রং। পসিব্‌লি সাইকোপ্যাথ। ঘরটার কী অবস্থা করেছে দেখেছেন! আর বডির গলার কাছটা দেখুন, কীরকম কালশিটে পড়ে গেছে। আর মাথার পেছনটা মেঝেতে এমন জোরে ঠুকে দিয়েছে যে, কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে...।'

রাজতনু ডক্টর সরকারকে দেখছিল।

রং ফরসা, মাথার তালুতে টাক, ঘাড়ের পিছনে লম্বা চুল ঝালরের মতো ঝুলছে। সাদা রঙের স্ট্রাইপ্‌ড শার্ট গুঁজে পরেছেন—তবে গোঁজাটা এলোমেলো হয়ে গেছে।

মনোজ সরকারের মুখে বয়েসের ভাঁজ। নাকটা একটু বেশি লম্বাটে। হঠাৎ করে দেখলে কমিক্‌স বইয়ের ছবি বলে মনে হয়। তবে কথাবার্তা ভীষণ সিরিয়াস।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চওড়া কপাল মুছে নিলেন ডক্টর সরকার। ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দ্য কিলার ওয়জ আ ব্রুট। যখন মেয়েটাকে ও....ইয়ে....মানে, রেপ করে, তখন মেয়েটা হয়তো আর বেঁচে ছিল না। লেট্‌স ওয়েট ফর পোস্ট মর্টেম।'

'কখন মারা গেছে? টাইমটা কি ফিক্স করতে পারলেন?'

'দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে....রাইগর মর্টিস এখনও শুরু হয়নি।'

দুজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট ঘরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওদের একজন ফটোগ্রাফার ছেলেটিকে ইশারায় ডেকে নিল। তারপর রেফ্রিজারেটরের কাছে গিয়ে দরজার হাতলের কয়েক জায়গার ক্লোজ-আপ শট নিতে বলল।

খুনি যে ফ্রিজটা খুলে সসের বোতলটা বের করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কারণ, টমেটো সসের ভাঙা বোতলের টুকরোগুলোর গায়ে জলের ফোঁটা জমে ছিল। ফলে আঙুলের ছাপ-টাপ পাওয়ার কোনও আশা ছিল না। সেইজন্যই ফোরেনসিক এক্সপার্ট দুজন নিশ্চিন্তে বোতলের মুখের ভাঙা অংশটা ছুঁয়ে দেখেছে। না, ঘটনার এতক্ষণ পরে সেটাকে আর ঘরের উষ্ণতার তুলনায় ঠান্ডা বলে মনে হচ্ছে না।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের একজন রাজতনুর কাছে এগিয়ে এল। ওর হাতে একটা ছোট কৌটো। তাতে যে মিহি অ্যালুমিনিয়াম পাউডার রয়েছে সেটা রাজতনু জানে। বিভিন্ন ধরনের জিনিসের ওপরে আঙুলের ছাপ খোঁজার জন্য এই পাউডার ছড়িয়েই ডাস্টিং করা হয়। এ-কাজে সুপারফাইন বিদেশি ব্রাশ আর হাওয়া দেওয়ার জন্য সূক্ষ্ম হ্যান্ডপাম্প ব্যবহার করাটাও জরুরি।

রাজতনুর কাছে এসে দাঁড়াল ভদ্রলোক। অ্যালুমিনিয়াম পাউডারের কৌটোটা বাঁহাতের তালুতে ঠুকতে-ঠুকতে বলল, 'আমার নাম কণাদ রায়চৌধুরি। বেশিরভাগ প্রিন্টই অস্পষ্ট—ব্লার্‌ড হয়ে গেছে। ভিজিব্‌ল ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিছু নেই। তবে ক্রকারিজ, টেলিফোন, ফ্রিজ, ডাইনিং টেব্‌ল—এগুলোর পলিশ্‌ড সারফেস থেকে বেশ কিছু লেটেন্ট প্রিন্ট পাওয়া যাবে বলে এক্সপেক্ট করছি। আর ডেডবডির ফিঙ্গারপ্রিন্টও তুলে নিতে হবে। পরে প্রিন্ট কমপেয়ার করার জন্যে লাগবে। এক্সপেক্ট করছি, এক উইক কি দশদিনের মধ্যে ফুল রিপোর্ট দিতে পারব।' কথা বলতে-বলতে ঘাড় ঘুরিয়ে সুচরিতার ডেডবডির দিকে তাকাল রায়চৌধুরি। নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'মেয়েটার কপাল খারাপ। কেন যে হুট করে দরজা খুলতে গেল কে জানে!'

রাজতনু জোরে একটা শ্বাস ফেলল। এই 'কেন'টারই তো রহস্য ভেদ করতে হবে। তা ছাড়া অন্য কতগুলো প্রশ্নও রয়েছে।

দোতলা থেকে আবার বুকফাটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। কান্নাটা মাঝে-মাঝে যে থামছে তার কারণ মেয়েটার মা তখন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান সেই যে দোতলায় উঠেছেন—প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল—এখনও নামেননি।

খবরটা মানিকতলা থানায় এসেছিল লালবাজারের কন্ট্রোলরুম ঘুরে। সঙ্গে-সঙ্গে এস. আই. রাজতনু চ্যাটার্জি দুজন কনস্টেবল-অন-স্পেশাল-ডিউটিকে নিয়ে জিপে করে বেরিয়ে পড়েছে। তার আগে অবশ্য রুটিনমাফিক লগবুকে 'সিন অফ দ্য ক্রাইম'-এ রওনা হওয়ার কথা লিখেছে, জেনারেল ডায়েরিও লিখে নিয়েছে একটা।

এই বাড়িটায় পৌঁছে ভারী অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেছিল রাজতনু। সদর দরজার লকের কাছটা ভাঙা। দরজার কাছে আট-দশজন মানুষের জটলা,

কান্নাকাটি, হইচই। আর ভেতরে ঘরের দরজার কাছাকাছি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল একজন মহিলা। পরে রাজতনু জেনেছে, সে প্রমিতা—মৃত মেয়েটির মা, আর বাকিরা ওর ছেলের জন্মদিনের নেমন্তন্নে আসা আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপড়শি।

রাজতনু আর দুজন কনস্টেবল মিলে অনেক কষ্টে ভিড়টাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দোতলায়। তারপর, প্রাথমিক ইনস্পেকশানের পর, নিজের মোবাইল ফোন বের করে মানিকতলা থানার ওসিকে ফোন করেছে, সংক্ষেপে হালচাল জানিয়েছে। ওসির মৌখিক অনুমতি পেয়েই রাজতনু ফোন করেছে লালবাজারে, ডিসি ডিডি-র কাছে। সেখান থেকে ফটোগ্রাফার, ডাক্তার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট আর ফোরেনসিকের লোকজন চেয়েছে।

মানিকতলা থানায় রাজতনু চ্যাটার্জি এসেছে প্রায় তিনবছর। কিন্তু এই তিনবছরে এরকম ব্রুটাল এবং ভায়োলেন্ট ক্রাইম ও এই প্রথম দেখল।

কনস্টেবল দুজনকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে ড্রইং-ডাইনিং স্পেসটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল রাজতনু। দরকারি পয়েন্টগুলো নোট করে নিচ্ছিল ওর ডায়েরিতে। বডির পজিশান, ঘরের জানলা-দরজা ঠিক কোন-কোন জায়গায়, সদর দরজা আর শোওয়ার ঘরের দরজা থেকে ডেডবডির দূরত্ব কতটা, ঘড়িতে তখন সময় কত—এইসব খুঁটিনাটি তথ্য।

একটু পরেই বাড়িতে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়েছিল একটা মাঝবয়েসি লোক, সঙ্গে বছরপাঁচেকের একটা বাচ্চা ছেলে।

ঘরের দৃশ্য দেখে লোকটি নার্ভাস হয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল, রাজতনু শক্ত হাতে তাকে ধরে ফেলেছে।

লোকটা বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল। কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু ওর দম বোধহয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল—তাই মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছিল না। শুধু কতকগুলো অর্থহীন শব্দের টুকরো ছন্নছাড়া বুদ্বুদের মতো ভেসে আসছিল।

মৃত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভয়ানক এক আর্তনাদ করে উঠেছিল লোকটা। সে-তীক্ষ্ণ চিৎকারে জানলার শার্সিগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। তারপরই এক ঝটকায় রাজতনুর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল মেয়েটার মৃতদেহের কাছে। আহত জন্তুর মতো কর্কশ ভাঙা গলায় ডেকে উঠেছিল, 'রিতু—! আমার রিতু রে—!'

মর্মান্তিক এই ডাকটা শুনে রাজতনুর মনে হল, লোকটার হৃৎপিণ্ড যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ছোট বাচ্চাটা ততক্ষণে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে।

কয়েক সেকেন্ড যেন স্থবির হয়ে গিয়েছিল রাজতনু। তারপরই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় বুলেটের মতো ছিটকে চলে গিয়েছিল লোকটার কাছে। ডেডবডি লক্ষ করে তার

pathagar.net

শূন্যে ঝাঁপ দেওয়া শরীরটাকে মাঝপথে আঁকড়ে ধরেছিল রাজতনু। তারপর প্রবল শক্তিতে অনায়াসেই টেনে এনেছিল পিছনদিকে।

আর একটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত! শোকে-দুঃখে কাণ্ডজ্ঞান হারানো মানুষটা ডেডবডির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লে অনেক সূত্র হয়তো নষ্ট হয়ে যেত।

লোকটাকে টেনে প্রায় সদর দরজার কাছে নিয়ে এসেছিল রাজতনু। ভয়-পাওয়া বাচ্চা ছেলেটা সেখানে দাঁড়িয়েই কাঁদছিল। লোকটা বাচ্চাটাকে জাপটে ধরে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল, তারপর পাগলের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রাজতনু অনুমান করেছিল, এই ভদ্রলোকই বোধহয় পরমেশ দত্তগুপ্ত। ওরই মেয়ে সুচরিতা বিপদে পড়েছে বলে ও কোনও পুলিশ অফিসারকে রিপোর্ট করেছিল। সেই রিপোর্টটাই লালবাজারের কন্ট্রোলরুম হয়ে মানিকতলা থানায় এসে পৌঁছেছে।

একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে দিয়ে পরমেশ আর বুবুকে দোতলার দিকে রওনা করিয়ে দিল রাজতনু। ও চায় না, এখন একতলাটায় কোনওরকম জটলা, হইচই, হুড়োহুড়ি হোক। ঠান্ডা মাথায় এই খুনটাকে তলিয়ে দেখতে হবে। যদি এই খুন কোনও সাইকোপ্যাথের কীর্তি হয়ে থাকে তা হলে বলা যায় না, এটাই হয়তো তার শেষ খুন নয়—বরং বলা যেতে পারে, এটাই শুরু। কোনও সিরিয়াল কিলারের খুনের সিরিয়ালের এটাই হয়তো প্রথম এপিসোড।

পরমেশ আর বুবুকে দোতলায় পাঠিয়ে দেওয়ার একটু পরেই ওপর থেকে দুজন অল্পবয়েসি ছেলে নেমে এল। রাজতনুকে বলল, 'আমরা একটু ডাক্তারবাবুকে ডাকতে যাচ্ছি। বউদির এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'

রাজতনুকে জানিয়ে ওরা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তারের খোঁজে। আর তার একটু পরেই লালবাজার থেকে এক্সপার্টরা এসে হাজির হল। তারপর...।

ওপর থেকে তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজে রাজতনুর ঘোর ভাঙল। গলা চিরে যাওয়া কী বীভৎস কান্না! যেন কোনও পাগল স্রেফ চিৎকারের জোরে পাগলা গারদ থেকে মুক্তি চাইছে।

আজ আর বাড়ির কারও স্টেটমেন্ট নেওয়া যাবে না। বডিটা মর্গে পাঠিয়ে প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ করতে হবে। প্রমিতা-পরমেশরা কাল একটু সামলে উঠলে তখন বরং ভালো করে কথা বলা যাবে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ওসিকে আবার ফোন করল রাজতনু। সংক্ষেপে ওর কথা জানাল। কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ওর খেয়াল হল, কণাদ রায়চৌধুরি ওর সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবখানা এমন যেন রাজতনুর কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

মোবাইল ফোনে কথা শেষ করল রাজতনু।

আর কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না ওর। তবু বলতে-হয়-তাই এমন ঢঙে বলল, 'টেলিফোন রিসিভারটা ডাস্টিং করেছেন? ওখানে কিছু পাওয়া যেতে পারে?'

ঠোঁট ওলটাল কণাদ : 'ডাস্টিং করেছি। তবে দেখা যাবে হয়তো মেয়েটারই আঙুলের ছাপ রয়েছে।'

টেলিফোন রিসিভারটা মেঝেতে পড়ে ছিল। খুনি যখন অ্যাটাক করে তখন কি সুচরিতা ফোনে কথা বলছিল? নাকি খুনির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময় ও রিসিভারটা তুলে নিয়ে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করেছিল? অবশ্য পোস্ট মর্টেম না হলে ধস্তাধস্তির লেভেলটা ঠিক বোঝা যাবে না। ডক্টর সরকার তো বলছেন লোকটা খুব স্ট্রং। তা হলে...।

ঠোঁট কামড়াল রাজতনু চ্যাটার্জি। প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন।

সুচরিতার মা-বাবাকে প্রশ্ন করার জন্য ও ছটফট করছিল। ওর ভেতরে যে প্রশ্নের ঝড় উঠেছে তাকে শান্ত করতে গেলে প্রমিতা আর পরমেশের সঙ্গে কথা বলতেই হবে, প্রশ্নও করতে হবে অনেক।

শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে তাকাল রাজতনু। দরজার কাছেই ক্যামেরাবন্দি ফ্রিজ শটের মতো পড়ে আছে মেয়েটা। ওর মুখের যেটুকু রাজতনু দেখেছে তাতে অনায়াসেই বলা যায়, মেয়েটা দারুণ সুন্দরী—ছিল। ওর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল।

ও লক্ষ করল, মেয়েটার মুখে লেগে থাকা টমেটো সসের ওপরে মাছি বসছে। মেয়েটার রূপসী মুখেও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজতনু। রঙিন কাগজের ফুল, চকচকে রুপোলি ফিতে, রংচঙে বেলুন দিয়ে সাজানো ঘরে এই সুন্দরী মেয়েটা কী বীভৎস বেমানান ঢঙে পড়ে আছে। ঘরের ওপরদিকে তাকালে একরকম দৃশ্য—আর নীচের দিকে চোখ নামালেই অন্যরকম। এরকম কনট্রাস্ট চট করে দেখা যায় না।

রাজতনুর দাদা হায়দরাবাদে চাকরি করে। বউদিকে নিয়ে সেখানেই থাকে। ওদের একটা ফুটফুটে মেয়ে আছে—বয়েস চোদ্দোর কাছাকাছি হবে। এখনও স্কুল ছাড়েনি।

রাজতনুর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। সুচরিতার জায়গায় হঠাৎই ও যেন ওর ভাইঝিকে শুয়ে থাকতে দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর গা গুলিয়ে উঠল, মাথাটা চক্কর খেয়ে যেতে চাইল। ওঃ!

মাথা ঝুঁকিয়ে রগের কাছটা দু-আঙুলে টিপে ধরল রাজতনু।

ডক্টর সরকার ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীর খারাপ লাগছে, মিস্টার চ্যাটার্জি?'

pathagar.net

রাজতনু মুখ না তুলেই মাথা নাড়ল। ওর বাঁহাত চলে গেল কোমরে বাঁধা হোলস্টারে। রিভলভারের ধাতু খুঁজে পেল আঙুল। একইসঙ্গে খুঁজে পেল ভরসাও।

ও মাথা সোজা করে সরাসরি তাকাল ডক্টর সরকারের চোখে। বলল, 'আই অ্যাম ও. কে. ডক্টর সরকার।'

একটু সময় নিয়ে কণাদের দিকে তাকাল রাজতনু। খবর পড়ার মতো আবেগহীন ঢঙে বলল, 'মিস্টার রায়চৌধুরি, আপনারা চটপট বাকি কাজ সেরে নিন। মেক ইট রিয়েল কুইক।'

কণাদ প্রায় অ্যাবাউট টার্ন করে ওর সঙ্গীর কাছে রওনা দিল।

রাজতনু ছন্নছাড়া ঘরটা দেখছিল। আ ন্যাস্টি মেস। তারই মাঝে হতমান হতপ্রাণ ছত্রখান সুন্দরী মেয়েটা কেমন অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গেছে।

ভাইঝির কথা মনে পড়ে রাজতনুর ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ও দাঁতে দাঁত চেপে মনে-মনে বলে উঠল, 'এই লোকটাকে আমার চাই! আই ওয়ান্ট টু ন্যাব দ্য ব্লাডি কিলার।'

হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল রাজতনু। নাঃ, যেভাবে হোক এই সিরিয়াল কিলারের সিরিয়াল প্রথম এপিসোডেই খতম করতে হবে।

খতম, খতম, খতম!

পাঁচ

পরমেশ বইয়ের খোলা পাতার ওপরে ঝুঁকে বসেছিল। অথচ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কারণ, চোখের জল ফোঁটায়-ফোঁটায় ঝরে পড়ছিল চশমার কাচের ওপরে। সেখান থেকে ধীরে-ধীরে গড়িয়ে ফ্রেমের দিকে। তারপর 'টুপ' করে বইয়ের পাতায়।

বইয়ের ছাপা অক্ষরগুলো চশমার কাচ আর চোখের জলের ভেতর দিয়ে ঝাপসা বিকৃতভাবে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎই পরমেশের মনে হল, কাচের প্রতিসরাঙ্ক সাধারণত ১.৫১, জলের ১.৩৩—কিন্তু চোখের জলের কত?

বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা হলেও সুচরিতাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল পরমেশ।

একটা পারফিউমের শিশি মুঠো করে মুখের সামনে ধরে মাইকে কথা বলার ঢঙে অভিনয় করছিল সুচরিতা।

'—তো আপনি জিতে নিয়েছেন এক হাজার টাকার ক্যাশ প্রাইজ! আর আপনার ছেলে-বন্ধুর জন্যে আরও এক হাজার টাকা! কনগ্র্যাচুলেশন্‌স, প্রিয়া! প্রাইজ জিতে আপনার কেমন লাগছে? ফ্যান্টাস্টিক নিশ্চয়ই! আপনাদের দুজনের প্রাইজ জেতার অনারে এবার তা হলে শুনুন ফ্যান্টাস্টিক একটা ডুয়েট সং...হচ্ছে, বাপি?'

শেষ কথাটা পরমেশকে লক্ষ করে।

পরমেশ ভেজিটেব্‌ল চপে কামড় দিতে গিয়ে থমকে গেল। হেসে বলল, 'হচ্ছে না মানে! দারুণ হচ্ছে! আমি তো আর-একটু হলে রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে ভলিয়ুম কমাতে যাচ্ছিলাম।'

'ধুৎ!' নাক কোঁচকাল সুচরিতা। প্রমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাপির সবসময় শুধু ইয়ারকি!' তারপর পরমেশের দিকে ফিরে আবার : 'নাও, এবার একটু অ্যাটেনশান দাও। এবার লাস্ট পার্টটা শোনাচ্ছি...।' হঠাৎই ঢং বদলে একটা হাত পিছনে দিয়ে স্মার্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল সুচরিতা। বলল, 'এইখানে শেষ হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান "গান, শুধু গান"। কাল এইসময়ে আবার আসব একরাশ রঙিন ফুলের মতো মিষ্টি-মিষ্টি গান নিয়ে। "তোমার হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন পয়েন্ট ফোর. এফ. এম."-এ। ও. কে.। বাই। আজ তা হলে যাই। সি য়ু...কেমন হল, বাপি?'

কেমন হল? আজ তা হলে যাই। সি য়ু।

এটা কেমন হল!

ঘোর কেটে গিয়ে যেন চমকে উঠল পরমেশ। রিতুর গলা শোনা গেল না! পরমেশের কানে স্পষ্ট রিতুর গলার রেশ বাজছে : 'ও. কে.। বাই। আজ তা হলে যাই।'

pathagar.net

ওঃ!

চোখ বুজে ফেলল পরমেশ। মেয়েটার বড় শখ ছিল এফ. এম. চ্যানেলে বা টিভিতে প্রেজেন্টার হবে। খুব শখ মিটেছে!

ভেতর থেকে উথলে আসা কান্নাটাকে প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করল পরমেশ। ঠোঁট কামড়াল। চোয়াল শক্ত করল। কিন্তু পারল না। হেরে গেল। চোখ-মুখ বিকৃত করে মিহি স্বরে গুঙিয়ে উঠে কেঁদে ফেলল একান্ন বছরের লোকটা।

শুধু এখন নয়—গত সাতদিন ধরেই এভাবে কেঁদে চলেছে পরমেশ। কখনও-কখনও কান্না লুকোতে পেরেছে, কখনও আবার পারেনি। লোকজনের সামনেই সব-হারানো বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছে।

সোমবার কি মঙ্গলবার রিতু হঠাৎ চোখের সামনে দেখা দিয়েছে। চাপা গলায় ধমক দিয়েছে : 'কী হচ্ছে, বাপি! এভাবে সিন ক্রিয়েট কোরো না।'

অবাক হয়ে তাকিয়েছে পরমেশ। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার!

রান্নাঘরের সামনে চেরি রং ফ্রিজের পাশটায় এলোচুলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিতু। ওর মাথার চারপাশে বিচিত্র এক আলোর আভা। ওকে ঘিরে আলোর কতগুলো সূক্ষ্ম কণা ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক যেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে প্রতিপ্রভ ইলেকট্রনের দল।

পরমেশ যন্ত্রণায় ভেঙেচুরে যাওয়া গলায় কোনওরকমে বলেছে, 'আমি আর পারছি না, রিতু! আর সইতে পারছি না রে...।'

'ছিঃ, বাপি, পারতে তোমাকে হবেই! তুমি যদি না সইতে পারো তা হলে মামকে সামলাবে কে? তা ছাড়া বুবু আছে না! ওর কথাটা একবার ভাবো! অনেকের তো সেটুকুও থাকে না...।'

মেয়ের বকুনি খেয়ে পরমেশ নিজেকে ভাঙচুর থেকে রুখতে চেষ্টা করেছে। চোখের জল মুছে বারকয়েক ঢোঁক গিলে মাথা তুলে তাকিয়েছে।

অমনি দ্যাখে সুচরিতা নেই। শুধু কয়েকটা আলোর কণা শূন্যে মাতালের মতো পাক খাচ্ছে।

সেই শুরু।

তারপর থেকে প্রায় রোজ রিতু আসে। কথা বলে।

চোখের জল পড়ে-পড়ে বইয়ের পাতাটার একেবারে বারোটা বেজে যাচ্ছিল। বইটা লাইব্রেরির বই। চমকে চেতনা ফিরে পেল পরমেশ। চোখ থেকে তাড়াতাড়ি চশমা খুলে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ আর গাল মুছল। ভাঙা গলায় ডুকরে উঠল, 'রিতু! রিতু!'

কথাগুলো খালি কড়াইয়ে খুন্তি ঘষার শব্দের মতো শোনাল। ওর মুখের ভেতরে জিভটা যেন পাটের টুকরো।

শূন্য থেকে অদৃশ্য রিতু বলে উঠল, 'আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, বাপি...ওঃ...।'

সেই রবিবার রাতের পর থেকে সাতটা দিন যে কীভাবে কেটেছে!

সাতদিনে সাতবার সূর্য উঠলেও পরমেশের কাছে দিনগুলো একটানা সুদীর্ঘ এক রাত হয়েই থেকেছে। বারবার ওর মনে হচ্ছিল, এটা ওদের বাড়ি নয়—অন্য কারও বাড়ি। এরকম একটা নৃশংস ঘটনা ওর জীবনে ঘটেনি—ঘটেছে অন্য কারও জীবনে। অসাড় হয়ে যাওয়া চেতনা নিয়ে পরমেশ যেন স্থবির দর্শক হয়ে সবকিছু নির্লিপ্তভাবে দেখছে।

কিন্তু গত বৃহস্পতিবার, সুচরিতার শ্রাদ্ধের দিন, ভোরবেলা—ঠিক ঘুম ভাঙার আগে—সুচরিতাকে স্বপ্নে দেখেছে পরমেশ।

হালকা সবুজ একটা চুড়িদার পরে আছে সুচরিতা। দারুণ সেজেছে। চোখে আই লাইনার, ঠোঁটে গাঢ় রঙের লিপস্টিক। কী সুন্দর দেখাচ্ছে! প্রগাঢ় স্নেহে মেয়েকে দেখছিল পরমেশ। যেন প্রকৃতির অফুরান সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

হঠাৎই ও খেয়াল করল সুচরিতার হাতে একটা কর্ডলেস মাইক। এবং ও হাত-পা নেড়ে প্রেজেন্টারের ঢঙে কীসব বলছে। আর ওর দিকে তাক করে সিনে-ক্যামেরা চলছে।

কিন্তু পরমেশ ওর কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছিল না। তাই নীরব চিৎকার করে বারবার বলতে চাইছিল, 'তোর কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না, রিতু। জোরে বল। আরও জোরে বল—।'

কিছুক্ষণ পর রিতু একচিলতে হাসল। কিন্তু হাসতে গিয়ে ব্যথায় ওর মুখটা কুঁকড়ে গেল। ও বলে উঠল, 'ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, বাপি...।'

'কী হয়েছে, রিতু? কী হয়েছে রে?'

'ভী-ষ-ণ কষ্ট হচ্ছে, বাপি। কিছু একটা করো—।'

পরমেশের বুকের ভেতরটা কেউ যেন হামানদিস্তে দিয়ে থেঁতো করতে লাগল।

'কী হয়েছে, রিতু?' ছটফট করতে-করতে জিগ্যেস করল পরমেশ।

'কিছু একটা করো, বাপি। ভী-ষণ কষ্ট হচ্ছে...।'

কথাগুলো বলেই সুচরিতার ছবিটা মিলিয়ে গেল।

রিতুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করতে বলছে ও?

সুচরিতার শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারটা সেদিন মিটে গেল। লোকজন তেমন কাউকেই বলা হয়নি—আত্মীয় বলতে ওর ছোটকাকা, ছোটমাসি আর ছোটমেসো। এ ছাড়া পাড়ার দু-তিনজন বর্ষীয়ান মানুষ, আর অরিন।

আর-একজন এসেছিল অনাহূতভাবে। মানিকতলা থানার সাব-ইনস্পেকটার রাজতনু চ্যাটার্জি। সাদা পোশাকে সারাক্ষণ চুপটি করে পুজো-পাঠের জায়গায়

pathagar.net

দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে-মাঝে ঘোর লাগা চোখে সুচরিতার ফটোর দিকে দেখছিল।

ফটোটা এমন জীবন্ত ছিল যেন সুচরিতা উজ্জ্বল চোখে সরাসরি তাকিয়ে আছে। ওর চোখ আর ঠোঁট হাসছে। এই বুঝি খিলখিল শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে।

শুধু ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধ মনে করিয়ে দিচ্ছিল মেয়েটা আসলে আর নেই।

pathagar.net

পরমেশের বেশ মনে পড়ছে, বুবু সেদিন ওকে আর প্রমিতাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে পাগল করে দিয়েছিল। কাঁদছিল আর বারবার জিগ্যেস করছিল, 'দিদি কোথায় গেছে? আসছে না কেন? দিদিকে তোমরা সবাই পুজো করছ কেন?' আর থেকে-থেকেই ফটোর সুচরিতাকে 'অ্যাই দিদি! অ্যাই দিদি!' বলে কান্নার গলায় ডেকে উঠছিল।

পাথর প্রমিতা মেঝেতে লেপটে বসে শূন্য চোখে মেয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর ছোট বোন পাশে বসে দু-হাতে আঁকড়ে ছিল ওকে। যেন দিদিকে কিছুতেই ও হারিয়ে যেতে দেবে না।

শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারটা মিটে গেলেও রিতুর কষ্ট মিটল না। ওর আসা-যাওয়া চলতেই থাকল। ফ্রিজের পাশটায় ও বারবার পরমেশকে দেখা দিতে লাগল।

ফ্রিজটা সুচরিতার খুব ফেবারিট ছিল। কারণ, যখন-তখন ও ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জলের বোতল বের করে ঢকঢক করে গলায় ঢালত। প্রমিতা বা পরমেশের 'ঠান্ডা লাগবে! ঠান্ডা জল খাস না! ঠান্ডা লাগবে বলছি!' এসব গার্জেনি চিৎকারে মোটেই কর্ণপাত করত না। বরং জল-টল খাওয়া হয়ে গেলে হাত দিয়ে মুখ মুছে জিগ্যেস করত, 'কী বলছ, মাম?'

প্রমিতা গজগজ করে বলত, 'কী আর বলব! যেদিন ঠান্ডা লাগবে সেদিন বুঝবি!'

পরমেশ লক্ষ করেছে, প্রমিতা মাঝে-মাঝে ফ্রিজ খুলে দেখে নেয় জলের বোতলগুলো ভরতি আছে কিনা। ওর এখনও ধারণা, সুচরিতা এসে ঢকঢক করে ঠান্ডা জল খেয়ে যাবে। তাই পরমেশকেও কয়েকবার সাবধান করেছে, 'তুমি যেন বোতলগুলো শেষ করে রেখে দিয়ো না!'

পরমেশ সহজভাবেই বলেছে, 'না, না! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—।'

কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে, প্রমিতা এখনও বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে বাঁচতে চাইছে। ঘোর লাগা আলেয়ার জগৎটাকে ও যেন আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

রবিবারের পর থেকে প্রমিতা দোতলা বাড়িটার এখানে-সেখানে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। ঠিক যেন অতৃপ্ত এক প্রেত-ছায়া। কখনও-কখনও ওকে ঘুমিয়ে-চলা রুগির মতো মনে হয়। দিগভ্রান্ত এক অন্ধ মানুষ যেন খেয়ালখুশি মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো আদরের মেয়েটাকে জীবন বাজি রেখে খুঁজছে।

কাহিল হয়ে পড়েছে পরমেশও।

ওর চোখে সবসময় জ্বরের উষ্ণতা। মাথার দুপাশে গাঢ় দপদপানি। জিভ খসখসে। খাদ্যনালীটা বোধহয় সরু হয়ে গেছে। কারণ, খাবার সহজে গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। প্রথম দুটো দিন তো ও আর প্রমিতা এককণা খাবারও মুখে দিতে পারেনি। ভাগ্যিস বুবু ছিল! বুবুকে আঁকড়ে ধরেই ওরা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছে।

এর মধ্যে কমলেশ একদিন ওর স্ত্রী মউ আর ছেলে পাপুনকে নিয়ে এসেছিল। ও অনেক করে দাদা-বউদিকে বুঝিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। দাদাকে বলেছে, 'চলো, তুমি, বউদি আর বুবু আমাদের বাড়িতে ক'টাদিন থেকে আসবে। তোমরা কেন বুঝছ না, নিয়তির ওপরে কারও হাত নেই...।'

পরমেশ মাথা ঝুঁকিয়ে ভাইয়ের কথা শুনছিল। ও হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলেছে, 'না রে, আমরা এখানেই থাকব—কোথাও যাব না। এটাই আমাদের নিয়তি...তুই ঠিকই বলেছিস, নিয়তির ওপরে কারও হাত নেই...।'

কমলেশ আর মউ অনেকবার করে পরমেশ-প্রমিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এ-কথাও বলেছে, 'ক'টাদিন বুবু পাপুনের সঙ্গে থাকলে ওর মনটা নরমাল হবে—' কিন্তু প্রমিতা যেতে না চাওয়ায় সেটাও আর হয়ে ওঠেনি।

পরমেশ বা প্রমিতা ওদের বলতে পারেনি রিতু মাঝে-মাঝে ওদের দেখা দেয়, কথা বলে। এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে রিতুর সঙ্গে ওরা কথা বলবে কেমন করে?

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে কমলেশরা চলে গেছে। শোকমহলের বাসিন্দা হয়ে থেকে গেছে প্রমিতা আর পরমেশ।

আজ সকালেও রিতুকে স্বপ্নে দেখেছে পরমেশ। ইশারা করে কী যেন বলতে চাইছে। বোধহয় সেই কষ্টের কথাটাই বলছে। আর বলছে, 'কিছু একটা করো! কিছু তো একটা করো, বাপি!'

পরমেশ এসব ভাবছিল, আর নিজেকে চোখ ঠারছিল। রিতু কী চাইছে সেটা যেন ও বুঝেও না বোঝার ভান করছিল।

আসলে রিতু বিচার চাইছে—ন্যায়বিচার।

কিন্তু তার জন্য তো আদালত আছে, পুলিশ আছে! পঞ্চাশ-পেরোনো একজন প্রৌঢ় অধ্যাপকের বিচারের কী ক্ষমতা আছে! রিতু কি এটা জানে না! জানে না, ওর বাপির আসলে কোনও ক্ষমতাই নেই!

স্বপ্নটা দেখতে-দেখতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পরমেশের। আর তারপরই ও কপালে হাত রেখে হতাশায় কেঁদে ফেলেছিল। বোধহয় বুঝতে পারছিল, এই কান্নার ক্ষমতাটুকুই এখন ওর একমাত্র সম্বল। ঈশ্বর যেন এটুকুও কেড়ে না নেন।

এইসব ভাবতে-ভাবতে পরমেশ বারবার চোখ মুছছিল। ওর ফরসা মুখ লালচে

pathagar.net

হয়ে গেছে। নাক দিয়ে জল ঝরছে। বুকের জ্বালাটা কমছে না কিছুতেই।

'তোর ভয় কীসের! আমি তো আছি!'

ছোট্ট সুচরিতাকে সবসময় এই কথাই বলে এসেছে পরমেশ।

তখন ওর বয়েস কত হবে? এই আট-সাড়ে আট বছর। ওকে নিয়ে প্রমিতা আর পরমেশ সাথির মোড়ে সার্কাস দেখতে গিয়েছিল। সেখানে বাঘ-সিংহের খেলা দেখার সময় ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল রিতু। মাকে জাপটে ধরে মুখ গুঁজে দিয়েছিল শাড়ির ভাঁজে। তখন ভয়-পাওয়া মেয়েটার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করেছিল দুজনে। পরমেশ বারবার বলেছিল, 'তোর কীসের ভয়! আমি তো আছি!'

ওকে আরও বুঝিয়েছিল পরমেশ : 'শোন, রিতু, বাঘ-সিংহ হল পশু। ওদের মাথায় বুদ্ধি নেই। দেখছিস না, রিং মাস্টার ওদের কেমন শাসন করছে! মানুষের ক্ষমতা পশুর চেয়ে অ-নেক বেশি।'

কথাটা মনে পড়তেই বুকের জ্বালাটা যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। পরমেশ শুনতে পেল রিতু বলছে, 'তোমার কথা সত্যি না, বাপি। দেখলে তো, এই পশুটা কী করল! তোমাদের শাসন শুনল না...।'

পরমেশের মনে পড়ছিল, কতবার—আরও কতবার ও সুচরিতাকে, বুবুকে বলেছে, 'কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি!'

যখন সুচরিতাকে ওই পশুটা ছিন্নভিন্ন করছিল তখন পরমেশ কোথায় ছিল! ছিল—টেলিফোনের আর-এক প্রান্তে। মেয়ের শেষ হয়ে যাওয়া ও চোখে না দেখলেও তার ধারাবিবরণী শুনেছে।

শুনে কী করতে পেরেছে ও? কান্না ছাড়া?

'তোর কীসের ভয়! আমি তো আছি!'

হুঁঃ! কথাগুলো এখন কী ফাঁপা আর মিথ্যে শোনাচ্ছে!

পরমেশের ভেতরে রাগ উথলে উঠল এবার। যে-শুয়োরের বাচ্চাই এই কাজ করে থাকুক তাকে একবার হাতের মুঠোয় চাই। একটিবার। মুখহীন লোকটাকে মনে-মনে ঘুসি মারল পরমেশ। সজোরে লাথি কষাল। রান্নাঘরের তাক থেকে একটা চপার নিয়ে এসে অন্ধের মতো কোপাল। তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে চপার ফেলে দিয়ে লোকটার গলা টিপে ধরল। প্রাণপণে চাপ দিতে লাগল। লোকটার লাল জিভটা বাইরে বেরিয়ে এল। সাপের মতো নড়তে লাগল। তারপর...তারপর...।

তারপর পরমেশ কেঁদে ফেলল আবার। দু-হাতের ওপরে মাথার ভর রেখে অবসন্নের মতো হাঁপাতে লাগল। যেন এইমাত্র ও সত্যি-সত্যি কারও সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে এসেছে।

সোমবার থেকে সায়েন্স কলেজে যায়নি পরমেশ। ফোন করে ডিপার্টমেন্টাল হেডকে সংক্ষেপে অসুবিধের কথা জানিয়েছে। বলেছে, একটা দুর্ঘটনায় মেয়ে মারা

গেছে। না, কারও আসার দরকার নেই। কারণ, ও নিজে অসুস্থ, আর স্ত্রীও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও আশা করছে সামনের সোমবার কি মঙ্গলবার জয়েন করতে পারবে।

এখন পরমেশের কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর সান্ত্বনা আর সমবেদনা। ও এমন ধরনের মানুষ যে একা-একা দুঃখ সইতে ভালোবাসে। ওর চোখের জল ও নিজেই মুছে নিতে পারবে। আর সেইদিনই ও চোখের জল পুরোপুরি মুছবে যখন রিতুর খুনি ওই নরপশুটা মোক্ষম শাস্তি পাবে।

কিন্তু কী করে?

সাব-ইনস্পেকটার রাজতনু চ্যাটার্জি ওর সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। কেন জানি না, ভদ্রলোক যেন পরমেশদের অনেকটা আত্মীয়ের মতন হয়ে গেছে।

রিতুর মৃত্যুর খবরটা যেন কাগজে-কাগজে না ছাপা হয় রাজতনুকে সেই অনুরোধ করেছিল পরমেশ। রাজতনু অনুরোধটা পুরোপুরি না হলেও অনেকটা রেখেছিল। মাত্র চারলাইনের খবর ছাপা হয়েছিল তিনটে কাগজে। তাতে শুধু এলাকার কথা বলা হয়েছিল—কারও নাম ছিল না।

পরমেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত এলোমেলো পা ফেলে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে গেল। চোখ মেলে তাকাল নিজের দিকে।

স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা পরা পঞ্চাশ-ডিঙিয়ে-যাওয়া একটা লোক আয়নায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথার লম্বা-লম্বা চুলে বেশ কয়েকটা রুপোলি রেখা। মুখে কয়েকদিনের খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। নাকের দুপাশে চশমার গাঢ় দাগ। চোখ লাল। চোখের পাতা ফুলে রয়েছে। লাল নাকের ডগাও।

নিজের দু-হাতের দিকে তাকাল পরমেশ। মাস্‌লগুলো এখনও, এই বয়েসেও, চোখে পড়ছে। বয়েসকালে পরমেশ লোহা নিয়ে ব্যায়াম করত, কঙ্গো আর ট্রিপ্‌ল বাজাত, প্রমিতার জন্য কবিতা লিখত—তখন অবশ্য ওদের বিয়ে হয়নি।

তারপর—চাকরিতে ঢোকার পর—বন্ধুদের নিয়ে অর্কেস্ট্রা-দল তৈরির স্বপ্ন মুছে গেছে, বিয়ের পর কবিতা লেখা থেমে গেছে, কিন্তু ব্যায়াম কখনও পুরোপুরি থামেনি। এখনও পরমেশ ভোরবেলায় হাঁটতে বেরোয়, আর অ্যাবডোমেন ট্রিমার 'ইজি এক্সা' নিয়ে হালকা ব্যায়াম করে। এ নিয়ে রিতু আর প্রমিতা ওকে কম ঠাট্টা করত না।

হাত ভাঁজ করল পরমেশ। মাস্‌লগুলো দেখল খুঁটিয়ে। বোঝা যায়, এখনময় ওরা চর্চিত হয়েছে। তবে ব্যাপারটা অনেকটা গ্রীষ্মের শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতন—অতীতের কোনও বর্ষায় যার অহঙ্কার ছিল।

দু-বাহুতে জোরে-জোরে চাপড় মারল পরমেশ। ব্যথা লাগল। কিন্তু অন্যকে ও ব্যথা দিতে পারবে তো! রিতু যে বারবার দেখা দিয়ে বলছে, 'কিছু একটা

pathagar.net

করো! কিছু একটা করো!' পরমেশ সেই 'কিছু একটা' করতে পারবে তো!

এ ক'দিনে অধৈর্য হয়ে প্রমিতা আর পরমেশ বহুবার তাগাদা করেছে রাজতনুকে।

'রিতুর মার্ডারারকে ধরতে পারলেন?'

'নাঃ, এখনও ওরকম কোনও ক্লু পাইনি।'

'ইলেকট্রিক মিস্তিরি ওই ছেলেটাকে ভালো করে ইন্টারোগেট করুন। ও-ই মেন সাসপেক্ট। ওর কাছ থেকেই হয়তো কোনও ক্লু পাবেন—।'

একসময় বিরক্ত হয়ে রাজতনু বলেছে, 'দেখুন, মিস্টার দত্তগুপ্ত, আমাদের কাজটা আমাদের করতে দিন। খুনি ধরার কাজটা সহজ নয়। উই আর আপ এগেইন্‌স্ট আ ভেরি ক্রুকেড কিলার। আপনি বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নিন। আই নো য়ু নিড ইট।'

সোজা কথায় 'আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন।' তার মানে পরমেশ বা প্রমিতার এখন কিছুই করার নেই—বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া!

বিশ্রাম! অথচ রিতু যে পরমেশকে বারবার কিছু একটা করতে বলছে! তা হলে কী করবে পরমেশ?

হঠাৎই পরমেশের ভিতরে যেন একটা মোক্ষম তার ছিঁড়ে গেল। আয়নার দিকে তাকিয়ে ও পাগলের মতো নিজের দু-গালে ঠাস-ঠাস করে ভয়ঙ্করভাবে চড় কষাতে লাগল। আর কাঁদতে লাগল হাউহাউ করে। ওর চোখের সামনে আয়না ঝাপসা হয়ে গেল।

তাই ও বুঝতে পারেনি প্রমিতা কখন এসে ওর পিঠে হাত রেখেছে।

নরম গলায় প্রমিতা বলল, 'এ কী ছেলেমানুষি করছ! রিতু কষ্ট পাবে যে—।'

অশ্রুজলে অন্ধ চোখে ঘুরে দাঁড়াল পরমেশ। বানে ভেসে যাওয়া মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো প্রমিতাকে জাপটে ধরল। এত আবেগে ও কোনওদিনও প্রমিতাকে জড়িয়ে ধরেনি।

তারপর পথ-হারানো ভয়-পাওয়া দুই শিশুর মতো ওরা আকুল কান্নায় ভেসে গেল।

ছয়

সন্ধে তখনও নেমেছে কি নামেনি, পাখিরা ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। সামনের মহুয়া গাছে চড়ুইপাখিদের লাগাতার কিচিরমিচির। ওদের লাফালাফি ছটফটানিতে মহুয়ার আম্রপল্লবের মতো বড়-বড় পাতাগুলো নড়ছে, তিরতির করে কাঁপছে।

দোকানের দরজায় বসে সুদেব পাখিদের দেখছিল। সারাদিন নানান কাজের পর এখন বেশ ক্লান্ত লাগছে। ঘুমে চোখ টানছে।

সুদেবের দোকান আর থাকার আস্তানা একই। দোকানঘরের সামনেটায় ছড়ানো যন্ত্রপাতি, তারের কাটিম, মোটর, ফ্যান, টেস্ট ল্যাম্প, ঘড়াঞ্চি এসব পেরিয়ে পিছনদিকটায় ওর থাকা-খাওয়ার জায়গা। এককোণে স্টোভ, থালা-বাটি-গ্লাস—ওর 'রান্নাঘর'। আর তার পাশটিতেই ছোটমাপের তক্তপোশ। তক্তপোশের লাগোয়া নোংরা দেওয়ালে তিন-চারটে নোংরা পোস্টার। বোধহয় মদের কোম্পানির ক্যালেন্ডার ছিঁড়ে জোগাড় করা। ছবিগুলো পুরোনো—বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

তক্তপোশের মাথার দিক থেকে হাতদুয়েক দূরে একটা ছোট টেবিলে বসানো একটা সাদা-কালো টিভি। তার পাশে একটা ছোট টুলের ওপরে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো।

দোকান আর থাকার জায়গাটার মাঝে চটের বস্তা দিয়ে পার্টিশান দেওয়া। সেই পার্টিশানের ওপর—দোকানের দিকটায়—আলপিন দিয়ে গাঁথা একটা ভদ্র-সভ্য ক্যালেন্ডার আর ফ্যান কোম্পানির দুটো ছোট পোস্টার।

দোকান বন্ধ হলেও সুদেব দোকানের দরজা পুরো বন্ধ করে না। তিনভাঁজের কাঠের পাল্লার একটা পাট খুলে রাখে। পাড়ার লোকেরা জানে, এক পাট খুলে রাখা মানে দোকান 'বন্ধ'। তখন হাজার কাকুতি-মিনতি করলেও সে কোনও কাজ নেয় না, কাজের কথা শোনেও না।

এখন সেই 'বন্ধ' দোকানের দরজার ধাপিতে বসে সুদেব আলতো চোখে চারপাশে দেখছিল।

একটু দূরেই ফুটপাতের ওপরে কর্পোরেশনের কল। সেখানে একটা নীল রঙের প্লাস্টিকের বালতি বসানো। তার পিছনেই একটা হাঁড়ি আর একটা প্লাস্টিকের জেরিক্যানের লাইন। দুটো মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। হয়তো ওদেরই কারও বালতি ভরতি হচ্ছে।

মেয়ে দুটোর একজনের ফ্রক, আর-একজনের চুড়িদার। বয়েস চোদ্দো কি পনেরো। একজন ফরসা, একজন কালো। কালোটা বেশ ডাগর। মুখটা গোল,

pathagar.net

ছোট্ট নাক, পিঠে ঝুলছে মোটা বিনুনি। পায়ে সস্তা চটি, ফাটা গোড়ালি।

সুদেব কলটার দিকে তাকাল। কলের মাথা বলে কিছু নেই—শুধু ইঞ্চিপাঁচেক লম্বা পাইপ একটা। তার মুখ দিয়ে সরু ধারায় জল পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে, একটু পরেই জল চলে যাবে।

কালো মেয়েটা মাঝে-মাঝেই কলের দিকে তাকিয়ে জলের হাল-হকিকত দেখছিল। আবার গল্প করছিল বন্ধুর সঙ্গে। মাঝে-মাঝে খিলখিল হাসিতে বেঁকেচুরে যাচ্ছিল।

বাতাসে কেক আর পাঁউরুটির গন্ধ পাচ্ছিল সুদেব। রোজই পাওয়া যায়। কারণ, সামনের তেমাথার মোড়ের ওপাশের ফুটপাতে একটা বড়সড় বেকারি—ওখানে নানারকম কেক-পাঁউরুটি তৈরি হয়। এখন বেকারির সামনে অনেকগুলো সবুজ রঙের সাইকেল-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। খুব ভোরবেলা এই গাড়িগুলো কেক আর পাঁউরুটি বোঝাই করে বিলি করতে বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দর গন্ধটা সুদেবকে ক্ষুধার্ত করে তুলল। ওর মনে হল, তেমাথায় ফুটপাতের কোণে বুলিদার পাঁচমিশেলি দোকানে গিয়ে একজোড়া বিস্কুট কিনে খায়। বুলিদার দোকানে সুদেবের মাসকাবারি খাতা আছে।

কিন্তু উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়ল।

কারণ, দেখল কলের জল খুব সরু হয়ে আসায় কালো-কোলো মেয়েটা উবু হয়ে বসে পড়েছে। একহাতে কলের পাইপটা চেপে ধরে অন্যহাতের তালু দিয়ে কলের মুখটা বারবার চেপে ধরছে আর ছাড়ছে। তাই দমকে-দমকে জল পড়ছে।

মেয়েটা সুদেবের দিকে মুখ করেই উবু হয়ে বসেছিল। ফলে ওর দিকে তাকিয়ে সুদেব কল্পনার ঘুড়ি মেলছিল। আর সুদেবের শরীরটা ধীরে-ধীরে শক্ত হয়ে উঠছিল।

মেয়েটা কলের নলটা চেপে ধরেছিল। কল থেকে জল একবার পড়ছে, একবার থামছে। একবার পড়ছে....একবার থামছে....।

সুদেব ঘামতে শুরু করল। মেয়েটা উবু হয়ে বসে মুঠো করে কী চেপে ধরেছে? কলের পাইপ? নাকি...?

মেয়েটা দেখল জল সত্যিই চলে যাচ্ছে বোধহয়। তাই মরিয়া হয়ে কলে মুখ দিয়ে প্রাণপণে জল টানতে চেষ্টা করল। চোষার টানের চোটে ওর গাল গর্ত হয়ে বসে যেতে লাগল বারবার।

উবু হয়ে বসে পাইপে মুখ দিয়ে জল টানতে থাকা কালো ডাগর মেয়েটাকে নেশা-ধরা চোখে লক্ষ করছিল সুদেব। ওর শরীরের ভেতরে বান ডেকে উঠল।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণের জন্য ওর কাঠ-শক্ত শরীর মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই বিস্ফোরণটা ঘটে গেল।

মাথা নিচু করল সুদেব। হাত দিয়ে কপালের, মুখের, ঘাম মুছে নিল। একটু দম নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর, কিছুক্ষণ পর, চোখ তুলে তাকাল।

বালতি হাতে নিয়ে কালো মেয়েটা রওনা হচ্ছে।

ডানদিকের রাস্তার বাঁকের শেষে একটা মার্বেল পাথরের বড় গোডাউন আছে। তার লাগোয়া বস্তিতে থাকে মেয়েটা। সুদেব ওকে প্রায়ই দ্যাখে। এখানে দোকান করার পর থেকেই দেখছে। তা প্রায় বছরদুয়েক হয়ে গেল।

মেয়েটা যখন ফুটপাথ ধরে ওর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন ওকে ডাকল সুদেব।

'অ্যাই, শোন—।'

মেয়েটা থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল, বলল, 'কী?'

জল-ভরা বালতি হাতে নিয়ে সামান্য হেলে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে জরিপ করল সুদেব। ওর ঠোঁটের দিকে অনুপুঙ্খ নজরে দেখল। একটু আগে এই ঠোঁটজোড়াই কলের পাইপটা চেপে ধরেছিল। চুষছিল।

মেয়েটার গা থেকে কেমন একটা গন্ধও পাচ্ছিল সুদেব। সেই গন্ধটা কেক-পাঁউরুটির গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। সুদেবের খিদে পাচ্ছিল।

সুদেব পকেট থেকে দুটো এক্লেয়ার্স টফি বের করল। মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে। কাল এ সময়ে আবার জল নিতে আসবি, হ্যাঁ—।'

মেয়েটা হেসে টফি দুটো নিয়ে জিগ্যেস করল, 'এ সময়ে মানে?'

'এই যখন জল চলে যাব-যাব করছে তখন—।'

'কেন গো?' হেসে জিগ্যেস করল মেয়েটা। হাতের বালতিটা নামিয়ে রাখল ফুটপাতে।

সুদেব বলল, 'তুই জলের জন্যে যেরকম হাঁকপাঁক করিস—আমার খুব মজা লাগে।'

'তাই? আমি হাঁকপাঁক করি?' মেয়েটা অবাক হওয়ার ভান করল।

'হ্যাঁ রে। একটু আগে নলটাকে চেপে ধরে যা করছিলি...।'

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'তা কী করব? জল না পেলে তো রান্না বন্ধ। তখন মা খিচখিচ করবে—।'

'তুই "কসৌটি" দেখিস?' আচমকা প্রসঙ্গ পালটাল সুদেব।

'ও মা, দেখব না আবার—রোজ দেখি। আমাদের ঘরের সব্বাই দ্যাখে।

pathagar.net

'তবে আমাদের তো কালার টিভি নেই, তাই পিকচারটা তেমন জমে না...।'

'তুই আমার এখানে দেখতে আসিস। যদি আসবি বলিস তা হলে আমি কালার টিভি কিনে নিয়ে আসব। দেখবি কী দারুণ পিকচার—।'

মেয়েটা চোখ বড় করে সুদেবের দিকে তাকাল। রঙিন 'কসৌটি' দেখার লোভ চোখে ছায়া ফেলে গেল ওর চোখে। একইসঙ্গে গায়ে-পড়া যুবকটিকে ও মেপে নিতে চাইল। লোকটা ইলেকট্রিক মিস্তিরি—তবে দেখতে খুব সুন্দর।

মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কী বুঝল কে জানে! কোনও জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে ঝুঁকে পড়ে বালতিটা তুলে নিল। তারপর ওজন নিয়ে চলার ছন্দে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলল।

'আসিস কিন্তু—।' সুদেব শেষ কথাটা যেন ছুড়ে দিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখল। ওর বুকের ভেতরে 'গুমগুম' করে কেউ উত্তেজনার হাতুড়ি পিটছিল।

আটদিন আগের সেই সাংঘাতিক সন্ধেটার কথা মনে পড়ল সুদেবের। যেদিন ও ফ্যান লাগাতে গিয়েছিল পরমেশ দত্তগুপ্তর বাড়িতে।

ঘটনার পরের কয়েকদিন ও খবরের কাগজ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছিল। তাতে দু-চার লাইনের বেশি খবর পায়নি। আর সেখানে মেয়েটার নামও ছিল না।

অথচ মেয়েটার নাম জানার জন্য সুদেবের মনটা খুব ছটফট করছিল।

মেয়েটার খুনের ব্যাপারে পুলিশ সুদেবকে দু-দিন থানায় ডেকে পাঠিয়েছিল। সেখানে একজন অফিসার ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। একই কথা বারবার জিগ্যেস করেছে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, পারলে সুদেবকে তখনই অ্যারেস্ট করে চালান করে আর কী!

কিন্তু সুদেব জানে সেটা সম্ভব নয়। কারণ, ওই প্রফেসারের বাড়িতে ও সেরকম কোনও প্রমাণ ফেলে আসেনি। আর ওই খুনের কোনও সাক্ষী নেই।

সুতরাং কোনও ভয় নেই।

সন্ধে গাঢ় হচ্ছিল। ওদিকের ফুটপাতে দাঁড়ানো একটা কাঞ্চনফুলের গাছ তার জোড়া-জোড়া পাতা হাতজোড় করার ভঙ্গিতে গুটিয়ে নিয়েছে। পরদিন সকালে দিনের আলো পেলেই ওরা আবার নিজেদের মেলে ধরবে। এইভাবেই চলবে আলো-আঁধারের খেলা।

সুদেবের মনের ভেতরেও আলো-আঁধারের খেলা চলছিল। ওদিকের বস্তির ওই কালো মেয়েটা কাল, পরশু, কি তরশু 'কসৌটি' দেখতে ওর আস্তানায় আসবে তো? যদি আসে, তা হলে সত্যি-সত্যিই একটা কালার টিভি কিনে নিয়ে আসতে হবে। আর বুলিদার দোকান থেকে চার-ছ'টা এক্লেয়ার্স কিনে

রাখতে হবে। অল্পবয়েসি মেয়েগুলোকে ছলছুতোয় টফি বিলোনো সুদেবের কেমন যেন অভ্যেস মতন হয়ে গেছে।

ঠিক সেই সময় খালধারের দিক থেকে একটা পুলিশ-জিপ নীরোদবিহারী মল্লিক রোডের দিকে বাঁক নিল। তারপর মন্থরগতিতে সুদেবের আস্তানার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

রাস্তার সোডিয়াম লাইটগুলো তখন জ্বলে গেছে।

সন্ধে নামতেই প্রমিতা একতলার সব ঘরের আলো জ্বেলে দিয়েছে। তারপর 'সন্ধে' দেওয়ার জন্য শোওয়ার ঘরের এক কোণে সাজানো লক্ষ্মী-নারায়ণের ফটোর কাছে গিয়ে বসেছে।

চোখ বুজে প্রার্থনার সময় প্রমিতার গাল গড়িয়ে জলের ধারা একটানা বয়ে গেছে। সেই অবস্থায় আকুল প্রমিতা শুধু সুচরিতার ছবি দেখতে পাচ্ছিল—লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

সেইজন্যই প্রমিতা বারবার চোখ খুলে ঠাকুরের ছবিটা দেখছিল আর চোখ বন্ধ করে আরাধনায় মন দিতে চাইছিল। অথচ তাল কেটে যাচ্ছিল—সুচরিতা চলে আসছিল বন্ধ চোখের সামনে—'মাম-মাম' বলে ডাকছিল।

শেষ পর্যন্ত চোখ বুজে অনেক কষ্টে লক্ষ্মী-নারায়ণকে 'দেখতে' পেল প্রমিতা। আর ওঁদের পাশেই রিতু।

তখন প্রমিতা ভাবল, রিতু দেবতা হয়ে গেছে।

পুজো শেষ করে ড্রইং-ডাইনিং-এ এল প্রমিতা। বুবু টিভির সামনে বসে একমনে কার্টুন ছবি দেখছে আর হাসছে।

ওকে দেখে হিংসে হল প্রমিতার। কত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে গেছে ছেলেটা! মাঝে-মাঝে ও 'দিদি-দিদি' বলে কেঁদে উঠছে বটে, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য।

কিন্তু শুরুর দিনগুলো এরকম ছিল না।

রিতু চলে যাওয়ার পর তিন-চারদিন বুবু কীরকম যেন হয়ে গিয়েছিল। যখন তখন 'দিদি! দিদি!' বলে কাঁদছিল আর দোতলায় সুচরিতার ঘরে ঢুকে পড়ছিল।

রবিবার রাত থেকে বুবুকে খাওয়াতে যে কী কষ্ট গেছে! প্রমিতার হাজার চেষ্টাতেও ছেলেটা এককণা খাবার মুখে তোলেনি। শুধু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছে।

প্রমিতা ওকে বারবার বুঝিয়ে বলেছে যে, টুল থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে

pathagar.net

সুচরিতার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে—তাই ওকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ক'দিন পরেই ও বাড়ি চলে আসবে।

এ-কথায় ছোট্ট বালক ফোলা চোখ নিয়ে মামের দিকে তাকিয়েছে। সেই দৃষ্টিতে কী ছিল। যেন প্রমিতার ভেতর পর্যন্ত পড়ে নিতে পারছিল ছেলেটা। এবং বুঝতে পারছিল, ওর মাম মিথ্যে কথা বলছে।

প্রমিতা ছেলের দৃষ্টি কয়েক লহমার বেশি সইতে পারেনি। ওর বুকের ভেতর থেকে কান্না বেরিয়ে এসেছে। ডুকরে উঠে ছেলেকে জাপটে ধরেছে ও।

সোমবার সকাল থেকে বুবু একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ওকে স্কুলে পাঠাতে চেয়েছিল প্রমিতা—তা হলে স্কুলের সময়টুকু অন্তত নিশ্চিন্ত। কিন্তু সেটা হয়নি। যে-ছেলেটা রোজ উৎসাহ নিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়, টিফিন-বাক্সে মাম কী দারুণ টিফিন দিল সেটা বারবার ঢাকনা খুলে পরখ করে দ্যাখে, সে একেবারে বেঁকে বসল। কেঁদেকেটে একরোখা জেদ ধরে বসল, কিছুতেই সে স্কুলে যাবে না।

দুপুরবেলা বুবুকে সামান্য কিছু খাওয়াতে পেরেছিল প্রমিতা। তারপর জোর করে একতলার শোওয়ার ঘরে শুইয়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ গা চাপড়ানোর পর প্রমিতার মনে হয়েছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন ও আর পরমেশ থানায় ফোন করে রিতুর ব্যাপারে নানান খবর নিচ্ছিল, কাগজেও কীসব নোট করছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর বুবুকে একবার দেখে আসতে গিয়ে চমকে উঠল প্রমিতা।

ছেলেটা বিছানায় নেই।

তখন স্বামী-স্ত্রী মিলে সারা বাড়িতে ওর খোঁজ করতে লাগল। বাথরুম, রান্নাঘর, তারপর দোতলায় রিতুর ঘর।

সেখানে গিয়ে দ্যাখে একটা দম দেওয়া নাচিয়ে পুতুল রিতুর বিছানায় দাঁড় করিয়ে রেখে বুবু নিজের মনেই বলছে, 'দিদি, এই খেলনাটা তুই নিয়ে নে। আমার চাই না। বাপি আমাকে আর-একটা খেলনা কিনে দেবে। আমি চোখ বুজে আছি...তুই খেলনাটা নিয়ে নে...।'

বুবু চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগল। পরমেশ আর প্রমিতা দরজায় দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য দেখতে লাগল।

এই খেলনাটা বুবুকে কিনে দিয়েছিল কমলেশ। সুইচ অন করলেই একটা হিন্দি গান বাজতে শুরু করে, আর ঘাগরা পরা ফুটফুটে পুতুল-মেয়েটা কোমর দুলিয়ে নাচতে থাকে।

সুচরিতা সুযোগ পেলেই এই খেলনাটা বুবুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পালাত। ওটা চালিয়ে পুতুলটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচত। আর বুবু চেঁচিয়ে বাড়ি

মাথায় করত। দিদির কবল থেকে খেলনাটা উদ্ধার করে ওকে দেওয়ার জন্য প্রমিতাকে গিয়ে বায়না করে বলত।

এক-একসময় রিতু পুতুলটা নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেত ওর ঘরে। তারপর ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিত। আর বুবু দরজায় 'দুমদুম' করে ধাক্কা দিত। হাত-পা ছুড়ে ঘ্যানঘ্যান করত। তারপর রাগে মেঝেতে শুয়ে পড়ে তারস্বরে চিৎকার করে মড়াকান্না কাঁদত। শেষ পর্যন্ত প্রমিতা গিয়ে রিতুর কাছ থেকে নাচপুতুল উদ্ধার করে ছেলের হাতে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিত।

খেলনার প্রতি এই ছেলেমানুষি টান নিয়ে রিতুকে কম বকাবকি করেনি প্রমিতা। তাতে সুচরিতা হাত উলটে বলত, 'কী করব, মাম, ওটা চালিয়ে আমার নাচতে ইচ্ছে করে...।'

'তা হলে আর কী!' গজগজ করে বলত প্রমিতা, 'তোর বাপিকে বলি, তোকে ওইরকম একটা খেলনা কিনে দিক। আর তুই সারাজীবন বুড়োখুকি হয়ে থাক...।'

পরমেশ বাড়িতে ফিরলে ওকে মজা করে ওই ঝগড়ার কাহিনি শোনাত প্রমিতা।

এখন ওরা দেখছিল, পাঁচ বছরের ছেলেটা কীভাবে নিজের প্রাণের খেলনাটা ওর দিদিকে দেওয়ার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করছে।

বুবু চোখ খুলল। দেখল, পুতুলটা তখনও বিছানায় দাঁড়িয়ে—দিদি ওটা নেয়নি। তখন ও 'অ্যাই, দিদি, নে না। খেলনাটা নে না—' বলে কাঁদতে শুরু করল।

প্রমিতা ছুটে গিয়ে ছেলেকে আঁকড়ে ধরল। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে আদর করে বলল, 'এখন দিদি কী করে নেবে? দিদি তো হাসপাতালে। ফিরে আসুক—তখন দিস...।'

কথা বলতে-বলতে প্রমিতা কান্না চেপে রাখতে পারেনি। আর ঘরের-ভেতরে-ঢুকে-পড়া পরমেশের গলায় কীসের একটা শক্ত ডেলা যেন আটকে গিয়েছিল। ও বুঝতে পারছিল, মামের এসব কথা যে 'মিছিমিছি', সেটা বুবু যেন স্পষ্টই ধরে ফেলেছে।

প্রথম তিনটে দিন বুবুকে নিয়ে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে ওরা। তারপর শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারটা মিটে যেতে বুবুও যেন কীভাবে অল্প-অল্প করে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ছোটরা বোধহয় বড়দের তুলনায় সত্যিকে সহজে মেনে নিতে পারে। ওদের কাছে যেটা একবার সত্যি হয়ে ওঠে সেটাকে ওরা ওদের জগতে অন্তর দিয়ে মানিয়ে নেয়। অন্তত প্রমিতার তাই মনে হল।

কিন্তু বড়রা সেটা পারে কই! সেইজন্যই বুবুকে দেখে হিংসে হয় প্রমিতার।

pathagar.net

এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল।

হঠাৎই যেন ইলেকট্রিক শক খেল প্রমিতা। মনে হল, পলকে ও সেই ভয়ঙ্কর রবিবারটায় আবার ফিরে গেছে।

দরজার কাছে গিয়ে ম্যাজিক আই-তে চোখ রাখল। তারপরই হাঁপ ছাড়ল। পরমেশ প্রায়েন্স কলেজ থেকে ফিরে এসেছে।

দরজা খুলেই প্রমিতার চোখের দিকে গাঢ় নজরে তাকাল পরমেশ। জলের দাগ দেখতে পেল দু-গালে। ওর বুকের ভেতরে কষ্টটা উথলে উঠল আবার। হতাশায় মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রমিতাকে বলল, 'চোখ মোছো।' তারপর একটু থেমে : 'চায়ের জল বসাও। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।'

চোয়াল শক্ত করে ব্যাগ হাতে ভেতরে ঢুকল পরমেশ। জুতো ছেড়ে শোওয়ার ঘরের দিকে এগোল। যাওয়ার পথে 'বুবু, দেখে যা কী এনেছি—' বলে বুবুকে ডাকল। অমনি বুবুও ছুটল ওর বাপির পিছন-পিছন। ও জানে, বাপি কী এনেছে : হয় একটা ডটপেন, নয়তো ক্যাডবেরি চকোলেট।

পরমেশকে চা করে দিল প্রমিতা। নিজেরটাও নিল। তারপর চট করে দোতলার দিকে উঠল। ওর মনে পড়ে গেছে, সন্ধের পর রিতুর ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে রিতুর তো অসুবিধে হবে!

পরমেশ টিভির দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। প্রমিতাকে পিছু ডেকে কোনও লাভ নেই। তা ছাড়া ও চা ঠান্ডা করে খায়।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে পরমেশ প্রমিতার কথা ভাবছিল।

সুচরিতা চলে যাওয়ার পর প্রমিতা একটা রাতও ঘুমোতে পারেনি। পরমেশ ওকে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। প্রায় সর্বক্ষণ গুমরে-গুমরে কেঁদে ওর চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে, গাল বসে গেছে এ ক'দিনেই। পরমেশের ভয় হয়, বুবু যদি না থাকত তা হলে প্রমিতা হয়তো সুইসাইডই করে বসত। তারপর আসত পরমেশের পালা।

পরমেশ কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল বুবুর দিকে। ক্যাডবেরি চকোলেট হাতে টিভি দেখছে। পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেটা জানে না, কীভাবে ও দুজন দুঃখ-পাওয়া মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে—বাঁচাচ্ছে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

পরমেশ চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে টেবিল ছেড়ে ওঠার আগেই বুবু ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। 'হ্যালো' বলে কিছুক্ষণ শুনল। তারপর রিসিভার বাড়িয়ে ধরল বাপির দিকে।

পরমেশ ফোন ধরে কথা শুরু করতেই ও-প্রান্তে রাজতনু চ্যাটার্জির গলা

শুনতে পেল।

'মিস্টার দত্তগুপ্ত, একবার আপনার ওয়াইফকে নিয়ে থানায় আসতে পারবেন?'

'ধরা পড়েছে? ক্রিমিনাল কি ধরা পড়েছে, মিস্টার চ্যাটার্জি?' উৎকণ্ঠায় পরমেশের বুকের ভেতরটা ধক-ধক করছিল।

'না, এখনও ধরা পড়েনি—তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

পরমেশ মুহূর্তে দপ করে নিভে গেল, বলল, 'আমরা...আমরা আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে ঘুরে তাকাতেই প্রমিতাকে দেখতে পেল পরমেশ। ওর মুখ দেখে বুঝতে পারল, শেষের দিকের কথাগুলো ও আন্দাজ করতে পেরেছে। পরমেশের মুখের হতাশ ছবিটা পড়ে নিতে ওর কোনও অসুবিধে হয়নি।

পরমেশ মনমরা গলায় বলল, 'তৈরি হয়ে নাও—থানায় যেতে হবে।'

প্রমিতা কথা বাড়াল না। তৈরি হতে চলে গেল। কিন্তু ওরা যে বেরোবে, বুবুকে কার কাছে রেখে যাবে? নাকি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

পরমেশের সঙ্গে কথা বলে প্রমিতা ঠিক করল, বুবুকে ওরা পাশের বাড়ির সুধীরবাবুদের কাছে রেখে যাবে। ওঁর একটা বছর-বারোর মেয়ে আছে, রোনা—তার সঙ্গে বুবুর বেশ ভাব। এর আগেও দু-দিন বুবুকে ওঁদের বাড়ি রেখে প্রমিতা আর পরমেশ থানায় গিয়েছিল।

গাড়ি নিয়ে খালধারের রাস্তা ধরে রওনা হল পরমেশ। নোংরা ভাঙাচোরা রাস্তায় পরমেশের মারুতি ঢেউ তুলছিল। রাস্তার ধারে কোথাও-কোথাও উঁচু মাটির ঢিবি, কোথাও-বা ছেড়ে যাওয়া ঝুপড়ির দু-একটা কাঠামো। তারই মাঝে-মাঝে বড়-বড় বট-অশ্বত্থ-তেঁতুল গাছ।

সন্ধের নির্জন রাস্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতে পরমেশ ভাবছিল।

রিতুকে খুন করার পর খুনি হয়তো এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে চলে গেছে। কেউ তাকে দেখতে পায়নি। কিংবা দেখলেও খুনি বলে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু লোকটা কে? পরমেশদের চেনা কেউ? নাকি একেবারে অচেনা কোনও হিংস্র জানোয়ার?

আচ্ছা, 'সামন্ত ইলেকট্রিক'-এর ছেলেটা তো খুনের কাছাকাছি সময়ে ওদের বাড়িতে এসেছিল! ও কিছু করেনি তো? কিংবা ওর বন্ধুবান্ধব কেউ?

কিন্তু রিতু তো ফোনে বলেছিল, সিলিং ফ্যানটা লাগিয়ে দিয়ে মিস্তিরি চলে গেছে! তা হলে ব্যাপারটা হয়েছে তার পর। হয়তো খোলা দরজা দিয়ে ঝট করে ঢুকে পড়েছিল আর-একটা লোক। তারপর...

সেই অচেনা লোকটাকে চেনার জন্য ওর মন ছটফট করছিল।

pathagar.net

পরমেশের চোখ জ্বালা করছিল। মলিন সন্ধ্যায় রাস্তার কমলা আলোগুলো কেমন যেন কুয়াশাময় ঝাপসা দেখাচ্ছিল। ওর চোয়াল শক্ত হল। স্টিয়ারিং-এর ওপরে শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে বসল আঙুল। ওর চোখের সামনে একতলার ড্রইংরুমটা ভেসে উঠছে।

সেদিন সন্ধেবেলা ঠিক কী হয়েছিল সেটা বোঝার জন্য রাজতনু চ্যাটার্জি গত শুক্রবার ওদের ড্রইং-ডাইনিং-এ একটা 'নাটক' করেছিল।

পরমেশ আর প্রমিতাকে আগাম খবর দিয়ে অনুমতি নিয়েছিল রাজতনু। তারপর চারজন সাদা-পোশাকের পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছিল পরমেশদের বাড়িতে।

শুরুতেই পরমেশকে রাজতনু বলেছে, 'মিস্টার দত্তগুপ্ত, এখন আমরা যেটা করব সেটাকে রিকনস্ট্রাক্শন অফ দ্য ক্রাইম বলতে পারেন। মানে, খুনি ঘরে ঢোকার পর ঠিক কী-কী হয়েছিল সেটা আমাদের দুজন লোক অ্যাক্টিং করে দেখাবে। একজন সাজবে ক্রিমিনাল, আর একজন ভিক্টিম। আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে...।'

ভুরু কুঁচকে রাজতনুর দিকে তাকিয়েছিল পরমেশ। ওর দু-চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল।

'...রিকোয়েস্টটা এই যে, অ্যাক্টিং চলার সময় আপনারা সামনে না থাকলে ভালো হয়। নইলে আপনাদের মনের ওপরে খুব চাপ পড়বে...আপনাদের খারাপ লাগবে...।'

একটু দূরে দাঁড়ানো প্রমিতাকে রাজতনুর অনুরোধের কথা জানিয়েছিল পরমেশ। তাতে মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি করেছিল প্রমিতা। বলেছিল, ও দেখতে চায়—জানতে চায় সেদিন কী করে রিতু বিপদে পড়েছিল।

পরমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিল। রাজতনুদের 'স্টেজ' ছেড়ে দিয়ে প্রমিতাকে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। আর বুবুকে বেডরুমে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

অনেকক্ষণ ধরে—বারবার—একই দৃশ্যের অভিনয় চলেছিল। রাজতনু চ্যাটার্জি একটা নোটবই খুলে পরিচালকের মতো নির্দেশ দিচ্ছিল, অভিনেতাদের ভুল শুধরে দিচ্ছিল। আর মাঝে-মাঝে কীসব টুকে নিচ্ছিল নোটবইতে।

নানানভাবে দৃশ্যটাকে অভিনয় করাল রাজতনু।

কিন্তু যেহেতু এই নাটকে কোনও সংলাপ নেই, কোনও প্রপ্স নেই, তাই ব্যাপারটা অনেকটা মূকাভিনয়ের মতো দেখাল।

নাটকের শেষে যখন চোখ বুজে চিত হয়ে শুয়ে থাকা একজন সাদা পোশাকের

পুলিশের ওপরে আর-একজন পুলিশ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তখন প্রমিতা 'আঃ—' বলে একটা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

পরমেশ প্রমিতাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাজতনু বেসিন থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে এসে প্রমিতার চোখে-মুখে ঝাপটা দিয়েছিল।

প্রমিতার জ্ঞান ফিরতেই রাজতনু চ্যাটার্জি ওদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিয়েছে।

পরমেশ বুঝতে পারছিল, রাজতনু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। কিছু-না-কিছু একটা ও হয়তো করবেই।

থানার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল পরমেশ আর প্রমিতা। গাড়ি পার্ক করে ওরা থানায় ঢুকল। ভেতরে একটা বড়সড় ঘরে রাজতনুকে দেখতে পেল।

ঘরে অনেকগুলো লম্বা লম্বা বেঞ্চি। একপাশে একটা বড় টেবিল। তার ওপিঠে দুটো চেয়ার। সবকটা আসবাবই পুরোনো, মলিন, ক্ষয়াটে।

মাথার ওপরে দুটো সিলিং ফ্যান। রং কালচে। দুলে-দুলে হাঁপাচ্ছে।

এই মন খারাপ করা ঘরে একমাত্র ব্যতিক্রম সুপুরুষ রাজতনু।

তারপরই পরমেশ আর প্রমিতার চোখ গেল ঘরের এককোণে।

সেখানে একটা বেঞ্চিতে ভিজে বেড়ালের মতো বসে আছে ইলেকট্রিক মিস্তিরি সুদেব সামন্ত।

pathagar.net

সাত

pathagar.net

রাজতনু কয়েকটা ফাইল সামনে ছড়িয়ে বসে ছিল। ওর পাশে পুলিশি পোশাকে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঝুঁকে পড়ে খোলা ফাইলের পৃষ্ঠায় আঙুল ঠেকিয়ে নিচু গলায় কী যেন বলছিল রাজতনুকে। তার কথা শুনতে-শুনতেই রাজতনু আড়চোখে তাকিয়েছে পরমেশদের দিকে।

ওদের দেখেই রাজতনুর সিরিয়াস মুখটা পালটে গেল, একচিলতে হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। হাতের ইশারায় পাশে দাঁড়ানো অফিসারটিকে চলে যেতে বলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ডানহাতটা সৌজন্যের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল সামনে : 'আসুন, মিস্টার দত্তগুপ্ত। আসুন, ম্যাডাম। খুব জরুরি ব্যাপার না হলে আপনাদের অসময়ে ডেকে পাঠাতাম না।'

টেবিলের কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে পরমেশদের বসতে দিল রাজতনু। তারপর খুব চাপা গলায় বলল, 'আপনারা যা কথাবার্তা বলবেন খুব নিচু গলায় বলবেন—যাতে ইলেকট্রিক মিস্তিরি ওই ছেলেটা শুনতে না পায়—উঁহু, উঁহু, ওর দিকে তাকাবেন না মোটেই।'

শেষ কথাটা রাজতনু বলেছে প্রমিতাকে—কারণ, রাজতনু 'ইলেকট্রিক মিস্তিরি ওই ছেলেটা' বলতে-না-বলতেই সুদেবের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল প্রমিতা। রাজতনুর কথায় ও চমকে উঠে কাঠ হয়ে গেল। মাটির পুতুলের মতো শূন্য চোখে রাজতনুর দিকে চেয়ে রইল।

রাজতনু নিজের চেয়ারে বসে জোরে শ্বাস নিল, চাপা গলায় বলল, 'আমি এই চেয়ার ছেড়ে ওঠামাত্রই আপনারা দুজন আমার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটবেন। আমি যা-ই বলি না কেন, আপনারা শুধু "হুঁ-হাঁ" ছাড়া আর কোনও কথা বলবেন না। আমি যা বলার এ-ঘরের বাইরে গিয়ে আপনাদের বলব, কেমন?'

পরমেশ আর প্রমিতা বোবার মতো ঘাড় নাড়ল।

রাজতনু এবার সামনে রাখা ফাইলের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'মিস্টার দত্তগুপ্ত, আপনাদের আর-একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা গোটাদুয়েক ডেফিনিট ক্লু পেয়েছি—হয়তো আর দিনদশেকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করে উঠতে পারব। এই কাগজগুলো আপনারা দেখুন—' সামনের ফাইলটা পরমেশদের দিকে ঘুরিয়ে ধরল রাজতনু। তারপর খুব চাপা গলায় বলল, 'ডোন্ট রিয়্যাক্ট—জাস্ট ফাইলটা দেখার অভিনয় করুন...।'

পরমেশ আড়চোখে তাকাল সুদেব সামন্তর দিকে। ওর সাদামাটা মুখে কৌতূহল ফুটে উঠেছে। কেমন একটা ঠান্ডা চোখে রাজতনুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রমিতা ফাইলের দিকে চোখ রাখলেও সবকিছু কেমন ঝাপসা দেখছিল। ওর বুকের ভেতরটা হঠাৎই ঢিপঢিপ করতে শুরু করল।

সেই অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড কেটে যাওয়ার পরই রাজতনু চ্যাটার্জি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'ব্যস, এটুকুই....' ফাইলটা নিজের কাছে টেনে নিল রাজতনু : 'থ্যাংক য়ু সো মাচ ফর ইয়োর ট্রাব্‌ল....।'

রাজতনু শব্দ করে চেয়ারটা ঠেলে দিল। তারপর চটপটে পায়ে সামনে এগোল। পরমেশ আর প্রমিতা ওর পরামর্শ মতো ওকে অনুসরণ করল।

ওদের নিয়ে থানার ঘর ছেড়ে বাইরের দিকে হাঁটা দিল রাজতনু। একবারও ঘরের কোণে বসে থাকা সুদেব সামন্তর দিকে তাকাল না।

করিডরে বেশ খানিকটা আসার পর রাজতনু থমকে দাঁড়াল, বলল, 'এবারে আপনাদের ওই ঘরটায় নিয়ে যাব ' ইশারা করে ডানদিকের একটা ছোট্ট ঘরের দিকে দেখাল ও : 'ওই ঘরে আপনারা চুপটি করে বসবেন....আর কান পেতে শুনবেন...।'

পরমেশদের নিয়ে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে পড়ল রাজতনু।

ঘরটা ভাঁড়ার ঘর গোছের। ময়লা দেওয়াল। বাতাসে হালকা সিগারেটের গন্ধ। একটা দেওয়ালে দড়িতে ঝোলানো বেশ কয়েকটা পুলিশি পোশাক। ঘরের এক কোণে দুটো রঙের ড্রাম আর একটা চটের বস্তা। এ ছাড়া একটা ছোট টেবিল আর তিনটে নড়বড়ে চেয়ার এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

ঘরে একটা চল্লিশ কি ষাট ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলছে। আর একটা ছত্রিশ ইঞ্চি সিলিং ফ্যান বনবন করে ঘুরছে। পাখাটা বনবন করে ঘুরলেও হাওয়া সেই তুলনায় জোরালো নয়।

পরমেশ আর প্রমিতাকে দুটো চেয়ারে বসাল রাজতনু। হাত নেড়ে বিশদভাবে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, 'আপনারা এখানে চুপ করে বসুন—আওয়াজ-টাওয়াজ করবেন না একদম। সামনের এই যে বন্ধ জানলাটা দেখছেন...এই জানলাটার ওপাশে একটা ঘর আছে...।'

পরমেশ আর প্রমিতা তাকাল জানলাটার দিকে।

টেবিলের সামনেই জানলাটা। পাল্লাদুটো ছাই রঙের, কাঁচা হাতে রং করা। ডান পাল্লার কবজার কাছে মাকড়সার জাল—কখনও পাল্লাগুলো খোলা হয় বলে মনে হয় না।

রাজতনু তখনও বলছিল, 'ওপাশের ঘরটায় আমি ওই সুদেব সামন্তকে ইন্টারোগেট করব। আগেও বারকয়েক করেছি—সেরকম কিছু পাইনি। আজ ওকে তুলে নিয়ে এসেছি...আপনাদের "মেন সাসপেক্ট"-কে আপনাদের সামনেই জিজ্ঞাসাবাদ করব বলে...।'

pathagar.net

'আমাদের সামনেই মানে?' পরমেশ রাজতনুর কথা আঁচ করতে না পেরে আলতো করে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, সামনে মানে আপনারা আমাদের কথাবার্তা সব ক্লিয়ারলি শুনতে পাবেন। কিন্তু ওই সামন্ত ছোঁড়াটা আপনাদের দেখতে পাবে না। এই যে, পাল্লার ওই ফাটলটা দেখুন—' বাঁ পাল্লার একটা চওড়া ফাটলের দিকে আঙুল দেখাল রাজতনু : 'এই ফাটলটা দিয়ে আপনারা সব শুনতে পাবেন—এমনকী একটু-আধটু দেখতেও পাবেন। তবে কোনও শব্দ করবেন না। থানার অন্য অফিসারদের বলা আছে—আপনাদের কেউ কিছু বলবে না। আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি....রেডি থাকুন....ও. কে.?'

পরমেশ ঘাড় কাত করে বোঝাল যে, ও রেডি আছে। ওর বুকের ভেতরে ধুকধুকুনি শুরু হয়ে গেল।

রাজতনু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রমিতা পরমেশের হাত খামচে ধরে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'যদি সুদেব সামন্ত পাল্লার ওই ফাটল দিয়ে আমাদের দেখতে পায়!'

পরমেশ প্রমিতার পিঠে হাত বুলিয়ে ভরসা দিল : 'উঁহু, আমাদের দেখতে পাবে না....আমরা শুধু কান পেতে শুনব।'

জানলার কাছটায় চেয়ার টেনে নিয়ে গেল পরমেশ। প্রমিতার দিকে একপলক তাকিয়ে ফাটলের কাছে কান পাতল। ওর বুকের শব্দটা আচমকা পাগলা ঘোড়া হয়ে ছুটতে শুরু করল।

প্রমিতা দম বন্ধ করে পল-অনুপল গুনছিল। সুচরিতার কথা ভেবে ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল।

পাশের ঘরে শব্দ শুনতে পেল পরমেশ। কারা যেন ঘরে ঢুকল। মেঝেতে চেয়ার টানার শব্দ শোনা গেল। তারপর....।

'হুঁ—ওই রোববারের কেসটা আর-একবার গোড়া থেকে বল।' রাজতনুর ভারী গলা শোনা গেল।

'রোববারের কোন কেসটা, স্যার?' সুদেব সামন্ত বলল।

'শালা ন্যাকা! ওই যেদিন সন্ধেবেলা প্রফেসারের মেয়েটা রেপ আর মার্ডার হল—।'

'খুব বাজে ব্যাপার, স্যার। কী করে যে এমনটা হল...।'

'তুই ক'টার সময় ও-বাড়িতে ঢুকেছিলি?'

'তখন, স্যার, এই সাড়ে ছ'টা মতন হবে।'

'তোর হাতে ঘড়ি ছিল?'

'এ তো আপনি আগেও জিগ্যেস করেছেন, স্যার। হ্যাঁ, ছিল।'

'একেবারে গোড়া থেকে পরপর বলে যা। কিচ্ছু বাদ দিবি না—।'

পরমেশ শুনতে পেল, সুদেব সামন্ত পড়া মুখস্থ বলার মতো গড়গড় করে বলে যাচ্ছে সবকিছু। কী করে ও বাড়িতে ঢুকল, পাখা লাগাল, এবং চলে গেল।

সুদেবের কথা বলার ভঙ্গি এত শান্ত আর নির্লিপ্ত যে, পরমেশ-প্রমিতার মনে হল, ও যেন তিন-চার জ্বর নিয়ে মিনমিন করে খবর পড়ছে।

ওর বলা শেষ হওয়ামাত্রই রাজতনুর প্রশ্ন শোনা গেল।

'তখন বাড়িতে আর কেউ ছিল না?'

'কী করে বলব, স্যার! আমি তো আর-কাউকে দেখিনি—।'

'ঘরের অনেক জায়গায় তোর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে...।'

'তা পাওয়া যেতে পারে, স্যার। আমি তো অনেক জিনিসে হাত দিয়েছি....চেয়ার, টুল, পাখা....আরও অনেক জিনিসে....ভালো করে মনে নেই....।'

'মেয়েটার গায়ে হাত দিয়েছিলি?'

'ছি ছি, কী বলছেন, স্যার---।'

'তোর সামনে সুচরিতার কোনও ফোন এসেছিল?'

'সুচরিতা মানে?'

'আবার ন্যাকামো হচ্ছে? যে-মেয়েটা মারা গেছে তার নাম।'

'ও....নামটা আগে কখনও আমাকে বলেননি, স্যার। না, স্যার, ফোন আসেনি—তবে দিদি কাকে একটা ফোন করছিল—তখনই আমি চলে এসেছি।'

পরমেশ আর প্রমিতা পালা করে জানলার গায়ে কান পাতছিল। সুদেব সামন্তর ঠান্ডা শান্ত কথাবার্তা শুনে ওদের মনে হল না এই জঘন্য কাজ এই গোবেচারা ছেলেটা করতে পারে।

পরমেশ একবার সাবধানে চোখ রাখল জানলার ফাটলে।

রাজতনুর পিঠের খানিকটা দেখতে পেল ও। আর তার ঠিক পাশ দিয়ে সুদেব সামন্তর কাঁচুমাচু মুখ। শান্ত চোখে কেমন একটা অসহায় দৃষ্টি।

'যখন তুই চলে আসিস তখনও সুচরিতা ফোনে কথা বলছিল?'

'ঠিক বলতে পারছি না, স্যার...বোধহয় কথা বলছিল। আগেও তো আপনাকে বলেছি, স্যার, আমার খুব জোর পেচ্ছাপ পেয়ে গিয়েছিল—তাই জলদি চলে আসার তাড়া ছিল।'

'যখন ও-বাড়ি থেকে চলে আসিস তখন কোনও লোককে ও-বাড়ির দিকে যেতে দেখেছিস?'

'না, স্যার—অতটা খেয়াল করিনি। আমি তখন জোর পায়ে খালধারের দিকে হাঁটা দিয়েছি। প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, স্যার, তাই—।'

pathagar.net

রাজতনু নানানভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহু কথা জিগ্যেস করল সুদেবকে, কিন্তু সেরকম কোনও সূত্র পেল না। সত্যিই তো, ঘরের এখানে-সেখানে ওর হাতের ছাপ তো থাকবেই। তাহলে সুদেব সামন্ত যে এই অপকর্মটা করেছে তার কোনও প্রমাণ নেই।

pathagar.net

অস্বীকার করেনি যে, তারও তো কোনও প্রমাণ নেই!

ফোরেনসিক রিপোর্ট এখনও রাজতনুর হাতে আসেনি। সুতরাং, জানা যায়নি, মার্ডারার সিক্রেটর কি নন-সিক্রেটর। সিক্রেটর হলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে, আর নন-সিক্রেটর হলে রাজতনুর বাড়া ভাতে ছাই পড়বে। তা ছাড়া সুদেব যদি সত্যিই অপকর্মটা করে থাকে তা হলে ওর মেডিক্যাল এক্‌জামিনেশান খুব জরুরি ছিল—এবং সেটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে করতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু সেটা হয়নি। কারণ, এই পরীক্ষার ব্যাপারে সুদেব সামন্ত ইচ্ছে করলেই আপত্তি করতে পারত—আইনে সে-সুযোগ আছে। তা ছাড়া শুধুমাত্র আন্দাজে ভর করে সে-রাতেই ওকে অ্যারেস্ট করা সম্ভব ছিল না। তার ওপর পরমেশ দত্তগুপ্ত নিজের স্টেটমেন্টে বলেছে, সুচরিতা ফোনে ওকে বলেছিল যে, ইলেকট্রিক মিস্তিরি চলে গেছে। তার পরেও পরমেশ মেয়ের সঙ্গে এক-দু-লাইন কথা বলেছে।

আর....আর এতদিন পর....এতদিন পর যদি সুদেবের মেডিক্যাল এক্‌জামিনেশান করাও হয়, তাতে কী পাওয়া যাবে? কিস্যু না!

রাজতনুর ভেতরে একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

ডক্টর মনোজ সরকার যে-রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে খুনির দিকে ইশারা করার মতো কোনও তথ্য নেই। বারবার রিপোর্টটা পড়ে দেখেছে রাজতনু। ধর্ষণ এবং খুনের ব্যাপারে সাধারণত যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাই। তা ছাড়া অ্যাসাইল্যান্টের আক্রমণে সুচরিতা বোধহয় আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, অথবা মারা গিয়েছিল—পরে রেপের ঘটনাটা ঘটেছে। ফলে সেরকম ধস্তাধস্তি বা রেসিস্ট্যান্সের কোনও চিহ্ন নেই। সেটা থাকলে সুবিধে হত। খুনির গায়ে আঁচড়-কামড়ের চিহ্ন পাওয়া যেত। আর সুচরিতার নখের ভেতরে খুনির চামড়া কিংবা রক্তের নমুনা পাওয়া যেত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজতনু।

সুদেবকে সেদিন পরমেশদের বাড়িতে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে দেখেনি। ফলে সুদেবের বলা সময়টাই একমাত্র তথ্য—সেটা মিথ্যে না সত্যি বোঝার উপায় নেই।

সুদেব আগে কোনওদিন সুচরিতাকে বিরক্ত করেনি—এমনকী ওর সঙ্গে কোনওদিন কথাও বলেনি।

তা হলে সুদেব সামন্তকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে ওর এগেইনস্টে কী এভিডেন্স

হাজির করবে রাজতনু? যদি ও জোর করে চার্জশিট তৈরি করে তা হলে তার মধ্যে প্রচুর ফাঁকফোকর থেকে যাবে। এবং সুদেব সামন্ত হাসতে-হাসতে খালাস হয়ে যাবে।

ঠিক এই ব্যাপারটাই দত্তগুপ্তরা বুঝতে পারছে না। অবশ্য ওরা সুচরিতার মা-বাবা, আর রাজতনু চ্যাটার্জি একজন সাব-ইনস্পেকটার মাত্র!

সুদেবকে দেখে বা ওর সঙ্গে কথা বলে রাজতনুর কখনও মনে হয়নি ও এ-কাজ করতে পারে। এত শান্ত স্নিগ্ধ ওর ব্যবহার, সুন্দর করে ধীরে-ধীরে কথা বলে....সুদেব অশিক্ষিত হলেও এই ব্যাপারটা ইমপ্রেস করার মতো। তা ছাড়া সুচরিতাকে ধর্ষণ করে খুন করার মতো ওর মোটিভ কোথায়!

নাঃ, সত্যিই মনে হচ্ছে এটা অন্য কোনও লোকের কীর্তি।

কিন্তু বিনা মোটিভে অচেনা একটা লোক পট করে একটা রেপ অ্যান্ড মার্ডার ঘটিয়ে ফেলল! যদি সত্যি সত্যিই তাই হয়, তা হলে ক্রাইম সিনে গিয়ে রাজতনুর যা মনে হয়েছিল ব্যাপারটা তাই। এটা কোনও সাইকোপ্যাথের কাজ....সিরিয়াল কিলাররা যেমন হয়।

সুতরাং লোকটা আবার খুন করবে। এবং আবার। ঠিক স্টোনম্যানের মতো। লোকটার খুনের খামখেয়ালিপনা কবে থামবে কে জানে!

সুদেব সামন্তর নিষ্পাপ মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাজতনু। তারপর মুখে ছোট্ট একটুকরো শব্দ করে ওকে চলে যেতে বলল। সুদেব রাজতনুকে নমস্কার করে 'আসছি, স্যার' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই পরমেশদের ঘরে এসে ঢুকল রাজতনু। হাতে-হাত ঘষে জিগ্যেস করল, 'কী বুঝলেন?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পরমেশ বলল, 'কে জানে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'উঁহু, স্পষ্ট করে বলুন। আপনাদের পজিটিভ ওপিনিয়ানটা আমার জানা দরকার। কথাবার্তা শুনে আপনাদের জাস্ট কী মনে হল? নিরপেক্ষভাবে বলুন...।'

একটু চুপ করে থেকে পরমেশ বলল, 'না—ওর কথাবার্তায় ওকে মোটেই ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না।'

প্রমিতার দিকে তাকাল রাজতনু : 'আপনার, মিসেস দত্তগুপ্ত?'

উত্তরে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল প্রমিতা—কোনও কথা বলল না।

জোরে শ্বাস ফেলল রাজতনু, বলল, 'এটাই এ ক'দিন ধরে আপনাদের বোঝাতে চাইছিলাম, ম্যাডাম। তবে চিন্তা করবেন না—আমরা জোড়াদিঘিকে ওয়াচে রাখছি। আর আপনারা যদি নতুন কোনও ইনফরমেশান পান আমাকে মোবাইলে ফোন করে দেবেন। ও. কে.?'

pathagar.net

রাজতনুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরমেশ আর প্রমিতা বেরিয়ে এল থানার বাইরে।

থানার সামনে আলো জ্বলছে। সেই আলো ঠিকরে পড়েছে উলটোদিকের একটা দেওয়ালে। দেওয়ালটা বেশ খানিকটা উঁচু, ডানদিকে ক্রমেই আরও উঁচু হয়ে গেছে। আর তার মাথায় লোহার পাইপের রেলিং। সেই দেওয়াল এবং রেলিং ব্রিজের ঢঙে ডানদিকে উঁচু হয়ে গেছে আর বাঁ-দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। আসলে ওটা ব্রিজ নয়, পিচের রাস্তা—থানার সামনের রাস্তা থেকে অনেকটা উঁচু। বাঁ-দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসে সেই রাস্তাটা একটু পরেই থানার সামনের রাস্তার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

ঢালু রাস্তাটায় রেলিঙের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো বেশ কয়েকটা ধুলো-ময়লা মাখা গাড়ি। বোধহয় পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে লাল ফিতের ফাঁসে আটকে গেছে।

থানা থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকে হাঁটা দিল পরমেশ আর প্রমিতা। অনেকগুলো দাঁড়-করানো গাড়ি পেরিয়ে তারপর ওদের গাড়ির কাছে পৌঁছল।

বাঁ-দিকে অচল 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ'—তার বন্ধ কোলাপসিব্‌ল গেটে তালা ঝুলছে।

সেদিকে তাকিয়েই চমকে উঠল পরমেশ। গেটের পাশে খানিকটা আড়ালে আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সুদেব সামন্ত।

ওকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরমেশ। চাপা গলায় প্রমিতাকে বলল, 'চট করে গাড়িতে উঠে পড়ো...।'

প্রমিতা সুদেবকে খেয়াল করেনি। তাই অবাক হয়ে পরমেশের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'হঠাৎ কী হল?'

সূক্ষ্ম ইশারায় সুদেবকে দেখাল পরমেশ।

ওকে দেখেই প্রমিতা ছোট্ট করে কেঁপে উঠল। ও তো অনেকক্ষণ আগেই থানা থেকে বেরিয়েছে! তা হলে এতক্ষণ ধরে এভাবে অপেক্ষা করছে কেন? কী জন্য?

তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়ল দুজনে। পরমেশ গাড়ি স্টার্ট দিল। চাবি ঘোরানোর সময় ওর হাত অল্প-অল্প কাঁপছিল।

গাড়ি স্টার্ট নিতে-না-নিতেই সুদেব সামন্ত ছিটকে চলে এল পরমেশের জানলার কাছে। ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল, 'স্যার, আমায় একটু লিফ্‌ট দেবেন? বরফকলের সামনেটায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

সুদেবের সাদা-সরল মুখের দিকে তাকাল পরমেশ। এই ছেলেটা ক্রিমিনাল হতে পারে না! রাজতনু চ্যাটার্জি ঠিকই বলেছে। সুদেব সামন্ত সুচরিতাকে খুন করেনি।

তা নইলে থানার সামনে পরমেশদের কাছে কখনও লিফ্‌ট চায়! কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমেশের এমন অস্বস্তি হচ্ছে কেন? কেন ওকে দেখামাত্রই পরমেশ এড়িয়ে যেতে চাইছে?

পরমেশ পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে দরজার লক খুলে দিল। সুদেব 'থ্যাংক য়ু, স্যার' বলে পরমেশের ঠিক পিছনের দরজাটা খুলে গাড়িতে উঠতে গেল।

তখনই হিস্টিরিয়ার রুগির মতো আচমকা চেঁচিয়ে উঠল প্রমিতা। পরমেশের উরু খামচে পাগলের মতো বলে উঠল, 'না! না! ওকে গাড়িতে নেবে না! গাড়ি চালিয়ে দাও শিগগির! কুইক! চালাও—!'

প্রমিতা চেঁচাচ্ছিল আর পরমেশের হাঁটুতে, উরুতে, দুমদুম করে কিল মারছিল। তাতেই পরমেশের মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল। ও এক হ্যাঁচকায় গাড়িটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল। ভুলে গেল যে, একটু আগেই সুদেবকে ওদের নিরপরাধ মনে হয়েছে।

গাড়িটা হ্যাঁচকা মেরে এগিয়ে যেতেই সুদেব সামন্ত পালটে গেল। গাড়ির দুটো জানলার মাঝের খুঁটিটা দু-হাতে টেনে ধরল ও। ওর হাতের, গলার, শিরা ফুলে উঠল।

পরমেশের মারুতি গোঁ-গোঁ শব্দ করছিল বটে তবে কচ্ছপের মতো একটু-একটু করে সামনে এগোচ্ছিল। সুদেবের জানোয়ারের মতো শক্তির সঙ্গে মারুতি-৮০০ ঠিক পেরে উঠছিল না।

প্রমিতা সুদেবকে দেখছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল পরমেশও।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একটা জানোয়ার যেন গাড়িটাকে আঁকড়ে ধরেছে। সুদেবের শান্ত চোখ দিয়ে এখন ঘৃণা আর হিংসার আগুন বেরোচ্ছে। এতক্ষণ যাকে দেখে মনে হচ্ছিল ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, এখন মনে হচ্ছে সে কাঁচা মাছ চিবিয়ে খেতে পারে। রিতুকে একবার নয়, একশোবার ধর্ষণ করে খুন করতে পারে এই ছেলেটা।

প্রমিতা তখনও চিৎকার করছিল, পরমেশকে গাড়ি ছোটানোর জন্য বারবার তাগাদা করছিল। আর মারুতি-৮০০ অল্প-অল্প করে সুদেবকে হারিয়ে জিতে যাচ্ছিল।

একসময় সুদেবকে ছিটকে ফেলে দিয়ে পরমেশের মারুতি গাড়িটা ছুটে গেল সামনে। পরমেশ দেখল, সুদেবের জোয়ান শরীরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার কাদা-জলে। কয়েকবার পালটি খেয়ে প্রায় মাঝরাস্তায় গিয়ে থামল। ওর জামা-প্যান্ট কাদায় মাখামাখি।

প্রমিতা দমবন্ধ করে পরমেশের উরু খামচে ধরে বসে ছিল, আর একনাগাড়ে

pathagar.net

বলছিল, ‘জোরে চালাও! জোরে চালাও! আরও জোরে!’

পরমেশের বুকের ভেতরে বিগড্রাম বাজছিল। গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে ওর মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ [illegible] বসে সুদেবকে ওরা যা দেখেছে, যেভাবে দেখেছে, সব মিথ্যে। আর এখন, এই কয়েক সেকেন্ডে, সুদেবকে যা দেখল সেটাই একমাত্র সত্যি।

ওর ভিজে বেড়ালের মুখোশ ছিঁড়ে একটা শুকনো খটখটে হিংস্র চিতা বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু পরমেশদের এই কথা বিশ্বাস করবে কে? কেউ তো আর সুদেবকে অমনভাবে মারুতি গাড়িটাকে টেনে ধরতে দেখেনি! দেখেছে শুধু পরমেশ আর প্রমিতা।

আট

কলিংবেল যখন বেজে উঠল তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা হবে।

প্রমিতা রান্না করছিল। আর বুবু ড্রইংরুমে বসে মিসের কাছে পড়ছিল। মিস পড়াতে এসেছে সাড়ে ছ'টা নাগাদ। এখন ওর যাওয়ার সময়। তাই বুবু উসখুস করছিল।

সুতরাং কলিংবেলের শব্দ শোনামাত্রই বুবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ছুট লাগিয়েছে দরজার দিকে।

বুবুকে ভালো করে চেনে বলেই প্রমিতা চট করে চলে এসেছিল রান্নাঘরের দরজায়।

ফোন বাজলেই বুবু ছুটে ধরতে যায়। দরজায় কলিংবেল বেজে উঠলেই ও ছুটে চলে যায় দরজার কাছে। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁকি মারতে চায় ম্যাজিক আই-এ। তারপর দরজা খুলেই বড়দের ঢঙে বলে ওঠে, 'কাকে চাই?'

প্রমিতা চেঁচিয়ে উঠল, 'দরজা খুলবি না!'

বুবু দাঁড়িয়ে পড়ল। বড়-বড় চোখ মেলে মামের দিকে তাকাল।

আগে হলে বুবু হয়তো মামের বারণ শুনত না—ছুট্টে গিয়ে দরজা খুলে দিতই। কিন্তু সুচরিতার চলে যাওয়ার পর থেকে প্রমিতা কেমন যেন খিটখিটে রাগী হয়ে গেছে। চালচলন একটু বেচাল হলেই এখন বুবুকে চড়-থাপ্পড়-কানমলা খেতে হয়। এতে বুবুর খুব কষ্ট হয়। রাতে শোওয়ার পর ও মনে-মনে 'গড'-কে ডাকে। আর তারপরই ডাকে দিদিকে। ফিসফিস করে বলে, 'দিদি, তুই ফিরে আয়। তুই নেই বলে সবকিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাকে বেশি-বেশি বকুনি আর মার খেতে হচ্ছে।'

প্রমিতা ইশারা করে বুবুকে পড়ার টেবিলে ফিরে আসতে বলল : 'তুমি পড়তে বোসো—আমি দেখছি।'

মাম যে রেগে গেলে ওকে 'তুমি' করে বলে সেটা বুবু জানে। তাই ও গুটিগুটি পায়ে ফিরে এল মিসের কাছে।

প্রমিতা এগিয়ে গিয়ে ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখল।

অরিন।

দরজা খুলে দিল প্রমিতা। বলল, 'এসো, ভেতরে এসো—।'

ফরসা, রোগা চেহারা। চোখগুলো ছোট অথচ সামান্য টানা-টানা। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা—তাতে হালফ্যাশানের ছোট-ছোট কাচ।

অরিন কেমন যেন অস্বস্তির চোখে চারপাশটা দেখছিল। অবাস্তব হলেও প্রমিতার মনে হল, ওর চোখ সুচরিতাকে খুঁজছে।

pathagar.net

একসময় খুঁজে পেল। ঘরের বাঁ-দিকের দেওয়ালে ওর সুন্দর ফটোটা টাঙানো রয়েছে। শ্রাদ্ধের সময় এই ছেলেটাই অবাক হয়ে অতিথিদের দেখছিল। এখন অরিনকে দেখছে।

'তুই কি জানিস, তোকে কী দারুণ দেখতে?'

'তাই?' ফটো থেকে রিতু বলে উঠল।

'সত্যি। অনেস্টলি বলছি। কসম্‌সে।' দু-আঙুলে টুটি ছুঁয়ে শপথ করে বলল অরিন।

'ও. কে.। এবার বল, কী চাই?'

'তোকে।'

'চাইলেই কি সবকিছু পাওয়া যায়?' সুচরিতা চোখ মটকে দুষ্টুমি করে হাসছে।

'না, পাওয়া যায় না। সেটা জানে বলেই সবাই আরও বেশি করে চায়।'

'কতটা বেশি, শুনি—।'

'এই ধর, চাতক পাখি যেভাবে বৃষ্টি চায়...।'

'আর?'

'একজন অন্ধ যেভাবে গোলাপ ফুল দেখতে চায়...।'

'আর?'

'জীবনের ওপার থেকে যেভাবে কেউ এপারে ফিরে আসতে চায়... সেইরকম।' অরিনের চোখ জ্বালা করে উঠল। চোখের কোণ মুছে ও ভাঙা গলায় বলল, 'এপারে চলে আয়, রিতু! ফটো থেকে বেরিয়ে আয় ফর গড্‌স সেক! কাম অন, রিতু...জাস্ট ওয়ান্স...আমার জন্যে...।'

রিতুর ফটোর দিকে তাকিয়ে অরিন যেন ফটো হয়ে গেল। ওর বুকের ভেতরে ছেনি ঠুকে দেওয়াল ভাঙছিল কেউ।

ফটোর কাচের আড়াল থেকে সুচরিতা একই ঢঙে হাসতেই থাকল।

'এসো। ভেতরে বসবে চলো—।'

প্রমিতার কথায় অরিনের ঘোর কাটল। মাথা নিচু করে 'চোখে কী যেন পড়েছে' এই ভাব দেখিয়ে চোখ মুছল ও। প্রমিতার সঙ্গে-সঙ্গে এগোল।

পরমেশ বাড়িতে নেই। বিকেলের দিকে ফোন করে জানিয়েছিল, ফিরতে দেরি হবে। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কয়েকটা বইয়ের খোঁজে যাবে। আর সেখান থেকে যাবে কোন একটা ফটোর দোকানে। ছোটবেলা থেকে সতেরো বছরে পা দেওয়া পর্যন্ত সুচরিতার যত ফটো ছিল সব পরপর সাজিয়ে পরমেশ একটা স্পেশাল অ্যালবাম তৈরি করতে চায়। তাই একগাদা নেগেটিভ আর প্রিন্ট নিয়ে বেরিয়েছে—সেই দোকানে কথা বলবে।

অরিনের গাল সামান্য বসা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গলায় একটা সোনার

চেন। গায়ে লাল-নীল-কালো স্ট্রাইপ দেওয়া টি-শার্ট। পায়ে ফেডেড জিন্‌স।

'আন্টি, আমি একটা বই নিতে এসেছি। সুচরিতারই বই....আমার একটু লাগবে, তাই। আমি....নেক্সট উইকে রিটার্ন করে দেব।'

'রিটার্ন করতে হবে না। রিতু তো আর পড়াশুনো করবে না! ওপরে ওর ঘরে সব বইপত্র সাজানো আছে—তুমি গিয়ে দেখে নিয়ে নাও।'

অরিন রান্নাঘরের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোতে যাচ্ছিল, প্রমিতা ওকে থামাল। বলল, 'একটু বসে যাও। ভেজিটেব্‌ল চপ ভেজেছি—একটু চেখে দ্যাখো কেমন হয়েছে।'

অরিন বাতাসে চপের গন্ধ পাচ্ছিল। মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, আন্টি। আমি—।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে প্রমিতা বলল, 'কতদিন পরে তুমি এলে। রিতু সবসময় তোমার কথা বলত।'

অরিনের বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল। জোয়ার উথলে উঠল একইসঙ্গে।

'রিতু সবসময় তোমার কথা বলত।'

প্রমিতা সতেরোর ছেলেটিকে দেখছিল। কেমন যেন ক্যাবলা-ক্যাবলা পড়ুয়া চেহারা। কথাবার্তা শান্ত, মার্জিত। বোধহয় একটু চাপা স্বভাবেরও।

সত্যিই রিতু অরিনের কথা প্রায়ই বলত।

যদিও সাধারণ কথা, তবুও প্রমিতা কিছুটা ভালো লাগার ব্যাপার যেন বুঝতে পেরেছিল। সতেরো-আঠেরোয় যা হয়।

অরিন সুচরিতার ফটোর দিকে তাকাল। তুই কি জানিস, তোকে কী দারুণ দেখতে?

ফটো অরিনকে নজর ফিরিয়ে দিল।

প্রমিতার কথায় অরিন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ইতস্তত করে আঙুল মটকাচ্ছিল। সুচরিতার জন্য কষ্ট ও কিছু কম পায়নি। লাঠির বাড়ি খাওয়া সাপের মতো মনটা বারবার মোচড় খেয়েছে, ছটফট করেছে।

রিতু মারা যাওয়ার পরের দিনগুলো মনে পড়ছিল অরিনের। কী অসহ্য কষ্ট সইতে হয়েছে ওকে! অথচ ও ভালো করেই জানে, ওর সঙ্গে রিতুর ব্যাপারটা ভালোলাগার ধাপের বেশি পেরোয়নি। যদিও অরিন বেহায়ার মতো ওর মনের কথা অকপটে ওই সুন্দর মেয়েটাকে বলেছে, তবুও ওই মেয়েটা স্পষ্ট করে অরিনকে কিছু জানায়নি—বরং অরিনের কাছে জানতে চেয়েছে। এতই চাপা স্বভাবের ছিল রিতু—অন্তত এই ব্যাপারে।

ওর সঙ্গে একই কোচিং-এ পড়তে এসে প্রথম আলাপ। এরকম আলাপ তো অনেকের সঙ্গেই হয়! যেমন, সুচরিতার সঙ্গে আরও অনেক সমবয়েসি ছেলের

pathagar.net

আলাপ হয়েছিল একইভাবে। আর তাদেরও কেউ-কেউ যে ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত না এমন নয়। কিন্তু রিতু ওদের পাত্তা দিত না—অন্তত অরিনের তাই মনে হত। অথবা বলা ভালো, এরকম মনে হওয়াটা অরিনের ভালো লাগত।

কিন্তু অরিনকে কি বাড়তি পাত্তা দিত রিতু? অরিনের মনে হত, দিত। কিন্তু সে-কথাটা রিতুর কাছ থেকে ও কখনও জানতে পারেনি।

ইংলিশ কোচিং-এ পড়তে গিয়ে প্রথম যেদিন সুচরিতাকে দ্যাখে সেদিন থেকেই অরিন তীরবিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবসময় হাঁ করে রিতুর দিকে তাকিয়ে থাকত।

কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করার পর কোচিং-এর অন্য বন্ধুরা অরিনকে খোঁচাতে শুরু করল, নানান মজার মন্তব্য ছুড়ে দিতে লাগল ওকে।

অরিন লজ্জা পেয়ে যেত। সত্যি কথাটা ওর ঠোঁটের কাছে এসেও আটকে যেত। কিছু বলতে পারত না।

কিন্তু একদিন—সেই দিনটা অরিনের পরম লজ্জা এবং পরম ভালোলাগার দিন—অরিন মুখ ফসকে সত্যি কথাটা বলে ফেলেছিল হাটের মাঝে।

কে যেন বস্তাপচা প্রশ্নটা তুলেছিল আবার। অরিনের এখন আর ঠিক মনে পড়ে না। কোচিং ক্লাস থেকে ওরা ঝাঁক বেঁধে একসঙ্গে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছিল। একটু পরেই যে-যার বাড়ির দিকে রওনা দেবে। হঠাৎই কে যেন—হয় প্রতাপ, কিংবা মিতুন—ওকে জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, তুই সুচরিতার দিকে ওভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থাকিস কেন রে?'

অরিন ইতস্তত করছিল। সেইসঙ্গে লজ্জাও পেয়ে গেল। কারণ, ওদের জটলায় সুচরিতাও দাঁড়িয়ে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও দু-তিনজন ছেঁকে ধরল।

'বল—আজ তোকে বলতেই হবে—।'

'শিগগির বল, ওভাবে ননস্টপ সুচরিতার দিকে তাকিয়ে থাকিস কেন?'

কী যে মাথার মধ্যে হয়ে গেল অরিনের! এতদিন ধরে বুকে চেপে রাখা সত্যিটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল বাইরে।

'তাকিয়ে থাকি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি না বলে...।'

ব্যস, বন্ধুদের কাছে অরিন পুরো খোরাক হয়ে গেল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। কেউ-কেউ বলল, 'আজ তোকে খাওয়াতে হবে...।' কয়েকজন মেয়ে সুচরিতাকে নিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যেই কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'কী মনা, তুমি এবার পোস্টার হয়ে অরিনের বেডরুমের দেওয়ালে সেঁটে যাও...।'

ওঃ, সে কী কেলেঙ্কারি!

তবে কেলেঙ্কারিটা অরিনের ভালো লেগেছিল। অন্তত রিতু তো জানতে পারল সত্যি কথাটা।

এর কয়েকদিন পর অরিন সুচরিতাকে ফোন করেছিল।

'অ্যাই, সুচরিতা, সেদিনের ব্যাপারটার জন্যে অ্যাপলজি চাইছি। তুই কিছু মাইন্ড করিস না, প্লিজ...। আসলে হট করে কেন যে বলে ফেললাম...।'

সুচরিতা নিচু মোলায়েম গলায় বলেছিল, 'না, আমি কিছু মাইন্ড করিনি। কিন্তু শোন, সব সত্যি কথা ওভাবে সবার মাঝে বলতে নেই...।'

রিতুর কথা শুনে অরিনের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। রিতু তা হলে কিছু মাইন্ড করেনি!

তারপর থেকে রিতুকে প্রায়ই ফোন করত অরিন। যে-সত্যি কথাগুলো সবার মাঝে বলতে নেই, সেই সত্যি কথাগুলো ফোনে বলত।

তুই কি জানিস, তোকে কী দারুণ দেখতে?

দেওয়ালে-দেওয়ালে ঠোক্কর খাওয়া প্রতিধ্বনির মতো কান্না গুমরে মরছিল অরিনের বুকের ভেতরে। ওর অন্তরমহলের দেওয়ালে নিষ্ঠুরভাবে মাথা খুঁড়ছিল।

ভালোলাগার ধাপ পেরিয়ে খুব বেশি এগোয়নি অরিন। অথচ তাতেই এত কষ্ট! যদি ওদের সম্পর্কটা আরও এগোত তা হলে তো কষ্ট অনেক বেশি হত! অরিনের ভেবে ভালো লাগল যে, ওকে অনেক কম কষ্ট সইতে হচ্ছে। কিন্তু কম কষ্টের নমুনা এই! ওঃ...!

রিতু চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েকদিন দেশবন্ধু পার্কে গেছে অরিন। পড়ন্ত বিকেলে একা-একা গাছপালার মাঝে বসে থেকেছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা, পাগল-পাগল। রিতুর যে এতটা শূন্যতা তৈরির ক্ষমতা আছে তা অরিন আগে বুঝতে পারেনি। যে যত পূর্ণ তার চলে যাওয়া তত বেশি শূন্যতা তৈরি করে। কিন্তু কীভাবে পূর্ণ ছিল রিতু? কীভাবে অরিনকে ও পূর্ণ করেছিল?

অরিনের চারপাশ চোখের জলে ঝাপসা। সূর্য হেলে পড়েছে গাছের আড়ালে। আকাশ লাল। এই সূর্যাস্ত কখনও বুঝি শেষ হবে না। কারণ, সুচরিতা অস্ত গেছে।

একটা বুকফাটা হাহাকার নিঃশব্দে ছুটে বেড়াচ্ছিল অরিনের ভেতরে। একদলা ভাতের মণ্ড যেন আটকে ছিল গলায়। এত কষ্ট! এত যন্ত্রণা! ওঃ ভগবান!

অন্ধকারে পার্কের ঘাসের ওপরে বসে হাউহাউ করে কেঁদেছে অরিন। কান্না ছাড়া আর তো কিছু করার নেই! কেন যে মরতে ওই ইংলিশ কোচিং-এ ও ভরতি হতে গিয়েছিল! যদি ওখানে ভরতি না হত তা হলে রিতুর সঙ্গে আর দেখা হত না। আর এত কষ্টও পেতে হত না।

কিন্তু সুচরিতার সঙ্গে দেখা হয়ে ও যেটুকু পেয়েছে সেটুকুও তো পেত না তা হলে! তা হলে যে অন্যরকম এক শূন্যতা নিয়ে ওকে কাটাতে হত!

অরিনের হঠাৎই মনে হল, পূর্ণতার ছোঁয়া পেয়েছে বলেই শূন্যতার মানে ও বুঝতে পারছে।

pathagar.net

এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের মাঝে দাঁড়িয়ে ধারালো শোকের ছুরিতে ছিন্নভিন্ন হতে লাগল অরিন। নিজেকে দুঃখের স্রোতে ভাসিয়ে দিল। এই শোকের সঙ্গে লড়াই করে ও পেরে উঠবে না। তার চেয়ে অনেক ভালো প্রকৃতি আর নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া।

এই অবস্থার মধ্যে যখন দিনগুলো কাটছিল তখন হঠাৎই অরিনের মনে হয়েছে, সুচরিতা যেন ওকে ডাকছে, বলছে, 'আমাদের বাড়িতে আয়—এলে তোর ভালো লাগবে...।'

ওর কথা শুনে গেছে অরিন। একবার নয়—দুবার। কোনও খাতা কিংবা বই নেওয়ার অজুহাতে সুচরিতার মায়ের সঙ্গে দেখা করেছে। ওদের বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ফিরে আসার পর ওর মনে হয়েছে, সুচরিতার কথা একেবারে মিথ্যে নয়। সত্যিই সুচরিতা নেই জেনেও ওর পোড়া মনের জ্বালা একটু যেন কমেছে। যেন মনে হয়েছে, সুচরিতা ওর আশেপাশেই আছে।

আজও সেই প্রলেপটা টের পাচ্ছিল অরিন।

দোতলায় সুচরিতার ঘরে গেলে ও কী অনায়াসেই না সুচরিতার গন্ধ পায়। ওর স্পর্শ লেগে থাকা জিনিসপত্রগুলো বারবার ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দ্যাখে। মনে হয়, রিতু এই একটু বাইরে গেছে—এক্ষুনি এসে পড়বে।

আর সেই এসে পড়ার জন্য অরিন অপেক্ষা করছিল।

'তুমি ও-ঘরে একটু বোসো—আমি আসছি।' কথাটা বলে শোওয়ার ঘরের দিকে ইশারা করল প্রমিতা।

অরিন পায়ে-পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল। চোখ তুলে তাকাল সিলিং ফ্যানের দিকে। ঘটনার দিন—অথবা দুর্ঘটনার দিন এই সিলিং ফ্যানটাই ইলেকট্রিক মিস্তিরি লাগাতে এসেছিল। রিতু দরজা খুলে দিয়েছিল লোকটাকে। তারপর....।

তারপর কী হয়েছে কেউ জানে না। সেই লোকটা—অথবা অন্য কোনও লোক—রিতুকে ধ্বংস করেছে। রিতু আর কখনও কাউকে দরজা খুলে দেবে না।

বুবু হঠাৎই ডাকল প্রমিতাকে। প্রমিতা দেখল, মিস চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। অল্পবয়েসি ছিপছিপে মেয়ে। একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। সাজগোজ একটু চড়া হলেও মেয়েটা খারাপ নয়। বুবুর সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

মিসকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল প্রমিতা। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। ঘুরে তাকাতেই দ্যাখে বুবু টিভি চালিয়ে দিয়েছে। বই-খাতা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দু-হাত ডাইনিং টেবিলে ভাঁজ করে রেখেছে। তার ওপরে থুতনি রেখে অত্যন্ত মনোযোগে কার্টুন নেটওয়ার্ক চ্যানেল দেখতে শুরু করেছে।

প্রমিতা ফিরে এসে ওকে ধমক লাগাতেই বুবু ইনিয়েবিনিয়ে বলল, 'আমার খুব

খিদে পেয়েছে, মাম। সস দিয়ে চপ খাব। দুটো চপ খাব।'

বুবু কথা বলছিল টিভির দিক থেকে চোখ না সরিয়ে।

প্রমিতার বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। রিতু থাকলে এখন ই-টিভি বাংলা চালিয়ে দিত। সে নিয়ে দু-ভাইবোনে ঝগড়া-চেঁচামেচিও হত। এখন টিভি চ্যানেল নিয়ে বুবুর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

প্রমিতা অরিনকে ডেকে নিয়ে এল ডাইনিং টেবিলে।

অরিন একটা মোবাইল ফোনের বোতাম টিপছিল। সেটা কানে দিয়ে বুবুর দিকে তাকিয়ে হেসে জিগ্যেস করল, 'মিস্টার বুবু, কেমন আছ?'

বুবু ঘাড় নেড়ে বলল, 'ভালো। মোবাইল ফোনটা দাও—বোতাম টিপব।'

প্রমিতা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। দুটো প্লেটে দুটো করে চপ সাজিয়ে ফিরে এল ডাইনিং টেবিলে। অরিন তখন ফোনটা কান থেকে নামিয়ে নিয়েছে।

অরিনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ওর সামনে একটা প্লেট রাখল প্রমিতা : 'নাও, খেয়ে নাও।'

বুবু ওর চেয়ার থেকে নেমে অরিনের কাছে চলে এসেছিল। মোবাইল ফোনটা হাতে নেওয়ার জন্য বায়না করছিল : 'অরিনদা, ফোনটা দাও, বোতাম টিপব।'

প্রমিতা ওকে চাপা গলায় বকুনি দিল : 'কী হচ্ছে, বুবু! বোতাম টিপলে ফোন খারাপ হয়ে যাবে। নাও, চপটা চটপট খেয়ে নাও।'

বুবুকে হাত ধরে আবার চেয়ারে বসাল প্রমিতা। একটা গরম চপ চামচ দিয়ে ভেঙে দিল। তারপর টেবিলে রাখা টমেটো সসের একটা বোতল টেনে নিল। ছিপি খুলে বুবু আর অরিনের প্লেটে বোতল ঝাঁকিয়ে সস দিল।

তখনই প্রমিতার মাথাটা কেমন পাক খেয়ে গেল। সসের বোতলটা হাত থেকে খসে পড়ল টেবিলে। তারপর শব্দ করে কাত হয়ে এপাশ-ওপাশ গড়াতে লাগল—পেন্ডুলামের মতো।

প্রমিতা চট করে একটা চেয়ার ধরে ফেলেছিল। তা ছাড়া অরিনও চমকে উঠে ওর একটা হাত চেপে ধরেছে, উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করেছে, 'কী হল, আন্টি?'

প্রমিতা কপাল চেপে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল। ওর বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল। চোখ বুজে ফেললেও ও সুচরিতার সসে মাখামাখি মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। আর তার মাঝের একটা গর্ত থেকে সুচরিতার একটা নিষ্প্রাণ চোখ তাকিয়ে ছিল ওর দিকে।

প্রমিতা টেবিলে রাখা প্লাস্টিকের বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেল। কপালে-মুখে হাত বোলাল। নিজেকে সামলে নিল।

অরিন জিগ্যেস করল আবার, 'কী হয়েছে, আন্টি?'

pathagar.net

মাথা নাড়ল প্রমিতা : 'না, কিছু হয়নি।'

ওই দিনটার পর থেকে প্রমিতা বা পরমেশ টমেটো সস আর খেতে পারে না। কিন্তু বুবু সস যেরকম ভালোবাসে—তাই রাখতে হয়। তা ছাড়া বাইরের গেস্টরাও তো আসে!

চপ খেতে-খেতে অরিনের মোবাইল ফোনটা আবার চাইল বুবু।

অরিন বলল, 'মাম বলল শোনোনি? বোতাম টিপলে ফোনটা খারাপ হয়ে যাবে।'

বুবু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বাপিও আমাকে মোবাইল ফোনের বোতাম টিপতে দেয় না। তোমার মতো বলে, ফোন ড্যামেজ হয়ে যাবে। দিদি ভালো। সবসময় আমাকে দিত।'

প্রমিতা অবাক হল। ওর ভুরু কুঁচকে গেল।

'সবসময় তোকে কী দিত দিদি?'

'মোবাইল ফোন। আমি বোতাম টিপে মিউজিক বাজাতাম—দিদি নাচত।'

নিজের অজান্তেই অরিন এক চিলতে হেসে ফেলল। রিতুর এই একটা হ্যাবিট ছিল। মোবাইল ফোনের নানান রকম রিং-টোন বাজিয়ে তালে-তালে শরীর দোলাত—যেটাকে বুবু নাচ বলছে।

প্রমিতা ঝুঁকে পড়ে বুবুর কাঁধে হাত রাখল : 'তোর দিদির মোবাইল ফোন ছিল নাকি?'

বুবু চোখ বড়-বড় করে বলল, 'হ্যাঁ। নীল রঙের লাইট জ্বলত। কী সুন্দর মিউজিক বাজত!'

প্রমিতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

রিতুর মোবাইল ফোন ছিল! কবে কিনল? কই, প্রমিতাকে ও কিছু বলেনি তো! আচ্ছা, পরমেশ কি ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল?

অরিন ভেজিটেব্‌ল চপে কামড় দিয়ে স্বাদ নিচ্ছিল। প্রমিতার অবাক হওয়ার ব্যাপারটা ওকে অবাক করল।

সুচরিতার যে একটা স্যামসাঙ আর-টু-টুয়েন্টি মোবাইল ফোন ছিল সেটা প্রমিতা জানে না? মাসদুয়েক আগে দু-হাজার টাকায় এই সেকেন্ডহ্যান্ড সেটটা কিনেছিল রিতু। তারপর ক্যাশকার্ড ভরে নিয়েছিল। সুচরিতা কি বাড়িতে সেসব জানায়নি?

অরিনকে মোবাইল নম্বর দিয়েছিল সুচরিতা। অরিন মাঝে-মাঝে ওকে মোবাইলে ফোন করত। বিশেষ করে রাতে—এগারোটার পর। সুচরিতা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে দোতলায় নিজের ঘরে চলে যেত। তারপর পড়াশোনা করত, কিংবা গান শুনত।

অরিনের আবছা মনে পড়ল, রিতু একবার যেন বলেছিল, ও মোবাইল ফোন

কেনার জন্য ওর বাপির কাছে টাকা চেয়েছিল। তাতে বাপি নাকি বলেছে, 'যাঃ, এখন কী! আগে এইচ. এস.-টা পাশ করে নে, তারপর।'

রিতু তখন বলেছিল, 'আমার বন্ধুরা অনেকে কিনেছে.....এতে ডেইলি কমিউনিকেশানের অনেক সুবিধে হয়। কোনও টিউশনের টাইম চেঞ্জ হলে পর চটপট জেনে নেওয়া যায়....।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমেশ রাজি হয়নি। তা ছাড়া তখন ওর একটু টানাটানিও চলছিল।

প্রমিতা তখনও বুবুকে জেরা করে চলেছে।

'সত্যি বলছিস? তুই নিজের চোখে দেখেছিস?'

বুবু ঘন-ঘন মাথা নাড়ল : 'হ্যাঁ—সত্যি—গড ক্রস, মাম।'

প্রমিতা এবার চোখ তুলে তাকাল অরিনের দিকে।

অরিন ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ, আন্টি—সুচরিতার একটা মোবাইল ছিল। স্যামসাঙ আর-টু-টুয়েন্টি। মাসদুয়েক আগে কিনেছিল। ওর নাম্বার ছিল....।'

প্রমিতা কেমন আনমনা হয়ে গেল। অরিনের শেষ কথাগুলো ওর কানে গেল না।

রিতুর মোবাইল ফোন ছিল!

অরিন মনে-মনে সুচরিতার ফোন নম্বরটা কয়েকবার আওড়াল। যেন কোনও মন্ত্র জপ করছে। মোবাইল ফোনে কতবার যে এই নম্বরটা ও টিপেছে! এই তো, একটু আগেও এই নম্বরটা টিপে রিং বাজানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু হয়নি।

সেই রবিবারের পর থেকেই রিতুর নম্বরে ফোন করলে কোনও রিং হচ্ছে না। তার বদলে রেকর্ডেড ভয়েস বলছে, '....গ্রাহককে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। দয়া করে একটু পরে চেষ্টা করুন....।'

একটু আগেও তাই বলল। কিন্তু অরিন যে কী এক নেশায় পড়ে গেছে!

প্রমিতা কেমন যেন থম মেরে ছিল। শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল রিতুর ফটোর দিকে।

অরিন ইতস্ততভাবে চপ শেষ করছিল। আর বুবু টিভির দিকে তাকিয়ে খেয়ে যাচ্ছিল।

একটু পরেই অরিন উঠে দাঁড়াল। প্রমিতাকে বলল, 'আন্টি, আপনার চপ দারুণ হয়েছে।'

প্রমিতা ম্লান হাসল, বলল, 'আর-একটা দিই?'

'না, না, দুটো খেয়ে পেট ভরে গেছে।' প্যান্টে হাত ঘষে হাতটা মুছে নিল অরিন। মোবাইল ফোনটা কোমরের লকে আটকে নিল। তারপর : 'আন্টি, ওপরে

pathagar.net

যাব? ওই বইটা....।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাও।' প্রমিতার কথা শুনে মনে হল ওর মন অন্য কোথাও পড়ে আছে।

অরিন দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

প্রমিতা চুপচাপ বসে রইল। ও যেন চিন্তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে....তলিয়ে যাচ্ছে....।

আসলে ও মনে-মনে ফিরে গিয়েছিল সেই রবিবারের ঘটনায়।

খুনের সূত্র খুঁজে পেতে পুলিশ নিয়ম মতো বাড়ি সার্চ করেছে। রিতুর ঘরটাও দেখেছে, তবে ওপর-ওপর। তাতে কোনও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। এমনকী রাজতনু চ্যাটার্জি পরমেশকে মোবাইল ফোনের কথা জিগ্যেসও করেছিল। তাতে স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ বলেছে, না, রিতুর মোবাইল ফোন ছিল না।

তার মানে, রিতু যে মোবাইল ফোন কিনেছিল সেটা পরমেশও জানত না!

পরমেশের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রিতু ফোনটা কিনেছিল। তাই হয়তো ভেবেছিল, পরে একসময় মেজাজ বুঝে বাপিকে আর মামকে ফোনটার কথা বলে চমকে দেবে। কিন্তু তার আর সময় পায়নি।

এইভাবে চিন্তায়-চিন্তায় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট কেটে গেছে প্রমিতার খেয়াল নেই। হঠাৎই দেখল, অরিন ওপর থেকে নেমে এসেছে—হাতে একটা বই।

'আন্টি, কেমিস্ট্রির এই বইটা নিয়ে গেলাম।' বইটা দেখাল অরিন।

প্রমিতা ঘাড় নাড়ল : 'বললাম তো, বইটা কাজে লাগলে তুমি নিয়ে নাও।'

বুবুকে হেসে 'টা-টা' করল অরিন। তারপর দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, প্রমিতা ওকে পিছু ডাকল।

'শোনো—।'

অরিন ফিরে তাকাল।

'রিতুর ফোনটা দেখলে তুমি চিনতে পারবে?'

একটু যেন ঘাবড়ে গেল অরিন। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে তারপর বলল, 'মনে হয় পারব, আন্টি। ওর ফোনের ফোর লেখা বাটনটায় একটু ডিফেক্ট ছিল। ওটা একটু মিস করত। মানে, কিছু লিখতে গেলে তিন-চারবার বোতামটা টিপতে হত। আর....।'

'ফোনটা যে ও কোথায় ফেলেছে কে জানে!' আনমনাভাবে বলল প্রমিতা।

'হ্যাঁ, আন্টি, আমিও তাই ভাবছিলাম।' উৎসাহ নিয়ে বলল অরিন, 'রিতু যেদিন.....ইয়ে....মানে, মারা যায় তার পরদিন থেকেই ওর নাম্বারে আর রিং হচ্ছে না। রেকর্ডেড ভয়েস বলছে, গ্রাহককে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। দয়া করে একটু

পরে চেষ্টা করুন....। বলুন তো, কী অদ্ভুত ব্যাপার!'

প্রমিতার ভেতরে তোলপাড় চলছিল। একটু সময় নিয়ে ও বলল, 'অরিন, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব—।'

'বলুন—।'

'রিতুর যে মোবাইল ফোন ছিল এটা কাউকে আর বোলো না, প্লিজ।'

একটু অবাক হলেও অরিন বলল, 'ও. কে., আন্টি।'

তারপর প্রমিতাকে 'যাচ্ছি, আন্টি' বলে চলে গেল।

প্রমিতা তখন ভাবছিল, স্যামসাঙ আর-টু-টুয়েন্টি ফোনের মডেলটা কেমন দেখতে? কোনও দোকানে গিয়ে ওটার চেহারাটা একবার দেখে নিতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! রিতুর মোবাইল ফোনটা গেল কোথায়! কোনও লুকোনো জায়গায় পড়ে নেই তো! যদি তাই পড়ে থাকবে, তা হলে ফোন করলে রিং হচ্ছে না কেন?

হঠাৎই বুবুর কাছে এল প্রমিতা। বুবু তখন চপ শেষ করে মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছে। আর মাঝে-মাঝেই আপনমনে হেসে উঠছে।

বুবু ফিরে তাকাল মায়ের দিকে।

প্রমিতা বুবুর মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

ওর চুলে বিলি কাটতে-কাটতে প্রমিতা বলল, 'দিদির মোবাইল ফোনের কথা কাউকে বলবি না। ওটা পুলিশ জানতে পারলে ঝামেলা হবে। এমনকী তোর বাপিকেও বলবি না। বুঝলি?'

বুবু কী বুঝল কে জানে! মায়ের কথায় ও ঘাড় কাত করে বোঝাল যে, হ্যাঁ, বুঝেছে।

বুবুকে রেখে সুচরিতার ঘরের দিকে রওনা হল প্রমিতা। ছেলেকে বলে গেল, কেউ বেল বাজালে ও যেন কিছুতেই দরজা না খোলে।

সুচরিতার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল প্রমিতা। ঘরের সর্বত্র মেয়েটা ছড়িয়ে আছে। ঘরের জিনিসপত্রও ছড়ানো-ছেটানো। মেয়েটা একটু খেয়ালি অগোছালো ছিল।

পড়ার টেবিলে ওর পেনের গোছা, বই-খাতা। দেওয়ালে শাহ্‌রুখ খান আর আমির খানের রঙিন পোস্টার। টেবিলের একপাশে এফ. এম. রেডিয়ো। তার পাশের দেওয়ালে ওর তিনটে ফটোগ্রাফ। এ ছাড়া জামাকাপড়, হাওয়াই চটি, ছোট আলমারি, তার গায়ে বসানো আয়না, আয়নার কোণে চিপকে থাকা তিনটে সোয়েটের টিপ।

হায় খুকু!

চোখে জল এসে গেল প্রমিতার। কিন্তু ও হার মেনে কাবু হল না। কাজটা করতেই হবে। বুঝতেই হবে মোবাইল ফোনের রহস্যটা।

pathagar.net

তন্নতন্ন করে ঘরটা সার্চ করল। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল খাট আর টেবিলের নীচে। আলমারির নীচটা ঝাঁট দিয়েও দেখল।

নাঃ, মোবাইল ফোনটা পাওয়া গেল না। তবে একটা অদ্ভুত জায়গায় মোবাইল ফোনের চার্জার আর ম্যানুয়ালটা প্রমিতা খুঁজে পেল।

সুচরিতার ঘরে খাটের পাশে দেওয়াল ঘেঁষে পুরোনো খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনের ডাঁই। সেইগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে অনেকটা নীচে একটা রঙিন পিচবোর্ডের বাক্স খুঁজে পেল প্রমিতা। তার ভেতরেই পাওয়া গেল চার্জার আর ম্যানুয়াল। পরমেশের কাছেও এধরনের চার্জার আর ম্যানুয়াল দেখেছে ও।

অথচ মোবাইল ফোনটা নেই!

খাটের ওপরে বসে প্রমিতার হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। চার্জার আর ম্যানুয়ালটা মুঠো করে ধরে রিতুর জন্য কান্নায় ভেসে গেল।

ঠিক তখনই নীচে কলিংবেলের শব্দ হল।

তাড়াহুড়ো করে চার্জার আর ম্যানুয়ালটা বাক্সে ভরে কাগজের গাদার নীচে লুকিয়ে ফেলল প্রমিতা। তারপর চটপটে পায়ে সিঁড়ি নেমে এল।

বুবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল, 'মাম, বাপি এসেছে। মাম, দরজা খোলো—।'

দরজা খুলতেই ক্লান্ত পরমেশ ঢুকে পড়ল ঘরে। প্রমিতার ভেজা চোখের দিকে চোখ পড়তেই ও বলে উঠল, 'কী হচ্ছে! নিজেকে একটু সামলে রাখো....প্লিজ!'

'পারছি না...কিছুতেই পারছি না...।' কান্নায় কেঁপে উঠল প্রমিতা।

পরমেশ ওর কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল, বলল, 'তোমার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছে এমন একজন মায়ের সঙ্গে আমার আজ আলাপ হয়েছে। পরশু সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে ওঁকে আসতে বলেছি। কথা বললেই তুমি বুঝবে.....কী কষ্ট ভদ্রমহিলা সয়েছেন। সইতে হবে, প্রমিতা। আমাকেই দ্যাখো না! ভেতরটা ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেলেও বাইরেটা কেমন জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি!'

শেষদিকে পরমেশের গলা ধরে গেল। মুখটা চট করে ঘুরিয়ে নিয়ে ও চলে গেল শোওয়ার ঘরের দিকে।

প্রমিতা চোখ মুছতে-মুছতে ওর পিছন-পিছন এগোল।

বুবু অবাক হয়ে দেখছিল দুই বড় লোকের কান্না। দিদি চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়িটা কেমন যেন দুঃখ-দুঃখ হয়ে গেছে।

নয়

প্রমিতা খুব খুঁটিয়ে নতুন মুখটাকে দেখছিল।

ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রং শ্রাবণের মেঘের মতো। চোখ গভীর। চিকন ভুরু। সরু চোখা নাক। বাঁ গালের মাঝামাঝি ছোট একটা আঁচিল। বয়েস খুব বেশি হলে চৌতিরিশ কি পঁয়তিরিশি।

সবমিলিয়ে মহিলাকে শ্যামল-সুন্দরী বলতে প্রমিতার আপত্তি নেই।

ছিপছিপে চেহারায় কালো আর সবুজ কাজ করা তাঁতের শাড়িটা কী সুন্দর মানিয়েছে! আর কী সহজভাবে তিনি কথা বলছেন!

মহিলার নাম রুমকি সান্যাল। তিনি আসবেন বলে পরমেশ আজ সায়েন্স কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। রুমকি এসেছেন সাতটা নাগাদ। পরমেশই প্রমিতার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

বাইরে ড্রইংরুমে বুবুকে মিস পড়াচ্ছে। তাই ওরা তিনজনে শোওয়ার ঘরে বসেছে।

রুমকির দিকে তাকিয়ে প্রমিতার মনে হচ্ছিল না ওঁর মনে কোনও দুঃখ আছে। তা ছাড়া শাড়ির সঙ্গে মানানসই সাজগোজও যে করেছেন সেটাও বোঝা যাচ্ছে।

চায়ের পাট চুকিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে কথা বলছিল ওরা তিনজন।

রুমকি একটা নামকরা সফ্‌টওয়্যার কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। ওঁর স্বামীও ইঞ্জিনিয়ার, তবে মেকানিক্যাল—একটা কন্‌স্ট্রাকশন কোম্পানিতে আছেন।

সাধারণ আলাপন চলছিল, আর প্রমিতা ভেতরে-ভেতরে অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। ভাবছিল, কতক্ষণে রুমকির দুঃখের কথা জানতে পারবে।

পরমেশ বলল, 'প্রমিতা, আমাদের এক বন্ধু মিসেস সান্যালের কোম্পানিতে আছে। ওর থ্রু দিয়েই ওঁদের মিসহ্যাপের ব্যাপারটা জানতে পারি—।'

রুমকি কথার মাঝখানে থমকে গিয়ে তাকালেন পরমেশের দিকে। ভুরু উঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'মিসহ্যাপ?' তারপরই বুঝতে পেরে বললেন, 'ও—ওই ব্যাপারটা।'

একচিলতে হাসলেন রুমকি। এবং এই প্রথম ওঁর মুখে বিষণ্ণতা ছায়া ফেলল।

পরমেশ কথায়-কথায় সুচরিতার ব্যাপারটা বলল। প্রমিতা মাথা নিচু করে চোখের কোণে আঁচল চেপে ধরল। পরমেশ একপলক প্রমিতার দিকে তাকাল, তারপর ওর কাহিনির খেই ধরল। বলল, 'পুলিশ সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে—আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে হয়তো চার্জশিট দেবে।'

কথা শেষ করে পরমেশ ইশারা করে দেখাল প্রমিতার দিকে : 'ওকে নিয়ে হয়েছে এই মুশকিল। কিছুতেই নিজেকে স্টেব্‌ল করতে পারছে না।'

pathagar.net

রুমকি বললেন, 'স্টেব্‌ল তো করতে হবে। লাইফ কখনও থেমে থাকে না—সবসময় এগিয়ে চলে। আমাদের তো তবু একটা ছেলে আছে। আমাদের আর কেউ নেই—আর কেউ হবেও না।'

প্রমিতা মুখ তুলে তাকাল : 'কেন?'

শাড়ির পাড়ে আঙুল ঘষতে-ঘষতে রুমকি নিচু গলায় বললেন, 'আমার মেডিক্যাল প্রবলেম আছে।'

প্রমিতা রুমকির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শ্রাবণের কালো মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে আরও কালো মেঘ। দুঃখ-মেঘ।

রুমকি হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন। মুখে একটা স্মার্ট ভাব ফিরিয়ে এনে বললেন, 'আমাদের টুপুরের ব্যাপারটা তা হলে বলি। টুপুরের বয়েস ছিল টুয়েল্‌ভ প্লাস। শুনলে বুঝতে পারবেন, কী প্যাথেটিক।

'গতবছরে পুজোর ছুটিতে আমরা গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে শিলিগুড়িতে এসে দেখি রেলওয়ে স্ট্রাইক। কোনও ট্রেনই চলছে না। চারদিকে মানুষের ভিড়, ছুটোছুটি—প্ল্যাটফর্মে একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা—দুনিয়ার লাগেজ ঠাসাঠাসি করে ডাঁই করা রয়েছে—দু-পা হাঁটার জায়গা নেই।

'খোঁজখবর করে যেটুকু জানা গেল, পরদিন বিকেল থেকে ট্রেন চলবে। তখন আমি আর অপরূপ—মানে, আমার হাজব্যান্ড—ঠিক করলাম, হুড়োহুড়ি করে কোনও লাভ নেই। একটা দিন শিলিগুড়িতে কোনও হোটেলে কাটিয়ে দেব।

'একদিন দেরিতে বাড়ি ফিরব শুনে টুপুর তো খুব খুশি। কারণ, বাড়ি ফিরলেই টিউশান আর হোমটাস্কের ভূত তাড়া করবে। তো আমরা লাগেজ-টাগেজ নিয়ে হোটেলের খোঁজে রওনা হব, তখনই খেয়াল করলাম, অপরূপের ব্রিফকেসটা নেই!

'আমরা পাগলের মতো হয়ে গেলাম। কারণ, ওর ভেতরেই টাকাপয়সা, ক্রেডিট কার্ড, আর দরকারি পেপার্স যা-কিছু সব ছিল। ওই ভিড়ে ঠাসা প্ল্যাটফর্মে যতটা তন্নতন্ন করে খোঁজা যায় খুঁজলাম, কিন্তু লাভ কিছু হল না। ওটা পাওয়া গেল না।

'শেষ পর্যন্ত অপরূপ থানায় যাওয়ার কথা ভাবল। তখন আমরা ঠিক করলাম, রেল-পুলিশকে আগে ব্যাপারটা জানাই। তো রেল-পুলিশের ক্যাম্পটা কোনদিকে সেটা একজন ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম। তিনি কী হয়েছে জানতে চাইলেন। তারপর সব শুনে আমাদের নিয়ে গেলেন রেল-পুলিশ ক্যাম্পে।

'সেখানে কথা বলে স্পষ্টই মনে হল, কাজের কাজ কিছু হবে না। কারণ, অফিসারটির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তার কাছে এটা নেহাতই একটা মামুলি ব্যাপার। যাই হোক, মিসিং ডায়েরি লজ করে কাগজপত্রে সই-টই করে দিলাম। তারপর ওই হরিব্‌ল ভিড় ঠেলে কোনওরকমে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

'কী করব ভেবে না পেয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন

টাকা বলতে আমার ব্যাগ আর অপরূপের পকেটে সামান্য যা দু-একশো টাকা আছে! এমন সময় দেখি সেই ভদ্রলোক একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন—হাতে সিগারেট।

'আমি অপরূপকে বললাম, "চলো, ওঁকে প্রবলেমটা একটু বলি—যদি কোনও হেল্‌প পাওয়া যায়...একটা দিনের তো ব্যাপার!"

'আমার কথায় অপরূপ রাজি হল। এতক্ষণ ধরে ও ডিজিটাল ডায়েরি সার্চ করে শিলিগুড়ির কোনও কনট্যাক্ট খুঁজছিল—পায়নি। আমার কাছেও কোনও এফেক্টিভ কনট্যাক্ট নাম্বার ছিল না। আর কলকাতায় ফোন করেও কোনও লাভ হত না। শুধু রিলেটিভদের দুশ্চিন্তা বাড়ত। তখন ইন ফ্যাক্ট একেবারে হেল্‌পলেস অবস্থা। তাই আর কোনও উপায় ছিল না।

'অপরূপ এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলল। দেখলাম, পকেট থেকে ওর বিজনেস কার্ড বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। কার্ডটা পড়েই ভদ্রলোক যেন ইমপ্রেস্‌ড হলেন। ওর সঙ্গে হেসে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর যে-লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাকে হাতের ইশারায় "পরে কথা হবে" গোছের কিছু একটা বোঝালেন এবং হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে অপরূপের সঙ্গে এগিয়ে এলেন আমার আর টুপুরের কাছে।

'ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। শিলিগুড়ি বেস্‌ড একটি করপোরেট হাউসের ফিন্যান্স ডিভিশনের ডেপুটি ম্যানেজার। নাম সত্যব্রত সেন। তিনি আমাদের অবস্থা সব শুনলেন। তারপর হেসে বললেন, "একটা দিনের তো ব্যাপার। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। আমাদের কোম্পানির গেস্ট হাউস ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে নিশ্চিন্তে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর কালকের ট্রেন ধরবেন। আর কোনও চিন্তা করবেন না। আমিও তো কলকাতারই ছেলে। বাগবাজারে আমাদের পৈতৃক বাড়ি। চলুন—।"

'সত্যব্রত আমাদের ভিজিটিং কার্ড দিলেন। তাতে ওঁর অফিসের নাম-ধাম তো ছিলই—তার সঙ্গে রেসিডেন্সের ডিটেইল্‌সও ছিল। আমরা দেখলাম, আমাদের কাছে চুরি করার মতো আর তেমন কিছু নেই—শুধু দুটো রিস্টওয়াচ আর আংটি ছাড়া। তাই অনেকটা হালকা মনে সত্যব্রতর সঙ্গে আমরা রওনা হলাম। বেড়াতে এসে এই সাডেন ক্রাইসিসে পড়ে ওঁকে আমার দেবতা বলে মনে হচ্ছিল।'

কথা বলতে-বলতে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন রুমকি। একটু থামলেন। প্রমিতার কাছে জল চেয়ে জল খেলেন।

পরমেশ মাথা নিচু করে রুমকির কথা শুনছিল। আর একটু যেন উসখুস করছিল। ভাবছিল, কতক্ষণে রুমকির কাহিনি শেষ হবে।

রুমকি জল খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিতেই প্রমিতা আর অপেক্ষা করতে পারল

pathagar.net

না। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'তারপর?'

আক্ষেপের হাসি হাসলেন রুমকি, বললেন, 'তারপর?' একটু থেমে আবার বললেন, 'তারপর কী হল শুনুন।

'সত্যব্রত সেনের সঙ্গে গাড়ি ছিল। মারুতি ভ্যান। তাতে চড়ে আমরা ওঁর অফিসের গেস্ট হাউসের দিকে চললাম।

'পথে আমরা নানান কথা বলছিলাম। বাড়ির কথা, অফিসের কথা। হাসি-ঠাট্টাও চলছিল। দেখলাম, এই অল্প সময়েই সত্যব্রত টুপুরের সঙ্গেও বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। আমি জানলা দিয়ে দেখছিলাম। শহর ছাড়িয়ে আমরা খানিকটা যেন শহরতলিতে ঢুকে পড়েছি। রাস্তার দু-পাশে ঘন গাছপালা, কখনও আবার এবড়োখেবড়ো উঁচু-নিচু জমি।

'প্রায় পঁচিশ মিনিট কি আধঘণ্টা পর একটা সুন্দর করে সাজানো বাংলোমতন বাড়িতে আমরা এসে পৌঁছলাম। বাড়ির সদর দরজায় সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, গেস্ট হাউস। আর তার নীচেই সত্যব্রত সেনের কোম্পানির নাম।

'এরপর সবকিছুই স্বপ্নের মতো ঘটে গেল। সত্যব্রত আমাদের বিশাল এক দু-কামরার ফ্ল্যাটে থাকতে দিলেন। বললেন, এটা ম্যানেজার লেভেলের গেস্টদের জন্যে। তারপর আমাদের ট্রেনের টিকিটগুলো আর পারসোনাল ডিটেইলস্ চেয়ে নিলেন। ওগুলো রিটার্ন করে পরদিনের নতুন টিকিট কাটিয়ে দেবেন। টাকাপয়সার ব্যাপারে অপরূপ একটু আনইজি ফিল করছিল। সেটা বলতেই সত্যব্রত হেসে উঠলেন। বললেন, ''কলকাতায় ফিরে আমার বাড়ির কি অফিসের ঠিকানায় মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবেন।''

'সত্যব্রত গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকারকে ডেকে নিয়ে এলেন। লোকটার নাম অজিত সিং। সত্যব্রত ''সিং-সিং'' বলে ডাকছিলেন। ওকে বললেন আমাদের দেখাশোনা করতে। তারপর ''ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে কাজ সেরে ফিরে আসছি'' বলে চলে গেলেন।

'আমরা মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। সিং আমাদের খাবার দিয়ে গেল। বলল, যে-কোনও দরকারে একবার ডাক দিলেই ও চলে আসবে। আমি, অপরূপ আর টুপুর নিশ্চিন্তে মনের আনন্দে সময় কাটাতে লাগলাম। ঘরে কালার টিভি ছিল—টুপুর তাই নিয়ে মশগুল হয়ে গেল। অপরূপ বারবার বলতে লাগল, ''রুমকি, আমরা কী লাকি! ভাবা যায় না।'' আমি তার উত্তরে ঠাট্টা করে বললাম, ''আমার লাকটা বরাবরই খুব স্ট্রং। তুমি সবসময় সেটার অ্যাডভানটেজ পাও।'' তখন কী আর জানি এর পরে কোন লাক আমাদের জন্যে ওয়েট করছে!

'যাই হোক—দিব্যি আরামে সময় কাটছিল। সত্যব্রত প্রায় ঘণ্টাতিনেক পরে ফিরে বললেন, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ট্রেনের টিকিট অনেক কষ্টে ম্যানেজ করা

গেছে—ওঁদের কোম্পানির রেগুলার যে-ট্র্যাভেল এজেন্ট, তারা খুব হেল্‌প করেছে। কাল বিকেলে স্টেশানে যাওয়ার পথে টিকিটগুলো পিক-আপ করে নেওয়া যাবে।

'সত্যব্রত আমাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করলেন, চা খেলেন, তারপর রাত আটটা নাগাদ চলে গেলেন। বারবার করে বলে গেলেন, "বি কমফোর্টেব্‌ল। যা দরকার শুধু একবার সিং-কে বলবেন। আর আমার মোবাইল নাম্বারটা রেখে দিন—কাজে লাগতে পারে।"

'অপরূপ ওর মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে সত্যব্রতর নাম্বারটা নিয়ে নিল। তারপর "গুডনাইট" বলে সত্যব্রত সেন চলে গেলেন।'

এমন সময় মোবাইল ফোনের রিং বেজে উঠল।

পরমেশ চমকে উঠে পাশের টেবিলে রাখা ওর মোবাইল ফোনের দিকে তাকাল। তারপরই বুঝতে পারল, না, এটা ওর ফোনের রিং টোন নয়। রুমকির ব্যাগের ভেতরে চাপা আওয়াজে ফোন বাজছে।

রুমকি কথা থামিয়ে হাতব্যাগ খুললেন। মোবাইল ফোন বের করে ইংরেজিতে কিছুক্ষণ কথা বললেন। শুনে মনে হল, ওঁর অফিসের কোনও কোলিগ।

ফোনটা হাতব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে রুমকি ওঁর কাহিনির খেই ধরলেন।

'রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই আবছাভাবে টের পেলাম কে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে জাগাতে চাইছে। চোখ খুলতেই একটা আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ড কেমন যেন পাজ্‌ল্‌ড হয়ে গিয়েছিলাম—তারপরই বুঝতে পারলাম, একটা টর্চের আলো আমার মুখের ওপরে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যাব, দেখলাম আমার শরীরটা নড়ছে না। আমার হাত আর পা শক্ত করে বাঁধা।

'আমার মাথায় মাইগ্রেনের মতো অসহ্য পেইন হচ্ছিল। মাথাটা দপদপ করছিল। আর শরীরটা কেমন যেন ভার-ভার লাগছিল। অনেকগুলো স্লিপিং পিল খাওয়ার পর মাঝরাতে জোর করে ঘুম ভাঙালে যেমন লাগে। ফলে আমার ব্রেনটা বোধহয় ঠিকঠাক কাজ করছিল না।

'চোখ পিটপিট করে চারপাশে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইলাম। টর্চের রিফ্লেক্টেড লাইটে আবছাভাবে দেখলাম, ঘরে কয়েকজন লোক—ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথা থেকে এল এই লোকগুলো? আমি কোথায়? এসব ভেবে যেই চিৎকার করতে যাব অমনি ঘরের টিউবলাইট জ্বলে উঠল।

'আমার মুখের ওপরে টর্চের আলো ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সত্যব্রত। ওর বাঁহাতে টর্চ আর ডানহাতে একটা ছোট রিভলভার। আমি তখন এত শক্‌ড যে, কোনও কথাই বলতে পারছিলাম না।

'সত্যব্রত হাসছিলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, "ভুল করে যেন চিৎকার-

pathagar.net

চিৎকার করবেন না, মিসেস সান্যাল। তা হলে ইজ্জতও যাবে, জানও যাবে।''

'সত্যব্রতর পেছনে আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজনকে আমি আগে দেখেছি—সিং—অজিত সিং। ওরা তিনজন লোভের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আমি কোনওরকমে জানতে চাইলাম, আমার মেয়ে টুপুর কোথায়, আমার হাজব্যান্ড কোথায়। সত্যব্রত ইশারা করে ঘরের একটা কোণের দিকে দেখালেন। আমি কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম সেদিকে। দেখি সেখানে মেঝেতে একটা চাদর পাতা। তার ওপরে অপরূপ ঘুমিয়ে আছে, আর তার পাশে টুপুর। বিছানা ছেড়ে ওরা ওখানে কী করে গেল কে জানে! যদি এই লোকগুলোই ওদের বিছানা থেকে ওখানে সরিয়ে থাকবে তা হলে ওরা জেগে উঠল না কেন? এ-কথা ভেবে আমি একটু অবাক হলাম। সত্যব্রত হয়তো অবাক ভাবটা খেয়াল করে থাকবেন, কারণ, সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ''কাল রাতে খাবারের সঙ্গে ড্রাগ মিশিয়ে দেওয়া ছিল। সিং-কে সেরকমই ইনস্ট্রাকশান দিয়েছিলাম আমি। আর আপনার হাজব্যান্ডকে একটু আগে ঘুমের ইনজেক্শান দেওয়া হয়েছে। হি উইল স্লিপ ফর আওয়ার্স টুগেদার। তা না হলে আমাদের কাজের সময় হাজব্যান্ডরা বড় ডিসটার্ব করতে চায়—য়ু নো?''

'আমার চোখে জল এসে গেল। বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঁপতে লাগল। এরকম অবস্থায় পড়লে কোনও মেয়ের মেন্টাল স্ট্রেস যে কীরকম হয় সে আপনি কখনও কল্পনা করতে পারবেন না, মিসেস দত্তগুপ্ত। সত্যব্রত সেন নামে ওই ডেন্জারাস ক্রিমিনালটার কথা মনে পড়লেই....ওয়েল, ইট গিভ্স মি দ্য শিভার্স...।'

রুমকি সান্যাল কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। বড় করে একটা শ্বাস ফেললেন।

প্রমিতা দম বন্ধ করে শুনছিল। ওর চোখ ছলছল করছিল। চাপা গলায় ও জিগ্যেস করল, 'তারপর?'

'হুঁ, বলছি। আপনাকে আমি ডিটেইলে বলছি....যাতে আপনি ইমপ্যাক্টটা বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন কী রুথলেস হরিব্ল একটা ঝড় আমার ওপব দিয়ে চলে গেছে।

'আমি নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারিনি—কাঁদতে শুরু করেছিলাম। তাতে সত্যব্রত যেন বেশ মজা পেলেন। টর্চটা নিভিয়ে আমার ওপরে অনেকটা ঝুঁকে পড়লেন। ওঁর মুখ থেকে হুইস্কি আর সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তখন মরিয়া হয়ে বললাম, ''আপনি একটা নামি কোম্পানির ফিন্যান্স ডিভিশানের ডেপুটি ম্যানেজার। কাম ব্যাক টু ইয়োর সেন্সেস। আমরা একটা হেল্পলেস ফ্যামিলি....। আপনি..।''

'সত্যব্রত হাসলেন, বললেন, ''আমরাও হেল্পলেস, ম্যাডাম। আর আমি 'রেপ

অ্যান্ড মার্ডার' কোম্পানির রেপ ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার। আবার মার্ডার ডিভিশনেও কাজ করি। যখন যেমন দরকার পড়ে আর কী! বুঝতেই পারছেন, উই আর অল হাংরি বয়েজ। তা ছাড়া, কেউ এখানে আপনাকে বাঁচাতে আসবে না—ভগবানও না। আমার সাজেশান হল, সিম্প য়ু ক্যানট রেজিস্ট দ্য রেপ, ইট্স বেটার য়ু এনজয় ইট। ও. কে., বেবি?''

'চেষ্টা করছিলাম, বিশ্বাস করুন....কিন্তু আমার কান্নাটা থামছিল না....গোঙানির মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। সেই অবস্থাতেই কোনওরকমে বললাম, ''আমার মেয়েকে...ওকে কিছু করবেন না, প্লিজ...।''

'সত্যব্রত হাসলেন—ডেভিলিশ স্মাইল। তখনই বুঝলাম, আমি ভুল লোকের কাছে সিমপ্যাথি এক্সপেক্ট করছি। আমার নাকের ডগায় রিভলভারের নলটা ছুঁইয়ে সত্যব্রত হেসে বললেন, ''প্রথমে মাদার, তার পরে একটু বিজ্ঞাপনের ব্রেক...তারপর সেকেন্ড পার্টে ডটার...টুপুর....।''

'আমি ''না-না'' করে চেঁচিয়ে উঠতেই সত্যব্রত ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে হিংস্রভাবে ''শ্-শ্-শ্'' করে উঠলেন। টর্চটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাঁহাতটা আমার গালে বুলিয়ে চাপা গলায় বললেন, ''নো উয়ারি, মাম। টুপুরকে আমরা একটু 'টাপুর-টুপুর বৃষ্টি পড়ে' করে ছেড়ে দেব। আই প্রমিস শি উইল লাইক ইট, হানি।''

'এরপর যা হওয়ার তাই হল। আমাকে ওরা ভয় দেখাল যে, গোলমাল করলে অপরূপ আর টুপুরকে ওরা ইনজেক্শান দিয়ে মেরে ফেলবে। সুতরাং সহ্য করলাম—সব সহ্য করলাম।' রুমকি মাথা নিচু করে ফেললেন। বোঝা যাচ্ছিল, কান্না চাপতে চাইছেন।

একটু পরে মুখ তুলে সরাসরি তাকালেন প্রমিতার দিকে। চোখের কোণ মুছে নিয়ে চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'আই এনডিয়োর্ড ইট অল। ইট ওয়াজ আ নাইটমেয়ার।'

পরমেশের বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। ও মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল রুমকির দিক থেকে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ঘরের সিলিংয়ের দিকে চোখ যেতেই সিলিং ফ্যানটা চোখে পড়ল। মনে পড়ে গেল সুদেব সামন্তর কথা। এবং সুচরিতার কথা।

প্রমিতার ভেজা চোখের কোল বেয়ে সরু জলের রেখা গড়িয়ে পড়ছিল। ও আর কান্না লুকোতে চাইছিল না। রুমকিকে দেখে ওর মনেই হয়নি ওঁর ভিতরে এত কষ্ট আছে।

রুমকির চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে ছিল। চোখের পাতা না ফেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন দেওয়ালে টাঙানো একটা ক্যালেন্ডারের দিকে। তারপর কয়েকবার চোখ পিটপিট করলেন, মনটাকে শাসন করে আবার বলতে শুরু করলেন, 'এর পরে যা হয়েছিল শর্টে বলছি। পরদিন দুপুরে আমার আর অপরূপের ঘুম ভেঙেছিল

pathagar.net

আগাছায় ভরা একটা মাঠের মধ্যে—মেটাল রোড থেকে অনেকটা ভেতরে। আমাদের দুজনের গায়ের এপাশে পড়েছিল টুপুর—আই মিন টুপুরের ডেডবডি। দেখে মনে হচ্ছিল, চারজন মানুষ নয়, জঙ্গলের হায়েনা কিংবা নেকড়ে ওকে দলবেঁধে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে। আমাদের গায়ের ড্রেসটুকু ছাড়া আর কিছু ছিল না। সুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ, ক্যামেরা, হাতের আংটি, মোবাইল ফোন, খুচরো টাকা—কিচ্ছু ছিল না। আমাদের আইডেন্টিফিকেশান প্রমাণ করতে পারি এমন কোনও কাগজও ছিল না। বুঝতেই পারছেন অবস্থা!

'আগের দিন রাতে সত্যব্রতর গ্যাং আমাকে টরচার করার পর হাই ডোজের স্লিপিং ড্রাগ ইনজেক্ট করে দিয়েছিল। অপরূপ আর টুপুরকেও বোধহয় এইরকম ইনজেক্শান দিয়েছিল। যে-লোকটা দিয়েছিল সে বোধহয় বুঝতে পারেনি টুপুর তার আগেই মারা গেছে। সেটা আমরা জানতে পেরেছিলাম টুপুরের পোস্ট মর্টেমের পর।

'সেসব দিনের কথা মনে করতে ভাল্লাগে না, মিসেস দত্তগুপ্ত। কিন্তু তাতে যদি আপনার নরম্যাল লাইফে ফেরার সুবিধে হয় তো আই ডোন্ট মাইন্ড। সেইজন্যেই মিস্টার দত্তগুপ্তের রিকোয়েস্টে আমি রাজি হয়েছিলাম।'

'ওই বদমাশগুলোকে পুলিশ ধরতে পারেনি?' প্রমিতা জিগ্যেস করল।

হাসলেন রুমকি সান্যাল। বললেন, 'ওরা পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। সত্যব্রতর কোম্পানির নামটা আমাদের মনে ছিল। খোঁজ করে দেখা গেল সে-নামে কোনও কোম্পানিই শিলিগুড়িতে নেই। তারপর সেই গেস্ট হাউসের খোঁজ করল পুলিশ। আমাদের সঙ্গে নিয়ে জিপে করে নানান রাস্তায় ঘুরল, বহু গেস্ট হাউস দেখাল। পুরো দু-দিন ধরে ট্রাই করার পর আমরা সেই গেস্ট হাউসটাকে লোকেট করতে পারলাম। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন? সেখানে আগের দেখা সেই সাইনবোর্ডটা নেই। আর অজিত সিংয়েরও কোনও হদিশ নেই। গেস্ট হাউসটা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। পুলিশ গেস্ট হাউসের মালিককে খুঁজে বের করেছিল। ভদ্রলোক কালিম্পঙে থাকেন। তিনি জানালেন, গত ছ'মাসে তিনি কাউকে ওটা ভাড়া দেননি। আর বাড়িটার কেয়ারটেকার তিনদিন ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল—সে এসব ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না।

'ব্যস, ডেড এন্ড। আমরা তো পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতায় খবর দিয়ে পুলিশ আমার দাদাকে শিলিগুড়িতে ডেকে এনেছিল। আমরা আরও দশদিন শিলিগুড়িতে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম।

'কোথায় জাস্টিস! কোথায় রিভেন্জ! সত্যব্রত সেন নামের ওই লোকটা রীতিমতো প্রফেশন্যাল। তার গ্যাং নিয়ে সে বেশ কয়েকবার এই সব নোংরা কাজ করেছে, কিন্তু পুলিশ তাকে কখনও ধরতে পারেনি। কখনও পারবে বলে মনেও

হয় না। তা হলে চিন্তা করুন! আমার সর্বস্ব খুইয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি—সুইসাইড করতে পারিনি। আমার হাজব্যান্ড আমাকে দু-হাতে ঘিরে প্রোটেক্ট করেছে—সবসময় বেঁচে থাকার জন্যে এনকারেজ করেছে। সো আই অ্যাম লিভিং.....ক্যারিয়িং অন উইথ মাই সুইট লাইফ।'

কথা শেষ করে চওড়া হাসলেন রুমকি। কিন্তু চোখের কোণের জল মুছলেন।

প্রমিতা দু-হাত জড়ো করে ওঁর কথা শুনছিল। অবাক হয়ে নতুন চোখে রুমকি সান্যালকে দেখছিল। ওঁর জায়গায় নিজেকে ভাবতে চেষ্টা করছিল। তখনই ওর শোকের ভাবনাগুলো গুলিয়ে যেতে চাইছিল।

হঠাৎই হাতব্যাগ খুলে একটা হলদে খাম বের করলেন রুমকি। খাম থেকে একটা ফটো বের করে প্রমিতার হাতে দিলেন : 'টুপুরের ফটো। এটা সবসময় আমার কাছে-কাছে থাকে।'

প্রমিতা ফটোটা নিয়ে চোখের সামনে ধরল। নয়ন মেলে দেখল।

টুপুর নয়—যেন হাসিখুশি এক পরির ফটো। কী সুন্দর চোখ! কী ভালো-লাগা চোখের দৃষ্টি! এত জীবন্ত যেন এক্ষুনি ফটো থেকে কথা বলে উঠবে।

এত রূপসী ফুটফুটে পুতুলের গায়ে কেউ কখনও আঁচড় কাটতে পারে! শিলিগুড়ির সেই রাতটার কথা কল্পনা করে শিউরে উঠল প্রমিতা। মনে-মনে চাইল, যদি অন্য জগৎ বলে কিছু থাকে—নিশ্চয়ই আছে—তা হলে সেখানে যেন টুপুরের সঙ্গে রিতুর দেখা হয়।

টুপুরের ফটোটা রুমকিকে ফেরত দেওয়ার পরেও বাচ্চা মেয়েটার ছবি প্রমিতার মনে ভেসে রইল।

রুমকি প্রমিতাকে বললেন, 'আমি সল্ট লেকে এ-ই ব্লকে থাকি। যদি কখনও আসেন ভালো লাগবে। আপনার হাজব্যান্ডের কাছে আমার অ্যাড্রেস আছে...।'

এর পরেও রুমকি কিছুক্ষণ বসলেন। ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন। বুবুর মিস চলে যাওয়ার পর বুবুর সঙ্গেও গল্প করলেন। তারপর চলে গেলেন।

পরমেশ রুমকিকে এগিয়ে দিল।

সদর দরজার বাইরে এসে পরমেশ নিচু গলায় ওঁকে বলল, 'প্রমিতাকে বাড়িতে যেতে বলার কী দরকার ছিল? যদি...।'

রুমকি ছোট্ট করে জবাব দিলেন, 'ওটা এমনি ভদ্রতা।'

pathagar.net

দশ

হাজতের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সুদেব সামন্তকে দেখছিল রাজতনু।

হাজতের ভিতরটা বাল্‌বের আলো আর ময়লা নোংরা দেওয়ালের পটভূমিতে ওকে কেমন যেন বেমানান লাগছে। ফরসা, ধারালো নাক-চোখ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুল—সব মিলিয়ে সুন্দর চেহারা। হাজতের দম-আটকানো চৌহদ্দিতে ছেলেটা যেন ভুল করে ঢুকে পড়েছে।

ছোট্ট হাজত-ঘরে আরও একটা ছেলে বসে ছিল। জুলজুলে চোখ, শ্যামলা রং, গালভাঙা চোয়াড়ে চেহারা। খালধারে মোমবাতি জ্বেলে চোলাই বেচছিল—গতকাল রাতে তুলে আনা হয়েছে।

ছেলেটার পরনে ময়লা চেক শার্ট আর পাজামা। উবু হয়ে দেওয়ালের এক কোণে বসে ঝিমোচ্ছিল। হাজতের লোহার দরজা খোলার শব্দ হতেই নড়েচড়ে বসেছে এবং রাজতনুকে দেখে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকেছে।

হাজতের দরজার তালা খুলে দিয়েছে কনস্টেবল সীতারাম। প্রায় পনেরো বছর চাকরির পর সীতারাম এখন পুরোদস্তুর পোড় খাওয়া পুলিশ। শক্তপোক্ত লম্বা কাঠামো। চুলে-গোঁফে পাক ধরেছে।

রাজতনুকে সীতারামের বেশ পছন্দ। পুলিশ লাইনে পছন্দসই ওপরওয়ালা পাওয়া শক্ত। তাই সীতারাম রাজতনুকে পেয়ে যেন আঁকড়ে ধরেছে। ওর হুকুম তামিল করার জন্য সবসময় মুখিয়ে থাকে।

রাজতনু সীতারামকে বলল, 'এই চোলাই মার্চেন্টকে পেছনের ঘরে নিয়ে যাও। আধঘণ্টা ডলাইমলাই করে রুটি বানাও—আচ্ছা করে পালিশ দাও। তারপর ও-ঘরেই টেবিলের নীচে শুইয়ে দিয়ে লটকে রাখো।'

'য্যায়সি আপকি মরজি, সাব।' বলে কপালে হাত ঠেকাল সীতারাম। রাজতনুকে পাশ কাটিয়ে হাজত-ঘরে ঢুকে পড়ল। দেওয়ালের গায়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে কঠোর গলায় ডাকল : 'আ যা, বাবুয়া।'

ছেলেটা সীতারামের নাগালের মধ্যে আসতে চাইছিল না। কারণ, গতকাল রাতে সীতারাম ওকে ডলাইমলাই করে রুটি নয়, একেবারে ঢাকাই পরোটা বানিয়ে ছেড়েছে।

কিন্তু সীতারামের অত ধৈর্য ছিল না। ও দু-পা এগিয়ে প্রচণ্ড এক থাবা বসিয়ে দিল ছেলেটার কাঁধে। তারপর এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে এল কাছে। নেংটি ইঁদুরের মতো ঘাড় টিপে ধরে অনায়াসে টানতে-টানতে নিয়ে গেল হাজতের বাইরে।

ছেলেটা 'ওরে বাবারে, মরে যাব!' বলে বারবার চেঁচাচ্ছিল। সীতারাম ওর ঘাড়ে এক রদ্দা কষিয়ে দিয়ে বলল, 'তকলিফ কাহে রে, বাবুয়া। ম্যায় হুঁ না!'

রাজতনু ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে সীতারামের চলে যাওয়া দেখল। সীতারাম রোজ তুলসীদাস পড়ে আর রামরাজত্বের স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নকে সত্যি করে তোলার জন্য পুলিশের চাকরিটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে।

সুদেব সামন্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ করছিল। ওকে দেখে মনে হল না, সীতারামের কাণ্ড দেখে এতটুকুও নাড়া খেয়েছে।

রাজতনু হাজত-ঘরে ঢোকামাত্রই সুদেব হেসে বলল, 'আসুন, স্যার—।'

রাজতনু অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগল। হয় ছেলেটা নির্দোষ, নয়তো ঘোর পাপী। একেবারে ডিজিটাল লজিক—মাঝামাঝি কোনও ব্যাপার নেই।

সুদেব স্টুডিয়োতে ফটো তোলার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর হাততিনেক পিছনেই দেওয়াল। রাজতনু ওর দিকে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সময় ও যে এক ইঞ্চিও পিছিয়ে যায়নি সেটা রাজতনু লক্ষ করল।

রাজতনুর পুলিশি দম্ভে আঁচড় পড়ল। ও পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। ডানহাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরা ফাইবারের রুল। এই ইম্পোর্টেড রুলের মজা হল, সহজে মারের ছাপ পড়তে চায় না। সেটাই রাজতনু এখন পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

রাজতনু পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল সুদেবের আরও কাছে।

সুদেব রাজতনুকে দেখে শুরুতে তোষামোদের হাসি হাসছিল। কিন্তু সেটা অল্প-অল্প করে মিলিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় রাজতনুর ভেতরের মতলবটা সুদেব এখন টের পেয়েছে।

সুদেবকে আজ সকালেই অ্যারেস্ট করেছে রাজতনু। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের সেকশান ৩৭৫ আর ৩০২—রেপ আর মার্ডার—দুটোই ঝুলিয়ে দিয়েছে ওর ঘাড়ে। কিন্তু রাজতনুর বুকের ভেতরে একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করছিল। কারণ, ও বুঝতে পারছিল, যত কায়দা করেই ও চার্জশিট তৈরি করুক না কেন, সুদেব সামন্ত হয়তো পিছলে বেরিয়ে যাবে। অথচ....।

না, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট রাজতনুকে নতুন কোনও দিশার সন্ধান দেয়নি। বরং ও জানতে পেরেছে, রেপটা যখন হয় তখন সুচরিতা মারা গেছে। না, তখন শুধু যে ওর হার্ট থেমে গিয়েছিল তা নয়, ব্রেন ফাংশানও থেমে গিয়েছিল। মানে, ব্রেনডেড। ক্লিনিক্যালি ডেড। আর তারপর সুদেব সামন্ত—বা অন্য কেউ—ওই নোংরা কাজটা করেছে। ব্যাপারটা মোটেই আর 'রেপ অ্যান্ড মার্ডার' থাকল না। হয়ে গেল 'মার্ডার অ্যান্ড রেপ'। ওঃ....!

রিপোর্টটা পড়তে-পড়তে গা গুলিয়ে উঠেছিল। ফুটফুটে ভাইঝিটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আবার। একটা জ্বালা রাজতনুকে ঝলসে দিয়েছিল।

ফোরেনসিক রিপোর্টও হাতে পেয়েছে রাজতনু। তাতে জানা গেছে, মার্ডারার

BanglaBook.org

নন-সিক্রেটর। সুতরাং প্রথম সর্বনাশ। সুচরিতার জামাকাপড় পরীক্ষা করে ঘাম বা থুতুজাতীয় বডি ফ্লুইড পাওয়া গেলেও খুনি নন-সিক্রেটর হওয়ায় ব্লাড গ্রুপের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া সিমেন স্পটের জন্যও ফোরেনসিক এক্সপার্টরা সুচরিতার গায়ের পোশাক আলট্রাভায়োলেট আলো ফেলে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছেন। না, কোনও সিমেন স্পট পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় সর্বনাশ।

আর যে-তথ্যটা রাজতনু চ্যাটার্জিকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে সেটা হল, সুচরিতার শরীরেও কোনও পুরুষ-চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফোরেনসিক এক্সপার্টদের ধারণা, খুনি কন্ডোম ব্যবহার করেছিল।

এটাই হল শেষ সর্বনাশ।

খুনি যে খুব চতুর এবং পোক্ত সেটা বুঝতে রাজতনুর আর অসুবিধে হয়নি। এবং এও বোঝা যাচ্ছিল, এ খুনি সহজে থামার নয়। এ খুনি আগেও হয়তো খুন করেছে, পরেও আবার খুন করবে। তারপর আবার....আবার....।

রাজতনু প্রথমে যা ভেবেছিল সেটা ভুল। এই সিরিয়াল কিলারের মার্ডার সিরিয়ালের প্রথম এপিসোড এটা নয়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, কত এপিসোডে গিয়ে শেষ হবে এই সিরিয়াল?

পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আর ফোরেনসিক রিপোর্টের পৃষ্ঠাগুলো যেন এক-এক করে থাপ্পড় কষিয়েছে রাজতনুর গালে। একটা-একটা করে আলো নিভে গেছে ওর চোখের সামনে। অথচ পরমেশ আর প্রমিতা প্রায়ই ওকে ফোন করছে। জানতে চাইছে, শেষ পর্যন্ত কিছু করা গেল কি না। সুদেব সামন্তকে অ্যারেস্ট করার কী হল!

ওদের কষ্ট বুঝতে পারছে রাজতনু। কিন্তু প্রমাণ?

ফোরেনসিক রিপোর্টে অবশ্য একটা তথ্য পাওয়া গেছে যেটা নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করা যায়। এই তথ্যটা অন্ধকার অকূল পাথারে বাতিঘরের আলোর মতন।

পরমেশ দত্তগুপ্তদের ফ্রিজের হাতলে অনেকগুলো আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দু-একটা ছাপ সুদেব সামন্তর ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করানোর জন্য সুদেবকে থানায় ডাকিয়ে এনে দশ আঙুলের ছাপ নিয়েছিল রাজতনু। এ ছাড়া পরমেশদের ছাপও নিয়েছিল। সেগুলো মিলিয়ে দেখে রিপোর্ট দিয়েছে ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট।

হাতলে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলোর মধ্যে সবগুলোই দত্তগুপ্ত ফ্যামিলির—একমাত্র সুদেবেরটা ছাড়া। এ ছাড়া আর কোনও অচেনা ছাপ নেই। খুনি যখন ফ্রিজ থেকে টমেটো সসের বোতল বের করেছিল, তখন...।

এর আগে সুদেবকে যতবারই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কখনও ও ফ্রিজ খোলার

কথা বলেনি। এটা রাজতনু তুরুপের তাস হিসেবে আস্তিনে লুকিয়ে রেখেছে। ঠিক সময়ে বের করে সুদেবকে চমকে দেবে।

ঝিনুকের ভেতরে বালির সূক্ষ্ম কণাকে ঘিরে ধীরে-ধীরে যেমন মুক্তো দানা বাঁধে ঠিক সেইরকমই সুদেবকে ঘিরে সন্দেহটা ক্রমে জমাট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, পরমেশ আর প্রমিতাই ঠিক। কারণ, রাজতনু তন্নতন্ন করে চুলচেরা তদন্ত করেছে। পরপর তিনটে রবিবার সন্ধের সময় পরমেশদের পাড়ায় সাদা পোশাকে পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা প্রায় দু-ঘণ্টা সময় কাটিয়েছে ওই এলাকায়। তাতে কোনও সন্দেহজনক লোকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। খালধারের দিকটাও বাদ দেয়নি রাজতনু। কিন্তু সেখানেও শূন্য জুটেছে কপালে।

পরেশনাথ মন্দিরের কাছে একজন পানের দোকানদার রাজতনুর দেখানো ফটো দেখে সুদেবকে চিনতে পেরেছে। সেই রবিবার সাড়ে ছ'টার একটু আগে সুদেব ওর দোকান থেকে গুটখার একটা প্যাকেট কিনেছিল। কিন্তু তাতে কী! সুদেব তো নিজেই বারবার বলছে, ও ওই সময়ে পরমেশ দত্তগুপ্তদের বাড়িতে ফ্যান লাগাতে ঢুকেছিল। সুতরাং, একমাত্র ওই ফ্রিজের হাতলের ব্যাপারটা ছাড়া কেসটায় আর কিচ্ছু নেই। শত চেষ্টা করলেও রাজতনু একটা ফাঁপা চার্জশিটের বেশি আর কিছু তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু তবুও...।

পুরোপুরি হতাশ হওয়ার আগে একটা শেষ চেষ্টা করতে চাইছে রাজতনু—যদি সুদেব সামন্তকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একটা কনফেশান আদায় করা যায়। মার এবং জেরার মুখে যদি কয়েক মুহূর্তের জন্যও লোকটা ভেঙে পড়ে। তারপর যা-হোক-কিছু চেষ্টা করে কায়দা করে চার্জশিট তৈরি করা যাবে। যদি অন্তত দশ-বারো বছরের জন্য লোকটাকে ভেতরে ঢোকানো যায় তা হলে শুধু যে সুচরিতা দত্তগুপ্তের খুনের সাজা দেওয়া যাবে তা নয়, আরও কয়েকটা খুন রুখে দেওয়া যাবে। সিরিয়ালটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে।

রাজতনু চ্যাটার্জি এসব কথা ভাবছিল, আর অপলকে তাকিয়ে ছিল সুদেবের দিকে। কাল ওকে কোর্টে তুলবে রাজতনু। তারপর জজসাহেবের কাছে অনুরোধ জানাবে যাতে ওকে অন্তত সাতদিন পুলিশ কাস্টডিতে রাখা যায়। তারপর...।

মনে মনে ভাইঝির মুখটা একবার ভেবে নিল রাজতনু। তারপর ক্ষিপ্তভাবে রুলের বাড়ি বসিয়ে দিল সুদেবের হাতে।

সুদেব 'এ কী করছেন, স্যার!' বলে হাত তুলে দ্বিতীয় আঘাতটা আটকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু রাজতনুকে তখন কালবৈশাখীতে পেয়েছে। ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে সুদেবের ওপরে।

এলোপাতাড়ি রুলের বাড়ি চলতে লাগল। সেইসঙ্গে মুখ-খারাপ।

সাধারণত রাজতনু নোংরা ভাষা ব্যবহার করে না—করতে চায় না। কিন্তু রোজ

pathagar.net

এত নোংরা ঘাঁটতে হয় যে, নিজেকেও খানিকটা নোংরা মাখতে হয়।

সুতরাং হাজত-ঘরের ভেতরে নোংরা ঝড় চলছিল। রুল, চড়, লাথি, ঘুসি—আর মুখ আগুনের ফুলকির মতো ছুটছিল।

সুদেব সামন্তর শরীরটা প্রথমে ঝুঁকে পড়েছিল। তারপর আরও ঝুঁকে পড়ে একেবারে মেঝেতে। কিন্তু একবারের জন্যও টু শব্দ বের করেনি মুখ থেকে। নিরীহ একতাল মাটির মতো চুপচাপ মার খেয়ে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর রাজতনু থামল। তখন ও হাপরের মতো ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। তাকিয়ে আছে পায়ের কাছে পড়ে থাকা সুদেব সামন্তর দিকে।

মিনিটপাঁচেক পর সুদেবের শরীরটা নড়ে উঠল। তারপর রাজতনুকে অবাক করে দিয়ে লোকটা ধীরে-ধীরে উঠে বসল।

হাজত-ঘরের বাল্‌বের আলো কড়া ছায়া ফেলেছে ঘরের মেঝেতে। সেই আলো-ছায়ায় মেঝের একটা আঁকাবাঁকা ফাটল সাপের মতো দেখাচ্ছে। এককোণের জোড়াতালি দেওয়া বাথরুম থেকে ভেসে আসা গন্ধটা হঠাৎই যেন আরও ঝাঁজালো হয়ে উঠল।

সুদেব উঠে বসতেই ওর মুখে সরাসরি আলো পড়ল। রাজতনু দেখল, ওর কপালের পাশটা ফুলে উঠেছে, গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অথচ ছেলেটার মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। সেই একইরকম শান্ত, সরল, চুপচাপ।

নিজের গালে হাত দিয়ে দেখল সুদেব। রক্ত-লাগা হাতটা চোখের সামনে একপলক ধরল। তারপর জামায় ঘষে হাতটা মুছে নিল।

কপালের ফোলা জায়গাটা বোধহয় ব্যথা করছিল। সেখানে আঙুল ছুঁইয়েই সরিয়ে নিল ও। তারপর রাজতনুকে অবাক করে দিয়ে মেঝেতে ভর দিয়ে একটু-একটু করে উঠে দাঁড়াল।

'আমাকে শুধু-শুধু এভাবে মারলেন, স্যার—' মিনমিন করে বলল সুদেব। শত যন্ত্রণার মধ্যেও একচিলতে হাসতে চেষ্টা করল।

আসলে সুদেব বেশ মজা পাচ্ছিল। রাজতনুকে এভাবে ধৈর্য হারাতে দেখে ও ভীষণ খুশি হয়েছে। কারণ, ও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, রাজতনুর হাতে ওর বিরুদ্ধে সলিড কোনও প্রমাণ নেই। তাই এই সাব-ইনস্পেকটারটা খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে গেছে।

সুদেবের সারা শরীরে যতই জ্বালা-যন্ত্রণা থাক, ভেতরে-ভেতরে ও খুশিতে টগবগ করছিল। এই পুলিশটার হাতে প্রমাণ যে নেই, তার প্রমাণ ও পেয়ে গেছে।

কোর্টরুমে বসে পুরোনো কথাগুলো ভাবছিল রাজতনু চ্যাটার্জি।

সেদিন রাতে ওরকম পশুর মতো পেটানোর পরেও সুদেবের কাছ থেকে কোনও

জরুরি কথা বের করা যায়নি। রাত প্রায় একটা পর্যন্ত বেপরোয়া চেষ্টা চালিয়েছিল রাজতনু। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সুদেব সেই পুরোনো 'গল্প'টারই ক্যাসেট বাজিয়েছে বারবার। একেবারের জন্যও ও রেগে যায়নি, বিরক্ত হয়নি।

লোকটাকে যেন ধীরে-ধীরে চিনতে পারছিল রাজতনু। সহজে বিচলিত হয় না—সাপের মতো ঠান্ডা—তবে ছোবলে বিষ আছে।

পরদিন কোর্টে তোলার আগে সুদেবকে ওষুধপত্র দিয়ে যতটা সম্ভব 'রিপেয়ার' করেছিল ও। কপালে লাল ওষুধ দিয়ে স্টিকিং প্লাস্টার লাগাতে হয়েছিল। রাজতনু মনে-মনে ভেবে রেখেছিল, বিচারপতি যদি সুদেবের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও খোঁচা দেওয়া প্রশ্ন তোলেন, তা হলে ও পরিষ্কার বলবে যে, হাজতে অন্য ক্রিমিনালের সঙ্গে সুদেব মারপিট করেছে—তাতেই ও চোট পেয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, সে-কথা রাজতনুকে আর বলতে হয়নি।

জজসাহেব প্রশ্নটা করতেই সুদেব হেসে বলেছে, 'আমি মনের দুঃখে গরাদে মাথা ঠুকেছি বলে এই হাল হয়েছে, হুজুর। থানায় আমাকে খুব যত্ন করে রাখা হয়েছে....সবাই খুব ভালো ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে, হুজুর।'

রাজতনু এ-কথায় বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল বিচারকেরও। কিন্তু সুদেব গদগদ মুখে গোরুর মতো সরল এবং কৃপাধন্য চোখে তাকিয়ে ছিল 'হুজুর'-এর মুখের দিকে।

রাজতনু চ্যাটার্জি অবাক হয়েছিল—তার সঙ্গে ভয়ও পেয়েছিল। সুদেব সামন্ত যে গভীর জলের খেলোয়াড় সেটা ধীরে-ধীরে বুঝতে পারছিল ও। এও বুঝতে পারছিল, এই লোককে বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না।

সুদেব সামন্তর অ্যারেস্ট হওয়ার খবর পেয়ে প্রমিতা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল। সুচরিতার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র আবেগে এলোমেলো প্রলাপ বকছিল। পরমেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে বেসামাল স্ত্রীকে দেখছিল। রিতু চলে যাওয়ার পর থেকে প্রমিতাকে ও কখনও এত খুশি হতে দেখেনি।

সুদেবকে কোর্টে তোলার প্রথম দিনে প্রমিতা আর পরমেশ সেখানে হাজির ছিল। ওদের প্রত্যাশা ভরা চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, আজই বোধহয় জজসাহেব তাঁর রায় শুনিয়ে দেবেন, আর সুদেব সামন্তর ফাঁসি হয়ে যাবে। তাই যখন পুলিশের তরফ থেকে সুদেবকে আরও দশদিন পুলিশ কাস্টডিতে রাখার আরজি পেশ করা হল, তখন পরমেশ আর প্রমিতার মুখের আলো নিভে গেল।

এরপর কোর্টে ডেটের পর ডেট পড়তে লাগল, আর বিচারের প্রতিটি মুহূর্ত মন-প্রাণ দিয়ে শুষে নিতে চাইল পরমেশ আর প্রমিতা।

সরকার পক্ষের উকিলের জেরায় সুদেব সেই একই গল্প শোনাল। হাতে হাত রেখে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে ও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর ভাবসাব এমন যেন তিলক

pathagar.net

কেটে কণ্ঠি পরিয়ে দিলেই ও পুরোপুরি বৈষ্ণব হয়ে যাবে।

সরকার পক্ষের উকিল যতই প্রশ্ন করছিলেন আর সুদেব সামন্ত এত মেপে তার উত্তর দিচ্ছিল যে, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কানাগলিতে পৌঁছে যাচ্ছিল—আর এগোনো যাচ্ছিল না।

তখন রাজতনু আস্তিনের তাস বের করল। সরকারি উকিলকে চাপা গলায় ফ্রিজের হাতলে পাওয়া আঙুলের ছাপের কথা বলল। খবরটা শুনে ভদ্রলোকের মনে ঢেউ উঠলেও তাঁর মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। তবে তিনি পরের প্রশ্নগুলো নতুন ধাঁচে শুরু করলেন।

'আপনি কি জানেন, সুচরিতা দত্তগুপ্তর মুখে বীভৎসভাবে টমেটো সস্ মাখানো ছিল?'

'আজ্ঞে না, হুজুর।'

'সসের বোতলটা ফ্রিজে ছিল। খুনি ওটা ফ্রিজ থেকে বের করেছিল—বুঝেছেন?'

'হতে পারে, স্যার।'

'তার জন্যে খুনিকে ফ্রিজের হাতল ধরতে হয়েছে।'

সুদেব কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু ওর মন দুরন্ত বেগে ছুটতে শুরু করেছিল। সেই রবিবারের সন্ধেটা ও মনে-মনে ঝালিয়ে নিচ্ছিল আবার। হ্যাঁ, টমেটো সসের বোতলটা ফ্রিজ থেকে ও বের করেছিল। হাতলটা অবশ্যই ধরেছিল মুঠো করে। তারপর....হ্যাঁ, মনে পড়েছে...প্রথমবার ফ্রিজের হাতলটা মুছেছিল। কিন্তু তারপর আবার ও জল খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলেছিল। তখন কি হাতলটা আবার মুছেছিল? নাকি তাড়াহুড়োতে আর মোছা হয়নি?

সরকারি উকিল সুদেব সামন্তকে প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার সামন্ত, ভালো করে মনে করে দেখুন তো, ফ্রিজের হাতলে আপনি হাত দিয়েছিলেন কি না?'

সুদেব কয়েক লহমা চুপ করে রইল—কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু ওর মন দ্রুত যুক্তি সাজাচ্ছিল, খতিয়ে দেখছিল, বুঝতে চাইছিল ঠিক কী উত্তর দিলে জাল কেটে বেরোনো যাবে। ওরা কি ফ্রিজের হাতলে সুদেবের আঙুলের ছাপ পেয়েছে?

সুদেব মনস্থির করে ফেলল। শান্তভাবে জবাব দিল, 'ভালো করে মনে করে দেখার দরকার নেই, স্যার—স্পষ্ট মনে আছে। আমি দিদিমণির কাছে একগ্লাস জল চেয়েছিলাম। তো তিনি বললেন...।'

'কে দিদিমণি?' ওকে থামিয়ে দিয়ে উকিল জানতে চাইলেন।

'দিদিমণি মানে—সুচরিতা দত্তগুপ্ত।'

'হ্যাঁ। তারপর?'

'তো দিদিমণি বললেন, ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে জল খেতে। তাই বোতল

বের করে জল খেয়েছি।'

'সুচরিতা তখন কী করছিল?'

কী করছিল? কী করছিল? এখন কী উত্তর দেবে সুদেব?

'দিদিমণি শোওয়ার ঘরের ফ্যানটা চালিয়ে টেস্ট করছিল।'

জুতসই উত্তরটা দিতে পেরে সুদেব যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সত্যিই সুচরিতা ফ্যানটা একবার চালিয়ে দেখেছিল। ফ্যানের সুইচে ওর আঙুলের ছাপ অবশ্যই পাওয়া যাবে—হয়তো পাওয়া গেছে।

'ফ্রিজের হাতলে আপনার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

উকিলের এই মন্তব্যের কোনও জবাব দিল না সুদেব। ও ঠিক করেই নিয়েছে, ওকে সরাসরি প্রশ্ন করা না হলে ও কোনও উত্তরই দেবে না। বাড়তি কথা বলার অনেক বিপদ।

সরকারি উকিল নিজের ফাইল থেকে কাগজপত্র হাতড়ে একটা টাইপ করা পৃষ্ঠা বের করে জজসাহেবকে দেখালেন : 'মি লর্ড, ফ্রিজের হাতলে আসামির আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। এই যে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের রিপোর্ট।'

রিপোর্টটা পেশকারের কাছে জমা দিলেন তিনি।

ফ্রিজের জলের বোতলগুলোর গায়ে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। কারণ, বোতলগুলো বাইরে বের করতেই সেগুলোর গায়ে সূক্ষ্ম জলের ফোঁটা জমে গেছে। কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকলেও সেগুলো উদ্ধার করা যায়নি।

কিন্তু জলের লেভেল? সুদেব সামন্ত সত্যি-সত্যি ফ্রিজের বোতল থেকে জল খেয়ে থাকলে সেই বোতলের জলের লেভেল কমবে।

ফ্রিজে তিনটে বোতল ছিল। কিন্তু বোতলগুলোর জলের লেভেল মাপেনি রাজতনু। তবে এটুকু মনে আছে, দুটো বোতলে জলের লেভেল গলা থেকে অনেকটা কম ছিল। যদি তিনটে বোতলই পুরোপুরি ভরতি থাকত তা হলে মাপজোখ করে বোঝা যেত সুদেব কোনও বোতল থেকে সত্যি-সত্যি জল খেয়েছিল কি না। তাতে হয়তো সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সটা জোরদার হত।

কিন্তু লেভেল তো মাপা হয়নি! অবশ্য মেপে কোনও লাভও হত না। কারণ, বোতলগুলোর জলের লেভেল আগে কী ছিল সেটা পরমেশরা ঠিকঠাক বলতে পারেনি।

রাজতনুর মনে-মনে আপশোস হচ্ছিল। আবার এ-কথাও ভাবছিল, শুধুমাত্র জলের লেভেল দিয়ে জোরালো কেস দাঁড় করানো যেত কি?

কোর্টরুমে বসে-বসে যতই সওয়াল-জবাব শুনছিল ততই ভরসা কমছিল রাজতনুর। বুঝতে পারছিল, চার্জটা ঠিকমতো দাঁড়াচ্ছে না।

সরকারি উকিল বোতলের জলের লেভেল নিয়ে কিছুক্ষণ সুদেবকে রগড়ালেন।

pathagar.net

কিন্তু সুদেব শান্তভাবে মোলায়েম উত্তর দিয়ে দিব্যি পাশ কাটিয়ে গেল।

না, কোন বোতল থেকে জল খেয়েছিল ওর মনে নেই।

ফ্রিজে কটা জলের বোতল ছিল সেটাও মনে পড়ছে না।

আর জল খাওয়ার সময় জলের লেভেল মুখস্থ করে কেউ কি জল খায়? যদি সুদেব জানত যে, জল খাওয়া নিয়ে পরে এত ক্যাচাল হবে, তা হলে ও জলই খেত না।

সুদেব সামন্তের উত্তরে কোর্টরুমে বসা অনেকে হেসে উঠলেও সুদেব একফোঁটাও হাসেনি। বোকা-বোকা নির্লিপ্ত মুখে গোবেচারা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

রাজতনু চ্যাটার্জির মনে হচ্ছিল, ও যেন একটা পাঁকাল মাছ শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছিল, আর সেটা একটু-একটু করে পিছলে মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত তাই হল।

কয়েক মাস ধরে হিয়ারিং চলার পর রায় বেরোল। বিচারক সুদেব সামন্তকে শুধু যে সসম্মানে মুক্তি দিলেন তাই নয়, দুর্বল চার্জশিটের জন্য, আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য এবং নির্দোষ একজন নাগরিককে অযথা হেনস্থা করার জন্য পুলিশকে ভর্ৎসনাও করলেন।

সুদেবকে লক্ষ করে জজসাহেবের শেষ কথাগুলো পরমেশ আর প্রমিতাকে নিষ্ঠুরভাবে চুরমার করে দিল : '...আপনাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হল এবং এই কেস থেকে খালাস দেওয়া হল।'

কোর্টরুমের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়ল প্রমিতা। হিস্টিরিয়ার রুগির মতো সুদেবকে লক্ষ করে হাত-পা ছুড়তে লাগল, 'রিতু! রিতু!' বলে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, আর গালিগালাজ শাপশাপান্ত করতে লাগল সুদেবকে।

পরমেশও ভেতরে-ভেতরে পাগল হয়ে গিয়েছিল। চোখে জল আর বুকে জ্বালা নিয়ে ও প্রাণপণ চেষ্টায় প্রমিতাকে জাপটে ধরে সামাল দিচ্ছিল। ও বুঝতে পারছিল, যে-সুবিচারের জন্য ওরা এতদিন ধরে আশায়-আশায় বুক বেঁধে ছিল, সেই ভরসাটা পায়ের নীচ থেকে সরে যাওয়ায় ওরা বেসামাল হয়ে পড়েছে। বারবার মনে হচ্ছে, সব শেষ। যেন কয়েক মাস ধরে কঠিন অসুখে ভোগার পর রিতু আজ এই মুহূর্তে মারা গেল।

ও তাকাল রাজতনুর দিকে। দেখল, সামনের বেঞ্চে হাতের ওপরে মাথার ভর রেখে মুখ নিচু করে বসে আছে রাজতনু। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ও হেরে গেছে।

একটু পরেই দুজন কনস্টেবল আর একজন পুলিশ অফিসার সুদেব সামন্তকে নিয়ে কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে উদভ্রান্ত প্রমিতা কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে গেল কোর্টরুমের বাইরে। ওকে সামাল দিতে পরমেশও তাড়াহুড়ো করে ওর পিছু নিল।

কোর্টরুমের বাইরে নানান মানুষের জটলা। তার মধ্যে কালো পোশাক পরা দু-চারজন উকিলও আছেন। লোকজন ব্যস্তভাবে হাঁটা-চলা করছে। একটু দূরে তিনজন টাইপিস্ট সার বেঁধে বসে কীসব কাগজপত্র টাইপ করছে। সামনের খোলা চাতালে দুপুরের রোদ।

কোর্টরুমের বাইরে এসেই প্রমিতা সুদেবকে দেখতে পেল। শান্তভাবে স্বাধীন নাগরিকের দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে আসছে।

প্রমিতা পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'খুনি! আমার মেয়েকে খুন করেছে! ওকে ফাঁসি দাও! ওকে ফাঁসি দাও!'

ও তীব্র আবেগের তাড়নায় ছুটে যেতে চাইল এগিয়ে আসা সুদেবের দিকে। কিন্তু পরমেশ ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই ওকে দু-হাতে জাপটে ধরল। স্বামীর হাতের বাঁধন ছাড়ানোর চেষ্টা করতে-করতে প্রমিতা ভাঙা গলায় চিৎকার করছিল। চারপাশের লোকজন অবাক চোখে প্রমিতাকে দেখছিল।

শোকে ছিন্নভিন্ন পরমেশ আর প্রমিতার সামনে দিয়ে গটগট করে হেঁটে যাওয়ার সময় সুদেব ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপর একচিলতে হেসে চোখ মারল।

সেই মুহূর্তে ওরা বুঝতে পারল, ওদের হিসেবে কোনও ভুল ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে ওদের শরীর হতাশায় অবশ হয়ে গেল। প্রমিতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ওর শরীরের ভারে আচমকা কুঁজো হয়ে গেল পরমেশ। একটা ভয়ঙ্কর কষ্ট বর্শার ফলার মতো বিঁধে গেল ওর বুকে। রিতু মারা যাওয়ার পর যে-কষ্ট ও পেয়েছিল, এই কষ্টটা তার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র, অনেক বেশি ধারালো।

বিবেকানন্দ রোডের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সুদেব—রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট আর মানিকতলার মোড়ের মাঝামাঝি জায়গায়।

চওড়া রাস্তাটার দু-ধারে দোকানপাট। একদিকের ফুটপাতে বাজার বসেছে। আর অন্যদিকের ফুটপাতে ছাউনি দেওয়া জামাকাপড়ের দোকান। একটা জামাকাপড়ের দোকানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে ফুটপাতের ব্যস্ত লোকজনকে দেখছিল সুদেব। আসলে ঠিক লোকজন নয়, ও মেয়ে দেখছিল।

সন্ধেবেলা বাজারের থলে হাতে বেরিয়েছিল সুদেব। টুকিটাকি বাজার সেরে ও হালকা মনে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখের খিদে মেটাতে শুরু করেছে।

pathagar.net

ঘড়ির কাঁটা সাতটা ছুঁই-ছুঁই হলেও অফিস ছুটির ভিড় এখনও পুরোপুরি কমেনি। তারই সঙ্গে বাজার করার ভিড়। ফুটপাতের যেটুকু জায়গা খালি পড়ে আছে সেই

সরু পথ ধরে লোকজন কোনওরকমে যাতায়াত করছে। কখনও-কখনও বাজার করার জন্য উবু হয়ে বসা লোকের গায়ে পা লেগে যাচ্ছে, কিন্তু সে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

সপ্তাহে তিনদিন বাজার করতে বেরোয় সুদেব। বাজার করা হয়ে গেলে তারপর এইভাবে একটু বিশ্রাম নেয়। চোখ দিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে দ্যাখে। আর সেইসঙ্গে কল্পনার উড়ান শুরু হয়ে যায়।

হঠাৎই একটি মেয়েকে সুদেবের নজরে ধরল।

মেয়ে, নাকি মহিলা বলবে সুদেব? কারণ, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। বয়েস বেশি নয়—ছাব্বিশ কি সাতাশ। সিঁদুর লাগানোর ধরন দেখে মনে হয় নতুন বিয়ে হয়েছে।

মেয়েটার চেহারা ছোটখাটো, ফরসা। গোলপানা মুখ। চোখে রিমলেস চশমা। বাদামি আর কালো চুড়িদারে বেশ মানিয়েছে। হাতে একটা বড় মাপের সাইডব্যাগ। হাবভাব দেখে মনে হয় টুকিটাকি কিছু কিনতে বেরিয়েছে।

সুদেব হাসল মনে-মনে। ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। কোনও মেয়ের সাজপোশাক আর হাবভাব দেখে ও মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে মেয়েটা কাছাকাছি এলাকার কি না। আসলে কাছাকাছি এলাকার—মানে, লোকাল মেয়ে হলে তাদের চালচলনে কেমন যেন একটা আটপৌরে ভাব থাকে, নিশ্চিন্ত ঢং থাকে।

এই মেয়েটাকে দেখে ওর সেরকমই মনে হল। হয়তো লালাবাগান কি গড়পারে থাকে। গত দু-বছরে এসব এলাকায় বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাটবাড়ি গজিয়ে উঠেছে। হয়তো তারই একটা পায়রার খোপে এই পায়রাটা জোড় বেঁধেছে।

মেয়েটাকে আপাদমস্তক জরিপ করতে-করতে সুদেবের ভেতরটা হঠাৎই পালটাতে শুরু করেছিল। একটা দুরন্ত চাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছিল ওর ভেতরে। কোনও কিছু না ভেবেই ও মেয়েটার পিছু নিল।

অবশ্য ব্যাপারটাকে 'পিছু' নেওয়া ঠিক বলা যাবে না। কারণ, মেয়েটা ওদিকের ফুটপাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আর সুদেব এ-ফুটপাতে। এভাবে 'পিছু' নেওয়াটা বেশ নিরাপদ—চট করে কেউ বুঝতে পারে না।

মেয়েটাকে জরিপ করতে-করতে সুদেব ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমান্তরালে এগোচ্ছিল আর স্বপ্ন দেখছিল।

মনে-মনে মেয়েটার চশমা খুলে নিল সুদেব। ওর সাইডব্যাগটা কাঁধ থেকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে রাখল। তারপর কামিজের হুকে হাত দিল। হুকগুলো...।

সুদেবের কান ভোঁ-ভোঁ করে উঠল। শরীরের ভেতরে লক্ষ-লক্ষ রক্তকণিকার ঝাপট ওকে পাগল করে তুলল। জর্জরকাম বুড়ো ভামের মতো ও মেয়েটার সঙ্গে-

সঙ্গে চলতে লাগল। ওর মনে হল, এই মুহূর্তে মেয়েটার বাড়ি চিনে নেওয়ার চেয়ে জরুরি কাজ আর নেই।

রাস্তা দিয়ে অটো, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি ছুটে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ আর হর্নের শব্দ। ব্যস্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকজন।

সুদেবের হঠাৎই হাসি পেয়ে গেল। ওর মনটাও ব্যস্ত পায়ে ছুটছে, শরীরটা গাড়ির ইঞ্জিনের মতো গোঁ-গোঁ করছে, হর্ন দিচ্ছে—ধৈর্যে আর কুলোচ্ছে না।

মেয়েটা ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামল। একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই চলার গতি বাড়িয়ে দিল। হয়তো বাড়িতে কারও আসার সময় হয়ে গেছে। নাকি ওর বাথরুম পেয়ে গেছে?

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সুদেব। মনে-মনে এক-দুই গুনে টেনশান কমাতে চাইল। কারও ওপর মন লেগে গেলে কেন যে ওর এত টেনশান হয় কে জানে!

সুচরিতা দত্তগুপ্তর কথা মনে পড়ে গেল। ওঃ, শেষ পর্যন্ত ঝামেলাটা মিটেছে। মিটবে সুদেব জানত, কিন্তু তার জন্য অনেক কষ্ট সইতে হল। ওই হারামির বাচ্চাটা—ওই পুলিশের লোকটা—সুদেবকে কম টরচার করেছে! সারা গায়ে কালশিটের দাগ, অসহ্য যন্ত্রণা—তবুও সুদেব মুখে মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। কারণ, ও জানত শেষ পর্যন্ত কে জিতবে। এবং সে-ই জিতেছে।

আবারও জিতবে সুদেব। মানিকতলা থানার ওই পুলিশের বাচ্চাটাকে ও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। সুদেবের সঙ্গে বুদ্ধির মোকাবিলা! এত সহজ!

মেয়েটা বাঁ-দিকের রাস্তায় বাঁক নিল। এই রাস্তাটা সুদেবের দোকানের কাছাকাছি দিয়ে সোজা চলে গেছে দেশবন্ধু পার্কের দিকে।

সুদেব হঠাৎই একটু দমে গেল। মেয়েটা ওর পাড়াতেই থাকে নাকি?

উহুঁ, বোধহয় না। থাকলে—মেয়েটার যা জিনিসপত্তর—অনেক আগেই ও সুদেবের নজরে পড়ত।

শেষ-হয়ে-যাওয়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলন্ত অটো আর বাসের মাঝখান দিয়ে কার্নিক মেরে একরকম দৌড়েই রাস্তা পার হল সুদেব। তারপর মেয়েটার দিকে চোখ ফেরাতেই ওকে আর খুঁজে পেল না।

কোথায় গেল? সুদেবের শিকারি চোখ হন্যে হয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগল। কোথায়? কোথায়?

হঠাৎই ওকে আবার দেখতে পেল। ওই তো! একটা চাইনিজের স্টল ওকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আড়াল করে দিয়েছিল।

pathagar.net

স্বস্তির শ্বাস ফেলল সুদেব। গভীর মনোযোগে মেয়েটাকে ফলো করতে লাগল।

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরে বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পর একটা নতুন

ফ্ল্যাটবাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। চারতলা ফ্ল্যাটবাড়িটার পাশেই একটা ফুটপাত-বাগান। তার সামনে আবর্জনা ফেলার ভ্যাট। সেখানে আবর্জনার স্তূপ ঘিরে দুটো নেড়ি কুকুর ছোঁকছোঁক করছে।

মেয়েটা [illegible] বরাবর চোখ মেলে দিল। বোধহয় কাউকে খুঁজল। তারপর ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

সুদেব আর দেরি করল না। চটপট পা ফেলে বাড়িটার কাছে চলে এল। জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চিরকুট বের করে নিল। সেটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

বাড়িটায় সিকিউরিটি গার্ডের কোনও ব্যবস্থা নেই। নইলে ঢোকার মুখেই একরাশ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি পড়তে হত। সুতরাং বেশ নিশ্চিন্ত মনেই সিঁড়িতে পা রাখল ও। শুনতে পেল দোতলার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—ওপরে উঠে যাচ্ছে।

একহাতে বাজারের থলে আর অন্যহাতে চিরকুট নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে শুরু করল সুদেব। সিঁড়ির বাঁক ঘুরেই ও মেয়েটাকে দেখতে পেল। পিছন থেকে বেশ দেখাচ্ছে। সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' কবিতাটার কথা মনে পড়ে গেল।

পিছনে পায়ের শব্দ পেয়েই থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। ঘুরে তাকাল।

সঙ্গে-সঙ্গে সুদেব নরম মোলায়েম গলায় বলে উঠল, 'দিদি, একটু হেল্প করবেন?'

সিঁড়িতে টিউবলাইট জ্বলছিল। সুদেবের মুখে সাদা আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। ওকে সরল সাদাসিধে দেখাচ্ছিল। ভেতরের লালা-ঝরানো হিংস্র পশুটাকে একটুও আঁচ করা যাচ্ছিল না।

মেয়েটা সুদেবের কাছ থেকে অন্তত পাঁচ-ছ' ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে। সুদেবের প্রশ্নে ওর ভুরু কুঁচকে গেল। প্রশ্নের চোখে তাকাল।

সুদেব বলল, 'বাবুদা নামে একজন এ-বাড়িতে থাকেন। রেলে চাকরি করেন।' হাতে-ধরা চিরকুটের দিকে একবার তাকিয়ে সুদেব আবার চোখ তুলল : 'আমাকে শুধু এটুকুই লিখে দিয়েছেন। আসলে আমি ইলেকট্রিকের কাজ করি। ওনার সুইচবোর্ডে একটা এক্সট্রা সুইচ বসাতে হবে, তাই...।'

দু-এক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা নাড়ল মেয়েটা, বলল, 'উঁহু, সেরকম কাউকে তো মনে করতে পারছি না। তবে...চারতলার দু-নম্বর ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বোধহয় রেলে কাজ করেন। ওঁকে একবার জিগ্যেস করে দেখুন—।' ফিরে রওনা হতে গিয়েও মেয়েটা থমকে দাঁড়াল, বলল, 'ভালো নাম কিছু লিখেছে?'

'না, দিদি। শুধু বাবুদা।'

'নাঃ, বলতে পারছি না।'

মেয়েটা রওনা হতেই সুদেব ওর পিছু-পিছু উঠতে লাগল। আর আপনমনে

বকবক করতে লাগল, 'এখন খুঁজে না পেলে পুরো সন্ধেটা বেকার যাবে। বারবার বললাম যে, ফোন নাম্বারটা দিন...এখন বোঝো!'

সুদেব মুখে যা-ই বলুক, ওর মন পড়ে ছিল অন্যদিকে। ও মেয়েটার ফ্ল্যাটটা চিনে নিতে চাইছিল। কারণ, প্রথম কাজ শিকারের আস্তানা চিনে নেওয়া। তারপর শুধু ওত পেতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা। সুদেব জানে, একদিন-না-একদিন সুযোগ আসবেই।

ভাগ্যিস, কাল্পনিক বাবুদার খোঁজে ওকে চারতলা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে মেয়েটা। তা না হলে ওকে অন্য কোনও ছল-ছুতোয় মেয়েটার ফ্ল্যাটটা চিনে যেতে হত।

বাড়িটার প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। সুদেব সতর্ক চোখে ফ্ল্যাটের দরজাগুলো জরিপ করছিল, দরজায় লেখা নামগুলো পড়ছিল। আর সামনে সিঁড়ি-উঠে-চলা রমণীকে দেখছিল।

তিনতলায় বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়াল মেয়েটা। ব্যাগ থেকে চাবি বের করে নাইটল্যাচ খুলতে লাগল। সুদেব ওকে পাশ কাটিয়ে ওঠার সময় ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ পেল—তার সঙ্গে ঘামের গন্ধ মেশানো। জোরে শ্বাস টানল সুদেব। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। আড়চোখে দরজায় লাগানো নেমপ্লেটটাও দেখে নিল : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়/শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু দুজন—এখনও তিনজন বোধহয় হয়নি।

চারতলার সিঁড়ির দিকে উঠতে গিয়েও ও থমকে দাঁড়াল। মেয়েটাকে—মানে, শুক্লাকে—লক্ষ করে বলল, 'ইলেকট্রিকের কাজ-টাজ থাকলে দেবেন, দিদি। আমি লালাবাগানের কাছেই থাকি। আপনারা কাজ না দিলে পেট চলবে কী করে?' ওর পেটেন্ট সরল হাসি হাসল সুদেব : 'মাঝে-মাঝে আমি এসে একটু বিরক্ত করব, কাজের খোঁজ-টোজ করে যাব। সামনের চায়ের দোকানের রঘুদা আমাকে চেনে—।'

শুক্লা সুদেবের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর ঘাড় নাড়ল। ইলেকট্রিক মিস্তিরি যে এত সুন্দর দেখতে হয় ওর জানা ছিল না।

শুক্লা দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল। দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরটা একঝলক দেখা গেল। সুদেবের শিকারি চোখ পলকে দৃশ্যটা চেটে নিল। নাঃ, ভেতরে কাউকে নজরে পড়ল না।

ফ্ল্যাটের দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘোর কেটে গিয়ে সুদেব চমকে উঠল। ও চারতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

সিঁড়ির ভাঁজের চাতালে পৌঁছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সুদেব। যেন বাবুদার খোঁজে সময় লাগছে। তারপর ধীরে-ধীরে আবার সিঁড়ি নামতে লাগল।

pathagar.net

সুদেবের হাসি পেয়ে গেল। বাবুদা, রঘুদা—যে-নাম মনে এসেছে বলে গেছে। তার সঙ্গে রেলের চাকরি আর চায়ের দোকান। চমৎকার! নিজের অভিনয়ের তারিফ করল সুদেব। শুক্লার কাছে ওকে ফিরে আসতেই হবে। খুব শিগগির।

উৎফুল্ল মনে বাইরের রাস্তায় পা দিল। থমকে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। এখন কয়েকদিন ও শুধু শুক্লাকে নিয়ে ভাববে। আপনমনে মাথা নেড়ে ও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরে হাঁটা দিল। সন্ধের বাতাস ওর কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। আমেজে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

সুদেব খেয়াল করেনি, একজন মহিলা ওকে অনুসরণ করছিল। ঠান্ডা চোখ, পাথরের মতো মুখ। সুদেবকে অনুসরণ করাই যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং মোক্ষ।

মহিলাটির মেয়ে কয়েকমাস আগে সুদেবের হাতে খুন হয়েছে। মেয়েটির নাম ছিল সুচরিতা।

এগারো

ক্লাস নিয়ে নিজের ঘরে ফেরার পর পরমেশের ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। চেয়ারে বসে হাতলে দু-হাত ছড়িয়ে মাথাটা হেলিয়ে দিল পিছনে। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল সিলিংয়ের লোহার বিমের দিকে।

একটু পরেই ও সুচরিতাকে সেখানে দেখতে পেল।

যন্ত্রণায় চোখ বুজে ফেলল পরমেশ। জজসাহেবের অসহ্য কথাটা আবার বেজে উঠল কানে : '...নির্দোষ সাব্যস্ত করা হল এবং এই কেস থেকে খালাস দেওয়া হল।'

আজ ভালো করে ক্লাস নিতে পারেনি। ক্লাসের সুর, তাল, লয়—সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারছিল ওরা কেউ-কেউ 'বেসুরো' ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে। কেমন যেন অবাক বিহ্বল চোখে পরমেশকে দেখছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরমেশ। ওরা অবাক হতেই পারে। ওরা তো আর পরমেশের ভেতরের গল্পটা জানে না! রিতু বাড়িতে একবার খুন হয়েছে। আর-একবার খুন হয়েছে আদালতে। অথচ প্রত্যেকে যে-যার মতো করে সুবিচারের চেষ্টা করে গেছে। সাব-ইনস্পেকটার রাজতনু চ্যাটার্জি, সরকারি উকিল—প্রত্যেকে।

এমন সময় সুচরিতা বলে উঠল : 'কিছু একটা করো, বাপি। ভী-ষণ কষ্ট হচ্ছে। প্লিজ, বাপি, কিছু তো একটা করো...।'

পরমেশ টের পেল ওর ডান গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় ওর মুখ কুঁচকে গেল।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'স্যার, আসব?'

ঝটিতি চশমা সরিয়ে চোখ মুছে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল পরমেশ। তাড়াতাড়ি করে বলতে গেল, 'এসো, এসো—,' কিন্তু গলাটা কেমন যেন ভেঙে গেল। ও গলাখাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে আবার বলল, 'এসো, এসো—।'

পরমেশের ঘরের দরজায় সুইংডোর লাগানো—পুরোনো আমলের সেলুনের মতো। তারই একটা পাল্লা খুলে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ত্রিযামা, আর তার পিছনে পল্লব। ওরা বি. টেক. ফাইনাল ইয়ারে পড়ে। পরমেশের কাছে ফাইনাল ইয়ারের প্রজেক্ট করছে।

ত্রিযামা আর পল্লব ঘরের ভেতরে খানিকটা ঢুকে এলেও ওদের মুখের অস্বস্তির ভাবটা যায়নি। ওরা স্যারকে দেখছিল।

পরমেশ যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। ও কখনও চায়নি ওর নিজস্ব দুঃখের কথা পাঁচকান হোক— ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারুক। আচ্ছা, ওরা কি দেখতে

pathagar.net

পেয়েছে পরমেশ কাঁদছিল? নাকি চশমার জন্য সেটা বুঝতে পারেনি, কিংবা পরমেশ তার আগেই চোখের জল মুছে নিয়েছে?

পরমেশ সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'কী হল, বোসো—।'

কিন্তু-কিন্তু করে ত্রিযামা বসল। পল্লবের দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে ইশারা করে ওকে বসতে বলল।

পল্লব বসার পর খানিকটা সময় নিয়ে ত্রিযামা বলল, 'স্যার, এখন কি আপনি একটু ফ্রি আছেন?'

'কেন বলো তো?'

'না, মানে, আপনি ফ্রি থাকলে প্রজেক্টটা নিয়ে একটু ডিসকাস করতাম...।'

পরমেশ হেসে বলল, 'প্রজেক্টে প্রবলেম হলে ডিসকাস তো করবেই। বলো, কোথায় প্রবলেম?'

পরমেশ মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। মনটা হালকা করার জন্য এসময়ে পল্লব আর ত্রিযামার চলে আসাটা খুব জরুরি ছিল। ভগবান ঠিক সময়ে ওদের পাঠিয়েছেন।

অথচ আশ্চর্য। কোর্টের রায় শোনার পর বেশ কিছুদিন ধরে পরমেশের মনে হয়েছিল ভগবান বলে কিছু নেই। আর এখন মনে হচ্ছে আছে।

আসলে ভগবানকে আমরা না পারি রাখতে, না পারি ছাড়তে। কখনও মনে হয়, ভগবান মানুষ তৈরি করেছেন, আবার কখনও মনে হয় ভগবান নিজেই মানুষের তৈরি।

এসব ভেবে পরমেশের অস্থির মন মাথা খুঁড়ছিল। ও ত্রিযামাকে দেখছিল। ফরসা ফুটফুটে গোল মুখ, লম্বায় খাটো, বয়কাট চুল, চোখ দুটো ছটফটে, পড়াশোনায় তুখোড়।

ত্রিযামার গলায় একটা ফিনফিনে চেন, কানে রুপোলি টপ—ঠিক যেন চিকচিকে দুটো মসুর ডালের দানা।

ত্রিযামার গায়ে হলুদ রঙের ফুলহাতা শার্ট আর পায়ে গাঢ় মেরুন প্যান্ট। বাঁহাতে ঘড়ির পাশে একটা ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড বাঁধা। ক' দিন ধরে ওর কবজিতে এই ব্যান্ডটা লক্ষ করছে পরমেশ।

পল্লব ইতিমধ্যে ব্যাগ থেকে খাতা বের করে ফেলেছে। পল্লবের হাত থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাতা ওলটাতে লাগল ত্রিযামা। খাতার দিকে নজর রেখেই বলল, 'পরশুদিন স্যার যে সার্কিটটা আপনি বললেন, সেটা ঠিকঠাক করেও সি. আর. ও.-তে ওয়েভফর্মটা পাচ্ছি না। এই যে, দেখুন....।'

ত্রিযামার হাত থেকে খাতাটা নিল পরমেশ। আঙুল দিয়ে দেখানো সার্কিট ডায়াগ্রামটা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর সার্কিটের একটা রেজিস্টরের দিকে ইশারা

করে বলল, 'এটা পালটে ফরটি সেভেন "কে" লাগিয়ে দাও। তারপর দ্যাখো ওয়েভফর্মটা পাও কি না। যদি না হয় তা হলে লাইব্রেরি থেকে ডিলিঞ্জারের "ইলেকট্রনিক সার্কিট ডিজাইন" বইটা নিয়ে একটু উলটেপালটে দ্যাখো। ওটাতে অনেক ইন্টারেস্টিং সার্কিট দেখানো আছে।'

খাতাটা ত্রিযামাকে ফিরিয়ে দিয়ে পরমেশ চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। লক্ষ করল, ত্রিযামা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই পরমেশের চোখের জল দেখে ফেলেছে।

সুচরিতা মারা যাওয়ার পর সপ্তাহদুয়েক ক্লাস নিতে পারেনি পরমেশ। তারপর, বহু চেষ্টায়, নতুন করে যখন ক্লাস নেওয়া শুরু করেছিল তখন ব্যাপারটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। পড়ানোটা তো এলোমেলো হতই, তার ওপর মাঝে-মাঝেই আনমনা হয়ে যেত পরমেশ। মনে হত, রিতু ওকে ডাকছে।

সেসময়ে একদিন ত্রিযামা কী একটা জিনিস বোঝার জন্য পরমেশের ঘরে এসেছিল। বোঝার ব্যাপারটা মিনিটপাঁচেকের মধ্যে মিটে যাওয়ার পরেও মেয়েটা ঘর থেকে বেরোয়নি। কয়েক লহমা পরমেশের দিকে তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করেছে, 'স্যার, আপনার কী হয়েছে?'

পরমেশ এই প্রশ্নে একটা ধাক্কা খেয়েছে। স্যার আর ছাত্রীর মাঝের পাঁচিলটা ত্রিযামা যেন একলাফে ডিঙিয়ে যেতে চাইছে।

এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে পরমেশ বলেছে, 'না, কিচ্ছু হয়নি—।'

তার পরেও আরও দু-দিন ত্রিযামা একই প্রশ্ন করেছে। রিতুর কথা ভেবে মনে কষ্ট হলেও পরমেশ মাথা নেড়ে একই উত্তর দিয়েছে, 'না, কিচ্ছু হয়নি।'

এর কয়েকদিন পর ত্রিযামা যা করেছে সেটা পরমেশকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

একদিন ছুটির পর—সাড়ে পাঁচটা কি পৌন ছ'টা নাগাদ—পরমেশ ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবে, ত্রিযামা কোথা থেকে এসে আচমকা হাজির হল পরমেশের সামনে।

'স্যার, আজ আমাকে একটু লিফ্‌ট দেবেন?'

'কোথায় যাবে তুমি?'

'''রঙ্গনা''র কাছাকাছি কোথাও একটা নামিয়ে দিলেই হবে....।'

পরমেশ দরজার লক খুলতেই ত্রিযামা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে বসল।

পরমেশ অস্বস্তির চোখে চারদিক দেখে নিল। এই প্রথম কোনও ছাত্রী ওর গাড়িতে উঠল।

ডিপার্টমেন্টের বাইরে চওড়া বারান্দা। বারান্দায় ব্রিটিশ আমলের বিশাল মাপের কয়েকটা চৌকো পিলার। আকাশে আলো কমে এসেছে বলে দারোয়ান বারান্দার একজোড়া টিউবলাইট জ্বেলে দিয়েছে।

pathagar.net

বারান্দার লাগোয়া ফুটদশেক চওড়া পিচের রাস্তা। তার ওপাশেই রেলিং ঘেরা লন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বড়বড় গাছ আঁধার ঘন করেছে। পাখিদের সন্ধেবেলার ঝগড়া শোনা যাচ্ছে।

পাঁচটায় ডিপার্টমেন্ট মোটামুটি ছুটি হয়ে যায়। অশিক্ষক কর্মীরা সবাই চলে যায়। ছাত্রছাত্রীরা ল্যাবের কাজ শেষ করে রওনা হয়। শুধু পাঁচজন কি ছ'জন মাস্টারমশাই তার পরেও গবেষণায় মেতে থাকেন।

পরমেশ সাধারণত এরকম সময়েই বেরোয়। কিন্তু ত্রিযামা আজ এতক্ষণ ল্যাবে কী করছিল? আর যদি ল্যাবে ও থেকেই থাকে, তা হলে তো সেখানে কোনও স্টাফকে হাজির থাকতে হয়। তা ছাড়া ওর পার্টনার পল্লব কোথায় গেল?

পরমেশ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগোল। কেন জানি না, ও ত্রিযামাকে ভয় পাচ্ছিল। মেয়েটা এমনিতে খুব স্পষ্ট, স্বচ্ছন্দ, সপ্রতিভ। আর চোখ দুটো এমন যে, চটপট সবকিছু পড়ে নিতে পারে। ও ব্যাগটা কোলের ওপরে নিয়ে সোজা তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে।

সায়েন্স কলেজের ক্যাম্পাসের রাস্তা পেরিয়ে মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়ল পরমেশ। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছিল না ও। ত্রিযামার বাড়ি ফুলবাগানের দিকে। ও হঠাৎ 'রঙ্গনা'র দিকে লিফ্‌ট চাইল কেন?

সারাটা রাস্তা দুজনে চুপচাপ। গাড়ি চলেছে নিজের মনে।

একসময়ে এই নীরবতা অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। পরমেশ আর থাকতে না পেরে বলল, 'কী, চুপ করে আছ কেন?'

'আপনার কী হয়েছে, স্যার?'

ত্রিযামা আবার সেই 'গোরু' রচনায় ফিরে গেছে।

'কই, কিছু হয়নি তো!'

পরমেশের বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করছিল। এই বোধহয় দস্যু মেয়েটা পরমেশের বুকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দুঃখের গোপন কোটর থেকে রিতুর বেদনাটা একটানে বাইরে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে।

পরমেশের উত্তর শুনে আবার চুপচাপ হয়ে গেল ত্রিযামা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

পরমেশ কোনও কথা না বলে গাড়ি চালাতে লাগল। অধৈর্য হয়ে বারবার ভাবল, কতক্ষণে 'রঙ্গনা' এসে পৌঁছবে—ত্রিযামা নেমে যাবে।

একটু পরেই 'রঙ্গনা' থিয়েটারের বাস স্টপের কাছে চলে এল ওরা। পরমেশ ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি থামাল।

ত্রিযামা দরজা খুলে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। দরজাটা বন্ধ করে ঝুঁকে পড়ল জানলার কাছে।

পরমেশ মেয়েটার দিকে তাকাল।

ও বলল, 'স্যার, আমি জানতাম দুঃখের কথা শেয়ার করলে দুঃখটা কমে যায়। থ্যাংক য়ু ফর দ্য রাইড।'

তারপরই মেয়েটা যে-কাণ্ড করল সেটা পরমেশের কল্পনার বাইরে।

ত্রিযামা গাড়ি থেকে নামামাত্রই পরমেশ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু এখন সেটা উবে গেল। পরমেশের ভেতরটা প্রবল ঝাঁকুনিতে ভিত পর্যন্ত নাড়া খেয়ে গেল।

পরমেশ খেয়াল করেনি কখন যেন একটা ক্যাডবেরি চকোলেট ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছে ত্রিযামা। সেটা সিটের ওপরে রেখে দিয়ে বলল, 'আপনার জন্যে। ভালো থাকবেন।'

কথাটা বলেই চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা।

গাড়ি স্টার্ট করতে পরমেশের বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল।

না, ক্যাডবেরিটা ফেলে দেয়নি ও। বয়েস হয়ে গেলেও ক্যাডবেরি খেতে ওর এখনও ভালো লাগে। কখনও-কখনও ঠাট্টা করে রিতু কিংবা বুবুকে বলত, 'ক্যাডবেরি তো আমি এমনি-এমনি খাই।'

গাড়ি চালাতে-চালাতে ক্যাডবেরি চকোলেটে কামড় দিয়েছিল পরমেশ। ওটা খেতে-খেতে ওর মনে হচ্ছিল, দুঃখটা ও ত্রিযামার সঙ্গে শেয়ার করছে। আর, একটা অদ্ভুত বন্ধুত্ব ওকে প্রবল হাতছানি দিচ্ছে।

ক্যাডবেরি চকোলেটটার কথা আর-কাউকে বলেনি পরমেশ।

এখন ত্রিযামার মুখের দিকে তাকিয়ে পুরোনো কথাগুলো ওর মনে পড়ছিল। এ ক'মাস দুঃখের ঘেরাটোপে থাকতে-থাকতে পরমেশ কেমন যেন অবসাদে ডুবে গেছে। সেই ঘেরাটোপ থেকে পরমেশ ছুটি চাইছিল। অন্ধকার ঘরের ভেতরে ও একটা জানলা খুঁজছিল। কারণ, শুধু চোখের জল সঙ্গী করে বাঁচা যায় না।

আজ ত্রিযামাকে দেখে জানলাটার কথা মনে পড়ল পরমেশের।

পল্লব হঠাৎ বলল, 'স্যার, ডিলিঞ্জারের বইটা কি ইশু করা যাবে, না কি ওটা রেফারেন্স বই?'

'ওটা দু কপি আছে। মনে হয়, ইশু করতে পারবে। তুমি লাইব্রেরিতে গিয়ে সরলদার সঙ্গে একটু কথা বলে দ্যাখো...।'

পল্লবকে দেখল পরমেশ। গায়ের রং কালো, যেন কষ্টিপাথরে খোদাই করা চেহারা। মাথায় ছোট-ছোট করে ছাঁটা চুল। চোখ দুটো সরল। মিষ্টি হাসি মুখ।

পল্লব গ্রামের ছেলে। ওদের গ্রাম থেকে ও-ই প্রথম ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছেছে। এখনও চাষের সময় ও ছুটি নিয়ে বাড়ি যায়। বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লাঙল চালায়।

হোস্টেলে ওর সিট পাওয়া নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল। তখন পরমেশ সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল। বেশ মনে পড়ে, ফার্স্ট ইয়ারে একটানা ক্লাস কামাই করার জন্য পরমেশ পল্লবকে বকুনি দিয়েছিল। তখনই ওর গ্রামের কথা পরমেশ জানতে পারে, জানতে পারে ওর ছোট-ছোট ভাইদের কথা, আর বৃদ্ধ অসুস্থ বাবার কথা।

pathagar.net

তার পর থেকে পল্লবকে সাহায্য করার ব্যাপারে পরমেশ বাড়তি যত্ন নেয়। পল্লবও ওকে খুব মানে—বোধহয় ভালোও বাসে।

প্রজেক্ট নিয়ে আরও দু-চারটে কথার পর পল্লব আর ত্রিযামা উঠে দাঁড়াল।

ত্রিযামার দিকে তাকিয়ে পরমেশের মনে হল, ও যেন আরও কিছু বলতে চায়।

পল্লবকে দু-একবার চকিতে দেখল ত্রিযামা। তারপর কয়েক লহমা সময় নিয়ে ফস করে জিগ্যেস করল, 'আজ আপনি কখন বেরোবেন, স্যার?'

'এই ধরো...সাড়ে পাঁচটা....।'

'আমাকে আজ একটু লিফ্‌ট দেবেন....।'

কথাটা শুনেই পল্লব যে ত্রিযামার দিকে ফিরে তাকিয়েছে সেটা পরমেশ লক্ষ করল। ও কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ একসঙ্গে যাওয়া!

ক্যাডবেরি চকোলেটটার কথা মনে পড়ল পরমেশের।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'ঠিক আছে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এসো—।'

পল্লব আর ত্রিযামা চলে গেল।

পরমেশের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ওর আবার মনে পড়ে গেল রিতুর কথা। সব জেনেশুনেও কেউ কিচ্ছু করতে পারল না। একটা জঘন্য ক্রিমিনাল দিব্যি ছাড়া পেয়ে হা-হা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরমেশের ভেতরটা মুচড়ে উঠল—ঠিক যেভাবে লোকে ভেজা গামছা নিংড়োয়।

ওর টেবিলটা মাপে বেশ বড়, হালকা রঙের রেক্সিনে বাঁধিয়ে ওপরটায় কাচ বসানো। টেবিলের ডানদিকে পরপর তিনটে ড্রয়ার। আর বাঁ-দিকে একটা দেরাজ—ছোট্ট আলমারির মতো।

ডানদিকের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল পরমেশ। ড্রয়ারের ভেতরে রিতুর রঙিন ফটো। ওর চোখে নকল চশমা। তার ফাঁক দিয়ে মজার চোখে তাকিয়ে আছে রিতু। ওর সাধ ছিল 'ডি জে' কিংবা 'ভি জে' হবে। তাই নানান ভঙ্গিমায় নানান পোশাকে ছবি তুলত। পরমেশ নিজেই ওর বহু ছবি তুলে দিয়েছে। ও বারবার বলত, 'বাপি, বুঝলে, গ্র্যাজুয়েশানটা হলেই ব্যস...সোজা অডিশান...তারপর....ওঃ!'

রিতুর খুশি আর উত্তেজনার 'ওঃ!' টা এখন দুঃখের 'ওঃ!' শোনাল পরমেশের কানে। আর ওর মজার নজরটা যেন ব্যঙ্গ মাখা বিদ্রুপের দৃষ্টি হয়ে দাঁড়াল। বারবার পরমেশকে বিদ্ধ করতে লাগল।

এক ঝটকায় ড্রয়ার বন্ধ করে দিল পরমেশ। ড্রয়ারের শব্দটা ওর বুকের ভেতরে বাজল।

সময়ের হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছিল। ক্লান্ত অবসন্নভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে রইল পরমেশ। ওই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আচমকা মোবাইল ফোন বেজে উঠতেই ও চমকে উঠল। পকেট থেকে ফোন বের করে বোতাম টিপল।

'হ্যালো—।'

প্রমিতা। রোজই ও একবার অন্তত পরমেশকে ফোন করে। দু-চারটে সাধারণ কথা বলে—ব্যস।

আজও তাই।

আগে সুচরিতাও ফোন করত। ফোনে ঠাট্টা-মজা করে পরমেশকে জ্বালাত। এখন ও আর জ্বালায় না।

কিন্তু পরমেশ জ্বলছে।

ঘড়ির কাঁটা পরমেশ খেয়াল করেনি। ত্রিযামা ঘরে এসে ঢুকতেই ও বুঝল, সাড়ে পাঁচটা বাজে।

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে চটপট ড্রয়ারে চাবি দিল পরমেশ। বাঁ-দিকের দেরাজে চাবি দেওয়াই ছিল। চাবির গোছাটা টেবিলে রাখা বইপত্রের আড়ালে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পাশের টুলে রাখা ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল, 'চলো—।'

ত্রিযামা আগে ঘর থেকে বেরোল। তারপর আলো-পাখার সুইচ অফ করে সুইংডোর ঠেলে বাইরে এল পরমেশ। ত্রিযামা ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিল।

সুইংডোর ছাড়াও পরমেশের ঘরে বিশাল মাপের ভারী দরজা রয়েছে। তার পাল্লাদুটো টেনে বন্ধ করে হাঁসকল লাগাল পরমেশ। তারপর তালা দিল।

ত্রিযামা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই চাপা গলায় ও প্রশ্ন করল, 'আপনার কী হয়েছে, স্যার?'

পরমেশ চমকে মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। স্থির চোখে ও তাকিয়ে আছে স্যারের দিকে। নাঃ, আজ বোধহয় আর নিস্তার নেই!

'চলো, যেতে-যেতে বলছি...।'

এ ছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারে পরমেশ!

ডিপার্টমেন্টের নির্জন করিডর দিয়ে হেঁটে বাইরের বারান্দায় এল ওরা। গাড়িটা বারান্দার গা ঘেঁষে দাঁড় করানো।

ওরা গাড়িতে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পল্লব।

ওকে দেখে অবাক হল পরমেশ। ও এখনও বাড়ি যায়নি? বোধহয় ত্রিযামার জন্য অপেক্ষা করছিল।

pathagar.net

কয়েকমাস ধরে পরমেশ লক্ষ করেছে, পল্লব সবসময় ত্রিযামার সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে চায়।

পরমেশের কাছে এটা নতুন নয়। তিন বছরের বি. টেক. কোর্স পড়তে-পড়তে অনেক সম্পর্কই তৈরি হতে দেখেছে। সাধারণত এটা তৈরি হতে বছরদুয়েক সময় লাগে। বিশেষ করে থার্ড ইয়ারে প্র্যাকটিক্যাল করার সময় এবং প্রজেক্ট করার সময় ব্যাপারটা দ্রুত গাঢ় হয়।

পল্লবের আগ্রহ থাকলেও ত্রিযামা যে সেই আগ্রহটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না সেটা পরমেশ লক্ষ করেছে।

এখন পল্লবকে দেখে ত্রিযামা বেশ বিরক্ত হল। ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'কী রে, কী ব্যাপার?'

'তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল....।' খানিকটা কাছে এগিয়ে এসে ইতস্তত করে বলল পল্লব।

'কী কথা?'

পল্লব পরমেশের দিকে কুণ্ঠিতভাবে একবার তাকাল।

পরমেশ অন্যমনস্কতার ভান করে গাড়িতে বসে পড়ল। ওদের সমস্যা ওরাই মেটাক।

ঠিক তখনই ত্রিযামা ঠান্ডা গলায় পল্লবকে বলল, 'কাল বলিস—কাল শুনব।'

ত্রিযামা গাড়িতে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করে দিল।

পল্লব ততক্ষণে চলে এসেছে পরমেশের জানলার কাছে। ঝুঁকে পড়ে নরম গলায় বলল, 'স্যার, আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন? শ্যামবাজারের কাছে একটা কাজ আছে।'

মনে-মনে পল্লবের সাহসকে তারিফ করল পরমেশ। গ্রামের ছেলে হলেও ত্রিযামার জন্য একটা টান ওকে বদলে দিচ্ছে।

পরমেশ পিছনের দরজার লক খুলে দিল। চটপট উঠে পড়ল পল্লব। ও দরজা বন্ধ করতেই পরমেশ গাড়ি স্টার্ট দিল। ওর সংকোচ অস্বস্তি অনেকটা কেটে গেল। ত্রিযামার মুখোমুখি হওয়ার ভয়টা ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল।

ওরা রাস্তায় এসে পড়তেই নীল আকাশ থেকে বাজ পড়ার মতো প্রশ্ন ছুড়ে দিল ত্রিযামা : 'স্যার, আপনার কী হয়েছে? আপনি একা-একা বসে কাঁদছিলেন কেন?'

পরমেশ পলকে পাথর হয়ে গেল। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসতে চাইল। চব্বিশ বছরের এই মেয়েটা বলে কী! ও কি পিছনের সিটে বসা পল্লবের কথা ভুলে গেল?

ঠিক তখনই পল্লব আলতো গলায় বলল, 'হ্যাঁ, স্যার—আমিও দেখেছি।

আপনার কীসের কষ্ট, স্যার?'

ওরা দুজনেই তা হলে সব দেখেছে!

পরমেশ আর থাকতে পারল না। ওর চোখে জল এসে গেল আবার। ওরা জানতে চাইছে পরমেশের দুঃখের কথা। ওদের বললে ক্ষতি কী? ওরা হয়তো পরমেশকে সান্ত্বনা দেবে, হয়তো দুঃখ কমাতে চেষ্টা করবে।

পরমেশ ব্যক্তিগত কথা কখনও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে না। সবসময় একটা সীমারেখা মেনে চলে ও। কিন্তু এখন কী যে হল! ওর যেন হঠাৎই মনে হল, রিতুর ব্যাপারটা কিছুটা হলেও ওদের খুলে বলা উচিত।

খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে-চালাতে কথা বলতে লাগল পরমেশ। ত্রিযামা আর পল্লব একান্ত মনোযোগে স্যারের গোপন দুঃখের কথা শুনতে লাগল।

পরমেশ বলছিল আর ওর বুকের ভেতরের চাপটা হালকা হচ্ছিল। রিতুকে দেখতে পেল ও। হাসছে আর মাথা নাড়ছে—বলতে চাইছে : 'ঠিক, ঠিক! আমার কথা ওরা জানুক—সবাই জানুক।'

রোজকার অভ্যাসমতো রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল পরমেশ। কথা বলতে-বলতে খানিকটা বোধহয় আনমনাও হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল যখন হল তখন ও নীরোদবিহারী মল্লিক রোডের ক্রসিং-এ এসে পড়েছে।

পরমেশের কথা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ত্রিযামা আর পল্লব।

পরমেশ লক্ষ করল, ত্রিযামার চোখের কোণ ভিজে গেছে। ও রুমাল দিয়ে নাকের গোড়ার কাছটা চেপে ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

পরমেশের চোখ জ্বালা করছিল। চশমার কাচের নীচ দিয়ে একটা আঙুল ঢোকাল ও চোখের কোণ দুটো মুছে নিল।

পল্লব বলল, 'লোকটাকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি, স্যার।'

ত্রিযামা রুমালটা হাতব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, 'ছাড়া পেয়ে ক্রিমিনালটা আরও এনকারেজ্‌ড হবে। হি শুড বি পানিশ্‌ড।'

কে শাস্তি দেবে! ভাবল পরমেশ। আর তখনই ওর মনের মধ্যে একটা রাগ ফুঁসে উঠল। ওর কি কোনও ক্ষমতা নেই? ও কি এতই অক্ষম? রিতু ওকে দিন-রাত বলছে, কিছু একটা করো। এখন ত্রিযামা বলছে, পল্লব বলছে। বাড়িতে প্রমিতা বলছে আর সর্বক্ষণ হা-হুতাশ করছে। তা সত্ত্বেও পরমেশ কিছু করতে পারছে না!

পরমেশের মাথার ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। বুকে একটা তার ছিঁড়ে গেল যেন।

ও হঠাৎই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল ডানদিকে। গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। রাস্তার ডানদিকে সতর্ক চোখ রেখে এগোতে লাগল। কোথায় লোকটা? আর-একটু এগিয়ে

pathagar.net

ডানদিকে ঘুরলেই তো ওর দোকান। দোকান কি এখনও খোলা আছে? পরমেশ একবার ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। অন্তত একবার।

কেক-পাঁউরুটির দোকানের সামনে আসতেই সুদেব সামন্তকে দেখতে পেল পরমেশ। ডানদিকের ফুটপাতে একটা মহুয়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর একজন বুড়োমতন লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

আচমকা গাড়িটা ডানদিকে নিয়ে গেল পরমেশ। সুদেবের কাছাকাছি গিয়ে জোরে ব্রেক কষে রং সাইডে দাঁড় করাল।

সুদেব চমকে ফিরে তাকাল গাড়িটার দিকে। ততক্ষণে পরমেশ দরজা খুলে নেমে পড়েছে।

সুদেব সামন্ত একগাল হেসে ওকে বলল, 'দাদা, ভালো আছেন?'

পরমেশ আগুনঝরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় একদলা থুতু ছুড়ে দিল রাস্তায়। এবং নিজেকে অবাক করে দিয়ে সুদেবের বুকের কাছটায় থাবা মারল। বাঁহাতে খামচে ধরল ওর জামা।

'শালা, মার্ডারার! ফাকিং সন অফ আ বিচ!'

হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল পরমেশ। এবং সপাটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল সুদেবের চোয়ালে।

স্যারকে এই কাণ্ড করতে দেখে ত্রিযামা আর পল্লব হতবাক হয়ে গেল।

পরমেশের ঘুসিতে সুদেব হকচকিয়ে গেল। কাত হয়ে হেলে পড়ল মহুয়া গাছের গায়ে। কিন্তু সেখান থেকে মোটেই গড়িয়ে পড়ল না ফুটপাতে। বরং এক হ্যাঁচকায় চাড় দিয়ে শরীরটাকে সোজা করে ফেলল। এবং চোখের পলকে ডানহাতে ধরা সিগারেটটা চেপে ধরল ঝাঁপিয়ে-পড়া ক্ষিপ্ত পরমেশের গালে।

পরমেশ চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো ছিটকে সরে এল পিছনে। জ্বালা-ধরা গালে হাত চেপে ডুকরে উঠল। চামড়া পোড়া গন্ধ যেন নাকে টের পেল ও। গোটা শরীরটা তীব্রভাবে জ্বলতে লাগল।

পরমেশ নিজেকে সামলে ওঠার আগেই সুদেবের ডানপায়ের লাথি এসে পড়ল ওর পেটে। 'উপ্‌স' শব্দ করে ফুটপাতে পড়ে গেল পরমেশ। ওর মাথা ঠুকে গেল, দম আটকে এল। মনে হল, এক লাথিতে ওর শরীরের সমস্ত হাওয়া বেরিয়ে গেছে। খোঁচা খাওয়া কেন্নোর মতো শরীরটা গুটিয়ে হাঁ করে বাতাস নিতে চাইল পরমেশ। ওর চোখের সামনে আকাশ-বাতাস বাড়ি-ঘর ঝাপসা হয়ে এল। ও মনে-মনে চাইল, রিতুর খুনির কাছে ও নিজেও শেষ হয়ে যাক। তা হলে রিতু অন্তত বুঝবে বাপি কিছু একটা করতে চেয়েছিল।

সুদেব সামন্তর ভেতরে একটা রাগ জানোয়ারের মতো ফুঁসছিল। শেষ কবে কে ওর গায়ে হাত তুলে পার পেয়েছে ওর মনে নেই—অবশ্য পুলিশ ছাড়া।

ওর মনে পড়ে গেল সাব-ইনস্পেকটার রাজতনু চ্যাটার্জির কথা। মনে পড়ে গেল পুলিশ-হাজতের দিনগুলোর কথা।

ফুটপাতে পড়ে থাকা পরমেশকে রাজতনু মনে করে সুদেব কাছে এগিয়ে এল। পরমেশের অসহায় শরীরটাকে লক্ষ করে এলোপাতাড়ি পা চালাতে শুরু করল।

গোলমাল দেখে সুদেবের সঙ্গী বুড়োমতন লোকটা নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছিল আগেই। কিন্তু আশপাশের কয়েকজন ইতিমধ্যে এসে জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তবে তারা শুধুই দর্শক।

ত্রিযামা গাড়ির ভেতর থেকে 'স্যার! স্যার!' বলে চেঁচাচ্ছিল। আর পল্লব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, ব্যাপারটা কী। কেনই-বা স্যার ওই ছেলেটার সঙ্গে আচমকা হাতাহাতি মারপিটে জুতে গেলেন।

কিন্তু স্যারকে ফুটপাতে পড়ে যেতে দেখে ত্রিযামা আর থাকতে পারল না। এক টানে দরজা খুলে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। দেখাদেখি পল্লবও নেমে পড়ল।

সুদেব যখন পরমেশকে একের পর এক হিংস্র লাথি কষাচ্ছে তখন ত্রিযামা আর সইতে পারল না—কেঁদে ফেলল। পল্লবকে এক ধাক্কা দিল। কান্নাভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'ফর গড্‌স সেক, পল্লব, গো এহেড অ্যান্ড কিল দ্য বাস্টার্ড!'

পল্লব চাষির ছেলে। অত ভালো ইংরেজি বোঝে না। তবে ত্রিযামার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। বুঝতে পারল ত্রিযামা ওকে কী করতে বলছে। ত্রিযামার বলা মানে পল্লবের কাছে আদেশ। এই আদেশ পালন করতে পারলে ও যেন ধন্য হয়ে যাবে।

সুতরাং চাষির ছেলে মাঠে নেমে পড়ল।

পল্লব গাড়ির দরজা খুলে নামার পর কয়েক লহমা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ত্রিযামার কান্না আর চিৎকারে ও ইলেকট্রিক শক খাওয়া মানুষের মতো একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেল। একলাফে পৌঁছে গেল সুদেবের পিছনে। দু-হাতের শক্ত পাঞ্জায় চেপে ধরল লোকটার গলা। তারপর নিমেষের মধ্যে আঙুলে-আঙুলে ফাঁস লাগিয়ে পিছনদিকে এক হ্যাঁচকা টান মারল।

সেই টানে সুদেব সামন্তর শরীরটা পিছনদিকে পালটি খেয়ে গেল। ওর একটা হাত চেপে ধরে পল্লব নিজের দেহটাকে চট করে একটা মোচড় মেরে নিল। অমনি সুদেবের হাতটা প্যাঁচ খেয়ে গেল। ও যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল। পল্লবের কালো কুচ্ছিত চওড়া কবজি আর মোটা-মোটা চাষির আঙুল সুদেবকে কাবু করে দিল। সুদেব কুঁজো হয়ে স্ট্যাচুর মতো স্থির হয়ে রইল। ওর দাঁতের ফাঁক দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল।

পল্লব তখন পাগল হয়ে গেছে। ওর চোখের সামনে একটা লাল পরদা নেমে এসেছে। ও হাতের মোচড়ের জোর বাড়াতে লাগল আর সুদেবের শক্ত কাঠামোটা

pathagar.net

ক্রমশ নুয়ে পড়তে লাগল।

একসময় সুদেব সামন্ত হোঁট খেয়ে পড়ে গেল ফুটপাতে। আর পল্লব বুটপরা পায়ে সুদেবকে থেঁতলাতে লাগল—যেন পা দিয়ে একতাল অবাধ্য ময়দাকে কষে মেখে চলেছে।

ত্রিযামা চিৎকার করে পৌঁছে গিয়েছিল আহত পরমেশের কাছে। ঝুঁকে পড়ে ওর স্যারকে তোলার চেষ্টা করছিল। 'স্যার! স্যার!' করে ডাকছিল বারবার।

পরমেশ কোনওরকমে উঠে বসল।

ওর কপালের একপাশটা বিশ্রীভাবে উঁচু হয়ে আছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। লম্বা চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কপালে, গালে। তবু তারই ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

পরমেশের মাথা টলছিল। ও কাঁপা হাতে ত্রিযামার হাত চেপে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল, এই হাতটা ছেড়ে দিলেই ও অনেক নীচে তলিয়ে যাবে।

এর মধ্যে কৌতূহলী জনতার ভিড় বেশ বেড়ে উঠেছিল। তাদের গুঞ্জন পালটে গিয়েছিল হইচইয়ে। হঠাৎই কয়েকজনের বোধহয় মনে হল, মজা দেখার কাজটা অনেকক্ষণ হয়েছে—এবারে কিছু একটা করা দরকার। তাই জনতার কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল পল্লবের ওপরে। ওকে জাপটে ধরে টেনেহিঁচড়ে সুদেবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল।

সুদেবের শরীরে ব্যথা-জ্বালা থাকা সত্ত্বেও বেশ তাড়াতাড়ি ও উঠে বসল। তারপরই ওর মনের ব্যথা এবং জ্বালা ওকে দাঁড় করিয়ে দিল। পাগল করা রাগ নিয়ে ও পল্লবের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু কয়েকজন লোক ওকেও জাপটে ধরল।

সুদেব মনে-মনে আপশোস করছিল বারবার। কেন যে ও একটা পকেট-ছুরি সঙ্গে করে নিয়ে বেরোয়নি! অথচ বেশিরভাগ সময়েই ও ওই ছোট্ট ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। এখন ওটা থাকলে এই কেলো হারামির বাচ্চাটার কলজে খুবলে নিতে পারত।

ভিড় করে থাকা লোকজন সুদেব, পরমেশ, আর পল্লবকে দেখছিল। তবে তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ত্রিযামাকে। এই পাড়ার পরিবেশে ত্রিযামার চেহারা, পোশাক-আশাক যেন বড্ড বেশি বেমানান, বড্ড বেশি আধুনিক।

ভিড় দেখে ত্রিযামা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে থানা-পুলিশ হয়ে গেলে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। পরমেশের সুনামে হয়তো আঁচড় পড়বে। তাই ত্রিযামা পরমেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল গাড়ির কাছে। যেতে-যেতে পল্লবের দিকে তাকাল।

পাড়ার লোকজন সুদেব সামন্তকে প্রশ্ন করে-করে কাহিল করে দিচ্ছিল। কিন্তু

সুদেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পল্লবকে লক্ষ করে গালাগাল দিচ্ছিল, ফুঁসে উঠছিল।

পল্লব ততক্ষণে অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। ও ত্রিযামার দিকে তাকিয়ে ছিল। যেন নীরব প্রশ্নে জানতে চাইছে, এবার কী করব।

ত্রিযামা পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ওকে ডাকল : 'শিগগির আয়! স্যারকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে—।'

দু-তিনজন লোক তখনও আলতো হাতে পল্লবকে ধরে ছিল। পল্লব তাদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শব্দ করে থুতু ফেলল ফুটপাতে। তারপর অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ পায়ে চলে এল ত্রিযামার কাছে।

পল্লবকে দেখে মোটেই ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল না, একটু আগেই ও তুমুল হাতাহাতি লড়াই করেছে।

ওরা তিনজনে গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময় সুদেব সামন্ত ছুটে এসে ওদের পথ আগলে দাঁড়াল।

সুদেবের ফরসা মুখ রুক্ষ লালচে। চোখের নজরে তীব্র জ্বালা।

ও কাহিল পরমেশের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'অ্যাই সালা প্রফেসার! সবাই আমাকে জিগ্যেস করছে তুই হঠাৎ এসে আমার গায়ে হাত তুললি কেন—কী বলব ওদের, বল্—।'

সুদেবের কথা বলার নোংরা ভঙ্গি পল্লব আর ত্রিযামাকে ভীষণভাবে ধাক্কা দিল।

ত্রিযামা চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি জানেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন!'

সুদেব হঠাৎ ওর কথা বলার ভঙ্গি পালটে ফেলল। ত্রিযামার দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করে হেসে বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছি সেটাই জানতে চাইছি—সেইসঙ্গে তোমার ফোন নাম্বারটাও দিয়ো কিন্তু! তোমাকে মাইরি হ্যাভক দেখতে!'

পল্লব সামনে ঝুঁকে পড়ে এক খাবলায় সুদেবের কলার চেপে ধরল এবং পলকে একটা জোরালো ঘুসি বসিয়ে দিল সুদেবের মুখে। ঘুসির ধাক্কায় ও কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

আশপাশের লোক হইহই করে উঠল। পল্লবকে সামাল দিতে দু-তিনজন ওকে আগলে দাঁড়াল।

বয়স্ক একজন ভদ্রলোক পরমেশদের সামনে এগিয়ে এলেন। পরনে খাদ্রা শার্ট আর চেককাটা লুঙ্গি। গায়ের রং কালো। গালে কপালে ভাঁজ পড়েছে। চোখে মোটা ফ্রেমের হাই পাওয়ারের চশমা। থুতনিতে আর গালে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি।

তিনি পরমেশকে বললেন, 'রাস্তার মাঝে এসব কী শুরু করেছেন? যদি এখনই এসব ফালতু হুজ্জুতি না থামান তা হলে আমরা থানায় খবর দেব। যান, চলে যান এখান থেকে। নিজেদের মধ্যে কাজিয়া থাকলে কোর্টকাছারি করে ফয়সালা

pathagar.net

করে নেবেন। এবার যান তো—।'

পরমেশ মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। ত্রিযামা আর পল্লব অপরাধী-মুখে-দাঁড়িয়ে-থাকা স্যারকে অবাক চোখে দেখছিল।

সুদেব এবার এগিয়ে এল। বয়স্ক ভদ্রলোককে বলল, 'কী আজব ব্যাপার দেখুন তো, হরিকাকা! এই লোকটার সঙ্গে আমার যা লাফড়া ছিল সেসব ক'দিন আগে কেসকামারিতে মিটে গেছে। কোর্টের কাগজ বেরিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমাকে বেফালতু নাজেহাল করে মারছে। একটা মজা দেখবেন?'

হরিকাকা জানতে চাইলেন, 'কী?'

'এই দেখুন—' বলে পরমেশের দিকে সরাসরি তাকাল সুদেব। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েই রইল।

পল্লব আর ত্রিযামা অবাক হয়ে সুদেব সামন্তকে দেখতে লাগল। পল্লবের ঘুসিতে সুদেব নাকে চোট পেয়েছে। ওর নাকের বাঁ-দিকের ফুটো দিয়ে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সুদেবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও পরমেশের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের সামনে তর্জনী তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাই প্রফেসারের বাচ্চা! হিম্মৎ থাকে তো সবার সামনে বল্, তুই প্রথমে আমার গায়ে হাত তুললি কেন—।'

পরমেশ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

'কী রে সালা, বল্ আমার গায়ে হাত তুললি কেন?'

পরমেশ চুপ।

চারপাশে না তাকিয়েই ও বুঝতে পারছিল একগাদা কৌতূহলী মুখ প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সুদেব সামন্ত গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে আকাশের দিকে তাকাল, ফুটপাতের দিকে তাকাল, তাকাল চারপাশে ঘিরে থাকা লোকজনের দিকেও।

তারপর ব্যঙ্গের সুরে পরমেশকে জিগ্যেস করল, 'কী রে মাস্টারজি, আমি কেসটা বিচবাজার বিলা করে দেব? বলে দেব সব্বাইকে?'

পরমেশের কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। যদি বলে দেয় সুদেব? কী হবে তা হলে? পরমেশ কি আর মুখ দেখাতে পারবে এলাকায়?

সুচরিতার ব্যাপারটা পাড়ার দু-চারজন জানে। বাকিরা অনুমান করার চেষ্টা করে। পরমেশের ডিপার্টমেন্টে বা সায়েন্স কলেজে রিতু মারা যাওয়ার বিস্তারিত কারণ কেউ জানে না। খবরের কাগজেও নাম-ঠিকানা কিছু বেরোয়নি।

কিন্তু এখন? এখন সুদেব যদি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়! ত্রিযামা, পল্লব ব্যাপারটা সবিস্তারে তো শুনবেই—শুনবে এখানে ভিড় করে থাকা বিশ-তিরিশটা লোকও। তারপর, এক সপ্তাহের মধ্যেই, সংখ্যাটা পৌঁছে যাবে দু-হাজার কি তিন হাজারে।

কথাটা ভাবতেই কুঁকড়ে গেল পরমেশ। ওর চোখ জ্বালা করতে লাগল।

অথচ পরমেশদের কোনও দোষ নেই। রিতুরও কোনও দোষ ছিল না। তা সত্ত্বেও পরমেশদের এখনও লোকলজ্জার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হচ্ছে! কী অদ্ভুত এই জীবন!

সুদেব আরও কী-কী কথা বলছিল যেন। সেগুলো ভালো করে পরমেশের কানে ঢুকছিল না। ওর চোখে জল এসে গেল। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল পরমেশ। চাপা কান্নায় গুমরে উঠল ও। টের পেল, বাঁ গালটা সিগারেটের ছ্যাঁকায় জ্বালা করছে।

সুদেব সামন্ত আবার হেসে উঠল পাগলের মতো। তারপর পরমেশের দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে বলল, 'সালা মোগা! ছক্কার বাচ্চা! থানায় ডায়েরি করে এখুনি তোকে হাজতে ঢোকাতে পারতাম—কিন্তু ওতে মজা নেই। বরং এতেই মজা। এই যে তুই মাঝে মাঝে আসবি, ফরফরাবি, ফোঁসফোঁস করবি—কিন্তু ছোবল মারতে পারবি না—এতেই মজা।'

আবার হো হো করে হেসে উঠল সুদেব সামন্ত।

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। ত্রিযামা আর পল্লব পরমেশকে ধরে ড্রাইভিং সিটে বসাল। তারপর দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল।

ওরা কেউই গাড়ি চালাতে জানে না। সুতরাং যে-করে-হোক পরমেশকেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অথচ পরমেশ ঝাপসা দেখছিল।

স্টিয়ারিং হাতে পেয়ে ওটাকে গায়ের জোরে আঁকড়ে ধরল পরমেশ। গাড়ি তো চালাতে হবেই—কিন্তু কোনদিকে সেটাই ও বুঝে উঠতে পারছিল না।

সুদেবের হাসি এখনও দিব্যি কানে আসছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে ও হাসছে। ওর দাঁত দেখা যাচ্ছে—করাতের মতো ধারালো ঝকঝকে দাঁত। এই দাঁত দিয়ে পরমেশের জীবনের খানিকটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে ও। তারপর চোখ বুজে তারিয়ে-তারিয়ে চিবোচ্ছে। ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে—দু-তিনটে গোটা রসগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার সময় যেভাবে রস গড়িয়ে পড়ে।

ওঃ!

যন্ত্রণায় ডুকরে উঠল পরমেশ। সুদেবের তাচ্ছিল্যের হাসি ওর বুকে পেরেক ঠুকছিল। এবং সেই পেরেকটা ধরে ধীরে-ধীরে মোচড় দিচ্ছিল কেউ।

ঝাপসা চোখে সামনে তাকাল ও। রিতুকে দেখতে পেল। রিতু ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পরমেশ মন শক্ত করল। ওর দিশেহারা অবস্থাটা একটু-একটু করে কেটে গেল। ঠিক দিকে সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে ওকে। যদি দিক ভুল হয়, সুচরিতা ওকে পথ দেখিয়ে দেবে।

pathagar.net

পরমেশ গাড়ি স্টার্ট দিল।

ত্রিযামা ওর পাশে বসেছিল। বিপন্ন গলায় জিগ্যেস করল, 'স্যার, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

পরমেশ মাথা নাড়ল : 'না, ঠিক আছে।'

বলল বটে, কিন্তু বুঝল কোনওকিছুই ঠিকঠাক নেই। মাথাটা যেন কেউ সিমেন্ট, বালি আর গিট্টি দিয়ে ঢালাই করে দিয়েছে। তারপর নিয়ম করে দ্রুত ছন্দে তার ওপরে হাতুড়ির বাড়ি মারছে। একইসঙ্গে জিভে উষ্ণ নোনতা স্বাদ আর চিটচিটে জ্বালা। চোখ দুটোও করকর করছে। খানিকটা লালচে হয়ে গেছে। বছরচারেক আগে পরমেশের গলব্লাডার অপারেশান হয়েছিল। এখন সেই জায়গাটাও যেন চিনচিন করে ব্যথা করছে।

পল্লব পিছনের সিটে বসে গরগর করছিল : 'ওই অসভ্য লোকটাকে ছাড়া উচিত হয়নি, স্যার। আপনি চেপে গেলেন দেখে আমিও...।'

'এখন চুপ কর তো!' পল্লবকে ঝাঁজিয়ে উঠল ত্রিযামা। তারপর পরমেশের বাঁহাতের ডানায় হাত রেখে জিগ্যেস করল, 'কোনও ডক্টর্স চেম্বারে যাবেন, নাকি বাড়ি যাবেন, স্যার?'

পরমেশ জড়ানো গলায় বলল, 'বাড়ি যাব।' তারপর গিয়ার দিয়ে গাড়ি এগিয়ে নিল। মারুতিটাকে ঘিরে থাকা ভিড় ফিকে হয়ে সরে গেল, পরমেশকে পথ করে দিল।

গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে তাকিয়ে বিরাট থালার মতো চাঁদ দেখতে পেল পরমেশ। তখনই ও প্রথম টের পেল, কখন যেন আকাশটা রাস্তার মতো ধূসর হয়ে গেছে।

ধীরে-ধীরে গাড়ি চালাতে লাগল পরমেশ। যে-করে-হোক ওকে প্রমিতা আর বুবুর কাছে পৌঁছতে হবে। তারপর প্রমিতাকে শোনাবে লাঞ্ছনা আর গ্লানির কাহিনি।

আজ যদি ত্রিযামা আর পল্লব ওর সঙ্গে না থাকত তা হলে কী হত সেটা ভাবতে চাইল পরমেশ। হয়তো প্রমিতা আর বুবুর সঙ্গে ওর কোনওদিনও আর দেখা হত না।

একটু পরেই পল্লব আর ত্রিযামাকে সঙ্গে নিয়ে পরমেশ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল, কলিংবেলের বোতাম টিপল।

প্রমিতা ম্যাজিক আই দিয়ে পরমেশকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি দরজা খুলল।

সদর দরজায় লাগানো বাতির আলোর ছটা পরমেশের গায়ে মাথায় পড়েছিল। ফলে ওর বিধ্বস্ত অবস্থাটা প্রমিতা প্রথম নজরেই দেখতে পেল। কিন্তু আশ্চর্য, প্রমিতা মোটেই অবাক হল না, বা আঁতকে উঠল না। পরমেশের চোখের কাবু দৃষ্টি, মুখের অসহায় ভাব ওকে যেন পলকে গোটা গল্পটা বুঝিয়ে দিল। ওদের

ভেতরে ডেকে নিয়ে প্রমিতা ব্যস্তভাবে তুলো, মারকিউরোক্রোম ইত্যাদি ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম জোগাড় করতে ছুট লাগাল। ত্রিযামা আর পল্লব পরমেশকে একটা ডাইনিং চেয়ারে বসিয়ে দিল।

পরমেশের পরিচর্যায় মিনিটপনেরো-কুড়ি কেটে গেল।

প্রমিতা লক্ষ করল, পরমেশ একটাও কথা বলছে না। শুধু দু-চোখ বুজে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। আর ওর একটা চোখের কোণ দিয়ে জলের রেখা গড়িয়ে পড়ছে।

অদ্ভুত কোন টেলিপ্যাথিতে প্রমিতা সব বুঝতে পারছিল। ও চুপ করে একমনে স্বামীর শুশ্রূষা করতে লাগল আর একটা ঠাণ্ডা রাগ ওর মনের ভেতরে সাপের ফণার মতো দুলতে লাগল। কে যেন ওর ভেতর থেকে বারবার বলে উঠছিল, সুদেব সামন্তকে ছোবল মারতেই হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা হয়ে যাওয়ার পর পরমেশকে শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে দিল প্রমিতা। পরমেশ ঘাড় হেঁট করে বাধ্য ছেলের মতো প্রমিতার সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে গেল। একটা খাঁ খাঁ শূন্যতা ওকে কেমন যেন স্থবির করে দিয়েছে। একজন বিভ্রান্ত পথিকের মতো অচেনা এক চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরমেশ। চিন্তার স্রোত থেমে গেছে—হয়তো মুছেও গেছে।

ড্রইং-ডাইনিং-এ ফিরে এসে ত্রিযামা আর পল্লবদের সঙ্গে বসল প্রমিতা। সৌজন্য করে চায়ের কথা বলল বটে, কিন্তু ত্রিযামা মিষ্টি হেসে আপত্তি করল : 'না, আন্টি—থ্যাংক য়ু।'

ওদের সঙ্গে আলাপ হল প্রমিতার।

ত্রিযামা আর পল্লব আগে কখনও স্যারের বাড়িতে আসেনি। তবে নিত্যনতুন ছাত্র আসাটা প্রমিতার অভ্যেস হয়ে গেছে। ও জানে, পরমেশের ডিপার্টমেন্টে তিন বছর—কি বড়জোর পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর ছাত্ররা পালটে যায়। কারণ, ওরা বি. টেক. কি এম. টেক. পাশ করে বেরিয়ে যায়।

কয়েকটা টুকরো কথার পর সুদেব সামন্তর প্রসঙ্গ উঠল।

প্রমিতা ওদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল যেন ও এ-বাড়ির কেউ নয়। ও বাইরের মানুষ হয়ে দত্তগুপ্ত পরিবারের বিপর্যয়ের কথা আলোচনা করছে। দুঃখ আর যন্ত্রণা সইতে-সইতে কোনও-কোনও মানুষ হঠাৎ-হঠাৎ এরকম অবস্থায় পৌঁছে যায়। তখন সে অনুভব করে সে আর বেঁচে নেই—তবে তার শরীরটা বেঁচে আছে এক সাংঘাতিক প্রতিশোধের টানে, কিংবা সুবিচারের টানে। যেভাবে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার টানে বন্দি আত্মা মাথা খুঁড়ে গুমরে মরে, হাহাকার করে, ঠিক সেইভাবে প্রমিতার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু অস্থির আকাঙ্ক্ষায় সুবিচারের অপেক্ষা করছিল।

প্রমিতা কথা বলল কম—ত্রিযামা আর পল্লবের কথা শুনল বেশি। ওরা বলল, কী হয়েছে আজ সন্ধ্যায়।

ত্রিযামা দেওয়ালে টাঙানো সুচরিতার ফটোটা দেখছিল আর স্যারের জন্য ওর মায়া বাড়ছিল। একটা কষ্ট চিনচিন করে বয়ে চলল ওর বুকের ভেতরে।

ও মাঝে-মাঝেই প্রশ্ন করছিল প্রমিতাকে, আর প্রমিতা নির্লিপ্তভাবে নিচু গলায় জবাব দিচ্ছিল।

পল্লব বারবার জিগ্যেস করছিল, 'আর কিছু করার নেই, কাকিমা?'

উত্তরে প্রমিতা মাথা নেড়েছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

মনে-মনে ও ভাবছিল, রিতু শেষ, থানা-পুলিশ শেষ, আদালত-উকিল শেষ—সব শেষ।

এখন শুধু একটা পথই বাকি—যে-পথে হাঁটতে গিয়ে পরমেশ আজ অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েছে।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে প্রমিতার চোখে মোটেও জল এল না। অথচ পনেরো দিন আগেও এর চেয়ে অনেক সহজ কথা ভাবতে গিয়ে ওর চোখে জল এসে যেত।

ত্রিযামা মেয়েটিকে বেশ ভালো লেগে গেল প্রমিতার। প্রাণবন্ত, ফুটফুটে, বুদ্ধিমতী। ওকে নিয়ে অনেক ছেলেই বোধহয় স্বপ্ন দ্যাখে।

ত্রিযামা বারবার আপশোস করছিল : 'কিছু একটা করা যায় না! কিছু একটা...।'

আর অনুগত পল্লব ওর কথায় সায় দিচ্ছিল।

প্রমিতার মনটা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এতজন যখন মন-প্রাণ দিয়ে কিছু একটা করতে চাইছে তখন কিছু একটা করা নিশ্চয়ই যায়।

সুদেব সামন্ত অমর নয়। যতই ও পাথরের তৈরি হোক সে-পাথরেও নিশ্চয়ই ফাটল ধরে।

প্রমিতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। কী যেন চিন্তা করল মনে-মনে। তারপর ত্রিযামাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা যখন বলছ, তখন কিছু একটা করব। আমরা সবাই মিলে কিছু একটা করব...।'

ত্রিযামার ফোন-নম্বর নিল প্রমিতা। তারপর যখন ও নিজেদের ফোন-নম্বর ত্রিযামাকে দিতে গেল তখন ত্রিযামা বলল, ফোন-নম্বর ওর কাছে আছে—স্যার দিয়েছেন।

চলে যাওয়ার সময় ত্রিযামা প্রমিতার হাত চেপে ধরল। তার মধ্যে কেমন যেন একটা আশ্বাস পেল প্রমিতা।

পল্লব বলল, 'দরকার পড়লেই আমাদের ডেকে পাঠাবেন, কাকিমা। আপনার একটা মোবাইল ফোন থাকলে ভালো হত। রাস্তায় কোথাও এমার্জেন্সি হলে ত্রিযামার

মোবাইলে একটা ফোন করে দিতেন। কারণ, ওই লোকটা সুবিধের নয়।'

প্রমিতা হাসল, বলল, ওর মোবাইল ফোন নেই।

কিন্তু পল্লবের কথাটা ওর মনে ধরল। সত্যি, একটা মোবাইল ফোন কেনা খুব জরুরি।

ত্রিযামা আর পল্লব চলে যেতেই বুবুর কথা মনে পড়ল ত্রিযামার। ওকে বিকেলে রোনাদের বাড়িতে দিয়ে এসেছিল। নিশ্চয়ই ছেলেটা খেলায় মেতে গেছে। আর রোনাও বুবুকে পেলে সহজে ছাড়তে চায় না।

বুবুকে গিয়ে একেবারে পাকড়াও করে নিয়ে আসতে হবে। নইলে ওদের বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য বায়না করবে।

এই কথা ভেবে শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল প্রমিতা। পরমেশকে বলে ও চট করে একবার সুধীরবাবুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে।

কিন্তু শোওয়ার ঘরে পৌঁছনোর আগেই প্রমিতা একটা শব্দ পেল—শক্ত কোনও কিছু মাটিতে আছাড় মারার শব্দ। একবার...দুবার...তিনবার...।

'কী হল? কী হল?' বলে প্রায় ছুটে শোওয়ার ঘরের দরজায় পৌঁছে গেল প্রমিতা।

দেখল, ইজি ক্রাঞ্চ ব্যায়ামের যন্ত্রটাকে ধরে পাগলের মতো মাটিতে বারবার আছাড় মারছে পরমেশ। বড়-বড় শ্বাস ফেলছে, হাঁপাচ্ছে।

প্রমিতা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই ওর দিকে শূন্য চোখে তাকাল পরমেশ। তারপর বোকার মতো ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

একটা বছরের বাচ্চা ছেলেটার দিকে মায়ের মমতা মাখা চোখে তাকাল প্রমিতা। তারপর কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরল।

pathagar.net

বারো

pathagar.net

সুযোগ পেলেই সুদেব সামন্তর পিছু নেয় প্রমিতা। তবে ওর দোকানের কাছে গিয়ে মোটেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে না। বরং রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট কিংবা নীরোদবিহারী মল্লিক রোড ধরে দিনের মধ্যে অন্তত বারপাঁচ-ছয়েক যাতায়াত করে। কখনও-কখনও সুদেবকে ও দেখতে পায়—কখনও পায় না। সুদেব প্রমিতাকে লক্ষ করলেও ওদের চোখাচোখি হয়নি। হয়নি যে তার একটা কারণ, প্রমিতা সুদেবের সঙ্গে নজর মেলানোর সাহস পায়নি। কেমন একটা ঠান্ডা আতঙ্ক ওকে কাবু করে দিয়েছে। বুকের ভেতরে ধুপধাপ শব্দ শুরু হয়ে গেছে। পেটের ভেতরটা আচমকা ফাঁকা হয়ে গিয়ে মুচড়ে উঠেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমিতা নিজেকে তৈরি করছিল ধীরে-ধীরে। সুদেবের চোখে চোখ রেখে ওকে তাকাতেই হবে—পারতেই হবে ওকে। তবেই ও একদিন সুদেবের চোখে জ্বালা, যন্ত্রণা, ভয় দেখতে পাবে। আর সেদিন সুদেবের এখনকার দৃষ্টি থাকবে প্রমিতার চোখে।

প্রমিতার এই ঘোরাঘুরির কোনও সময় থাকে না। রোজকার অভিজ্ঞতায় ও দেখেছে, কোনও রুটিন না থাকাটাই সবচেয়ে ভালো রুটিন।

মাসখানেক এইরকম পাগলামির পর সুদেবের জীবনযাত্রার একটা ছক খুঁজে পেয়েছে প্রমিতা। দোকানের কাজের বাইরে সময় পেলে সুদেব এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মনের মতো মেয়ে খুঁজে বেড়ায়। আর ওর বেশি টান ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর দিকে।

এ ছাড়া আরও একটা অভ্যেস আছে সুদেবের : সপ্তাহে অন্তত দু-দিন ও মেয়েদের স্কুলে বা কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—একমনে সিগারেট খায় আর মেয়েগুলোকে চাটে।

একদিন বিকেলে বিধাননগর কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুদেব সামন্ত। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে চুপচাপ চুইংগাম চিবোচ্ছিল। প্রমিতা অনেকটা দূরে একটা সাইকেল রিকশার আড়ালে দাঁড়িয়ে সুদেবকে লক্ষ করছিল।

কলেজ থেকে বেরোনো তিনটে মেয়েকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল সুদেব।

মেয়েগুলোর বয়েস উনিশ কি কুড়ি। সুন্দর চেহারা। গায়ে রংচঙে আধুনিক পোশাক। একজনের জিন্‌সের প্যান্ট আর কালো টপের মাঝে তিন ইঞ্চি ফাঁক। দেখা যাচ্ছে নাভি, আর তিন ইঞ্চি ফরসা কোমল চামড়ার পটি।

ওরা কোনাকুনিভাবে গোলচক্করটা পেরিয়ে উলটোদিকের ফুটপাতে এসে দাঁড়াল।

সুদেবও গাছের ছায়া ছেড়ে ওদের দিকে এগোল। ওর চোখ ছোট, ঠোঁট সামান্য ফাঁক। চুইংগাম চিবোতে ভুলে গেছে। শুধু একমনে মেয়েগুলোকে দেখছে।

মেয়ে তিনটে সুদেবকে মোটেই খেয়াল করেনি। সুদেব কেন, চারপাশের কোনও ব্যাপারেই ওদের হুঁশ নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে কলকল করে গল্প করছে, হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে, এ ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, মুখের ওপর থেকে চুল সরাচ্ছে। সুন্দর বিকেলে উনিশ-কুড়ি যেরকম হয়।

মেয়েগুলোর ভরা স্বাস্থ্য দেখে সুদেব আর চোখ সরাতে পারছিল না। ওর নজর চুম্বকের মতো ওদের শরীরে আটকে ছিল।

প্রমিতা দম বন্ধ করে সুদেব সামন্তকে দেখছিল। ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল বারবার।

সামনের চওড়া রাস্তার দুপাশে বড় বড় সুন্দর বাড়ি। তবে বাড়িগুলোয় তেমন সাড়াশব্দ নেই। বেশিরভাগ বাড়ির বারান্দাগুলো খাঁ-খাঁ। দেখে মনে হয়, বাড়িগুলোয় কেউ থাকে না। কয়েকটা বাড়ির সামনে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ফুটপাত বরাবর লম্বা লম্বা গাছ কৃষ্ণচূড়া, সজনে, শিমুল, রাধাচূড়া। গাছ থেকে গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখি। গাছের মাথায় মরা রোদ।

রাস্তা দিয়ে কখনও সখনও দু-একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। বাস কিংবা অটোও চোখে পড়ছে অনেকক্ষণ পরপর। রাস্তায় ভিড় বেশি নেই। যেটুকু ভিড় সেটা কলেজের ছাত্রদের জন্য। সেটাও আবার খুব তাড়াতাড়ি ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বাস কিংবা অটো পেয়েই যে যেমন পারে উঠে পড়ছে।

অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী চটপট চলে গেলেও এই তিনজন ছাত্রীর যেন কোনও তাড়া নেই। ওরা গল্পে-হাসিতে এতই মশগুল যে, সময়কে তোয়াক্কা করার সময় নেই।

যে ফুটপাতে মেয়ে তিনটে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছিল তার গায়েই একটা বিশাল খোলা মাঠ। মাঠটা কংক্রিটের খাটো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তবে ফুটপাতের দিকে পাঁচিলের খানিকটা অংশ ভাঙা। তার কাছাকাছি রাবিশের স্তূপ।

সুদেব পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে প্রমিতা হঠাৎ দেখল, সুদেব ভাঙা জায়গাটা দিয়ে মাঠের ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর ডানদিকে ঘুরে কয়েক পা হেঁটে পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়াল। এখন ওর কাছ থেকে মেয়েগুলোর দূরত্ব সবচেয়ে কম—বড়জোর পাঁচ-ছ' হাত।

পাঁচিলটা সুদেবের কোমর ছাড়িয়ে সামান্য উঁচুতে শেষ হয়েছে। ওকে পুরোপুরি দেখতে না পেলেও প্রমিতা বুঝতে পারছিল ও কী করতে চলেছে। অন্তত ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা প্রমিতাকে সেইরকমই ইঙ্গিত দিয়েছে।

প্রমিতার অস্বস্তি হচ্ছিল। অন্ধকারের আড়ালে অনেক পুরুষই হয়তো ওই পাঁচিলটার গায়ে 'ছোট বাইরে' সেরে ফেলবে, কিন্তু এখন যে দিব্যি আলো রয়েছে!

সুদেব ওর কাজ সারছিল আর স্থির চোখে মেয়েগুলোকে চেটেপুটে নিচ্ছিল।

যতই অস্বস্তি হোক, প্রমিতা কিন্তু সুদেবের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়নি।

pathagar.net

ওর মেয়ের খুনির স্বভাবটা ও ভালো করে বুঝতে চাইছিল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সুদেবের এতক্ষণ লাগছে কেন!

সাইকেল রিকশার আড়াল ছেড়ে ফুটপাত ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল প্রমিতা। একটা গাছের পাশ দিয়ে সুদেবকে দেখতে লাগল।

পিছনদিকে, পাঁচিলের ওপাশে, দাঁড়িয়ে থাকা সুদেবকে মেয়েগুলো খেয়ালই করেনি। ওরা 'হা-হা হি-হি' চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সুদেবকে লক্ষ করতে-করতে প্রমিতার মুখ বদলে যাচ্ছিল। ওর ভুরু কুঁচকে গেল, কপালে ভাঁজ পড়ল।

কী করছে সুদেব? ওর এতক্ষণ লাগছে কেন?

সুদেবের মুখ-চোখ যেন কেমন হয়ে গেছে। ফরসা মুখ লালচে। শরীরটা একটা দ্রুত ছন্দে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে বারবার। ওকে দেখে মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

কী করছে ও?

প্রশ্নের উত্তরটা বিদ্যুৎঝলকের মতো আচমকা ঝলসে উঠল প্রমিতার মনে। ও বুঝতে পারল, পাঁচিলের আড়ালে কী করছে সুদেব।

সঙ্গে-সঙ্গে গা ঘিনঘিন করে উঠল প্রমিতার। একদলা থুতু চলে এল মুখের ভেতর।

সেইসঙ্গে ভয়ও পেল।

ওয়াক তুলে রাস্তায় থুতু ফেলল প্রমিতা। তারপর জোর পায়ে হাঁটা দিল। যেন এক্ষুনি সুদেবের কাছ থেকে ওকে অনেক দূরে পালাতে হবে।

গা-টা গুলিয়ে উঠছিল বারবার। মাথাটাও চক্কর কাটছিল। সামনের বাড়ি-ঘর গাছপালা এদিক-ওদিক টলে যাচ্ছিল।

নিজের ওপর আর ভরসা রাখতে পারল না প্রমিতা। পথচলতি একটা সাইকেল রিকশাকে ইশারায় দাঁড় করাল। তারপর তাতে উঠে বসল।

এখন একটু বিশ্রাম দরকার। সল্ট লেকের ফাঁকা রাস্তায় রিকশা করে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালে খোলা হাওয়ায় শরীরটা থিতু হতে পারে।

'কোথায় যাবেন?' রিকশাওয়ালা জিগ্যেস করল।

কী জবাব দেবে প্রমিতা? এ-কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না, আমি তোমার রিকশায় চেপে এমনি একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াব। তার চেয়ে বরং...।

'আমি সল্ট লেকের বাড়িগুলোর ডিজাইন দেখব। মানে...।'

রিকশাওয়ালা একগাল হেসে বলল, 'বুঝেছি, নতুন বাড়ি করছেন নিশ্চয়ই! চলেন, আপনাকে এ-ক্লাস কতগুলো ডিজাইন দেখাই—।'

রিকশা চলতে শুরু করল। আর প্রমিতা সামান্য কাত হয়ে রিকশার হাতলে ভর রেখে চোখ বুজল। এই টেনশান আর দুশ্চিন্তা ওকে পাগল করে দিচ্ছে। কিন্তু

পাগল হলে তো চলবে না। সামনে যে একটা বড় কাজ! নইলে রিতুর আত্মা শান্তি পাবে না। ও রাতে ঘুমের ঘোরে দেখা দিয়ে প্রমিতাকে বারবার একই কথা বলে যায়।

বিকেলের বাতাসে প্রমিতার বেশ আরাম লাগছিল। এভাবে দু-তিন ঘণ্টা ঘুরতে পারলে বেশ হত। কিন্তু উপায় নেই। ঠিকে কাজের মাসি আসবে ছ'টা নাগাদ। আর পরমেশ ফিরবে সাতটা কি সাড়ে সাতটায়।

সুদেব সামন্তকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে প্রমিতা। এরকম ভয়ঙ্কর বিকৃত একটা জানোয়ার মানুষের মুখোশ পরে সমাজে দিব্যি মিশে রয়েছে! কেউ ওকে কিছু করতে পারছে না! ও বেঁচে থাকলে রিতুর মতো আরও কত ফুটফুটে মেয়ে নৃশংসভাবে খতম হয়ে যাবে। কেউ কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু কিছু তো একটা করা দরকার!

'দরকার' শব্দটা মাথায় আসতেই প্রমিতার আর-একবার মনে হল, ওর একটা মোবাইল ফোন কেনা দরকার। সেদিন পল্লব ঠিকই বলেছে। প্রমিতা যখন বাইরে-বাইরে এইরকম বিপজ্জনক কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন বিপদে-আপদে পরমেশ কিংবা শ্যামাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা খুবই জরুরি। নাঃ, দু-চারদিনের মধ্যেই ও একটা মোবাইল ফোন কিনে ফেলবে। কেনার সময় ও অরিনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। সুচরিতার যেরকম মোবাইল ছিল হুবহু সেই মডেলের মোবাইল কিনবে। তারপর অরিনকে বলে রিং টোনটাও রিতুর রিং টোনের মতো করে নেবে। তা হলে মনে হবে, রিতু সবসময় ওর কাছে-কাছে আছে।

ক্লান্তি এবং মানসিক চাপ---ধীরে-ধীরে দুটোই কমে এল প্রমিতার। এবার ও চোখ মেলে সত্যিই বাড়ির ডিজাইন দেখতে লাগল।

বিকেল মরে এসেছে। বাতাস আরও ঠান্ডা আরও ফুরফুরে হয়েছে। রিকশা এখন কোন ব্লক দিয়ে চলেছে কে জানে! সল্ট লেক এমনিতে প্রমিতার খুব চেনা নয়। তবে বাড়ি ফেরাটা মোটেই সমস্যার হবে না। শুধু রিকশাওয়ালাকে মেন রোডে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেই হবে।

প্রমিতা একটা বাড়ির নেমপ্লেটের দিকে অলসভাবে তাকাল। এ-ই ব্লক। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তার পাশের বাড়ির খোলা বারান্দার দিকে চোখ গেল ওর। মার্বেল বাঁধানো বারান্দায় তিনটে ছেলে-মেয়ে খেলা করছে।

তার মধ্যে একটি মেয়ে প্রমিতার ভীষণ চেনা।

যদিও প্রমিতা মেয়েটির ছবি মাত্র একবার দেখেছে, তবুও ওকে ভোলা মুশকিল। কারণ, এইরকম ফুটফুটে পরির মতো সুন্দর মুখ কখনও ভোলা যায় না।

টুপুর!

'অ্যাই রিকশা, থামাও—থামাও!'

pathagar.net

রিকশাওয়ালা আচমকা ব্রেক কষতেই ঝটিতি রিকশা থেকে নেমে পড়ল প্রমিতা। হাতব্যাগ খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দিল হতবাক লোকটার হাতে। তারপর প্রায় দৌড়ে এসে এল সুন্দর দোতলা বাড়িটার কাছে।

সদর দরজার গ্রিলে মুখ লাগিয়ে দাঁড়াল। স্তম্ভিত চোখে টুপুরকে দেখতে লাগল।

এই বারো বছরের মেয়েটা না গতবছর শিলিগুড়িতে মারা গিয়েছিল!

তাই তো বলেছিলেন রুমকি সান্যাল!

রুমকির ঠিকানাটা পরমেশের কাছ থেকে নিয়েও ছিল প্রমিতা। দু-একবার ভেবেছিল ওঁর বাড়িতে যাবে, সুখ-দুঃখের গল্প করবে। কিন্তু পরমেশই বারবার ওকে নিরস্ত করেছে। বলেছে, 'গিয়ে কী লাভ? ওসব কথা আলোচনা করলে তোমরা দুজনেই আবার ডিসটার্বড্ হবে।'

এসবের মানে কী?

নাকি এই মেয়েটা হুবহু টুপুরের মতো দেখতে? কিংবা টুপুরের যমজ বোন?

তবুও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

প্রমিতার বুকের ভেতরে মেঘ ডাকতে শুরু করল। ও একটা ঘোরের মধ্যে লোহার গেটের পাল্লা ঠেলে ফাঁক করল। ভেতরের চাতালে কয়েক পা ঢুকে থমকে দাঁড়াল। একটা আবছা ডাক বেরিয়ে এল ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

'টুপুর!'

টুপুর বেশ কিছুক্ষণ ধরেই প্রমিতাকে লক্ষ করছিল। এবার বারান্দার সিঁড়ির ধাপের কাছে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল। জিগ্যেস করল, 'আপনি কে?'

প্রমিতার ভেতরে একইসঙ্গে আনন্দ আর দুঃখের বাতাস বইতে লাগল।

টুপুরের কিছু হয়নি। ও সুন্দর পৃথিবীতে প্রাণভরে বেঁচে আছে। কিন্তু প্রমিতা আবার 'একা' হয়ে গেল। ওর চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছে এমন কাউকে ও আর খুঁজে পেল না।

অন্য ছেলে-মেয়ে দুটিও খেলা থামিয়ে প্রমিতাকে দেখছিল।

প্রমিতা তখনও টুপুরের প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারেনি।

টুপুর আবার জিগ্যেস করল, 'কে আপনি? কাকে চান?'

প্রমিতা তখনও চুপ। ওর বুকের ভেতরে তখনও মেঘ ডাকছে।

টুপুর তখন বাড়ির একটা খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মা-মণি, কে যেন ডাকছে—।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা মুখ সেই খোলা জানলায় চলে এল। সাদা রঙের গ্রিলের আড়াল ডিঙিয়ে মুখটাকে অনায়াসে চিনতে পারল প্রমিতা।

রুমকি সান্যাল।

এখন প্রমিতার মনে পড়ল, সদর দরজার নেমপ্লেটে 'সান্যাল' শব্দটা ও দেখেছে।

গ্রিলের ভেতর থেকে হাসলেন রুমকি। বললেন, 'এক মিনিট, মিসেস দত্তগুপ্ত। আসছি---।'

জানলার পাশের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন রুমকি। পরনে নীল-সাদা ডিজাইন ছাপা একটা হাউসকোট। ভেতরে খয়েরি রঙের একটা ম্যাক্সি চোখে পড়ছে।

অন্য ছেলে-মেয়ে দুটোকে চাপা গলায় কী যেন বললেন রুমকি। ওরা চট করে বারান্দা থেকে নেমে এল। প্রমিতার পাশ দিয়ে চলে গেল সদরের দিকে। বোধহয় আশপাশের বাড়ির ছেলে-মেয়ে। বিকেলে টুপুরের সঙ্গে খেলতে এসেছে।

প্রমিতা তখনও ছবির মতো দাঁড়িয়ে। মা আর মেয়েকে হতবাক চোখে দেখছে। এই সংসারে তা হলে কোনও চিড় ধরেনি! সবকিছুই ঠিকঠাক আছে!

'কী হল, মিসেস দত্তগুপ্ত! আসুন, ভেতরে আসুন—।'

প্রমিতা তখনও পাথর।

রুমকি বারান্দার দু-ধাপ সিঁড়ি নেমে চাতালে এলেন। যেন কতদিনের চেনা এমন ঢঙে প্রমিতার হাত চেপে ধরলেন। তারপর ওকে টেনে নিয়ে চললেন বাড়ির দিকে : 'ভেতরে চলুন—আপনাকে সব এক্সপ্লেইন করছি। এত অবাক হওয়ার কিছু নেই—।'

অবাক হওয়ার কিছু নেই! আপনার সঙ্গে আমার যে আর কোনও মিল রইল না—তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই!

এসব কথা ভাবলেও রুমকির সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গেল প্রমিতা।

আকাশে মেঘ জমছিল। কালো আর হালকা লাল। বৃষ্টি হতেও পারে। ক'দিন ধরেই কিছু সময় ছাড়া-ছাড়া অল্পবিস্তর বৃষ্টি হচ্ছে। প্রমিতা ছাতা নিয়ে বেরোয়নি। এমনিতেই ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরার একটা টেনশান ছিল। তার ওপর এই নতুন ধাঁধাটা ওর সবকিছু ওলটপালট করে দিল।

সবমিলিয়ে প্রমিতার মনে হল, এত কাণ্ডের পর ও নিজের বাড়িটা ঠিকঠাক চিনতে পারবে তো!

রুমকি ওকে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

ছিমছাম ড্রইংরুম। ধবধবে সাদা দেওয়াল। সবচেয়ে দূরের দেওয়ালে বরফি চেহারার একটা ওয়াল-হ্যাঙার। ছুঁচ-সুতোর কাজে মধুবনী ছবি।

ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে আধুনিক ছাঁদের ঝাড়লণ্ঠন। আর ডানদিক ঘেঁষে সেন্টার টেবিল আর লম্বা ধরনের সোফা-সেট। তাতে চৌকো কুশন সাজানো।

টুপুরকে কাছে ডাকলেন রুমকি। বললেন, 'আন্টির জন্যে একটু ঠান্ডা জল নিয়ে আয় তো।'

টুপুর চোখ বড়-বড় করে অচেনা এই আন্টিকে দেখছিল। মায়ের কথায় জল

pathagar.net

নিয়ে আসতে ভেতরে গেল।

রুমকি ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিলেন।

প্রমিতা ইতস্তত করে বলল, 'টুপুর....টুপুর....।'

হাত তুলে ওকে বাধা দিলেন রুমকি। বললেন, 'একটু রেস্ট নিন, সব বলছি। এতটা আপসেট হওয়ার কিছু নেই।' তারপর মাথা সামান্য নিচু করে সেন্টার টেবিলের কালো কাচের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় অপরাধী-সুরে বললেন, 'সেদিন আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আমাদের মিসহ্যাপের যে-গল্পটা শুনিয়েছিলাম সেটা পুরোটাই ফিক্‌টিশাস—বানানো।'

'মানে...মানে...শিলিগুড়ি...সত্যব্রত সেন...অজিত সিং...সব...।'

'হ্যাঁ, সব বানানো।' হাসলেন রুমকি। ওঁর বাঁ গালের আঁচিলটা নড়ল। প্রমিতার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আপনার হাজব্যান্ডের রিকোয়েস্টে সব বানানো। ইট ওয়জ ইয়োর হাজব্যান্ড্‌স আইডিয়া। তবে আমার, অপরূপ আর টুপুরের নাম-টামগুলো সত্যি। আমি সত্যিকারের সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আর আমার হাজব্যান্ডও সত্যি-সত্যি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার—আছেও একটা কনস্ট্রাকশান কোম্পানিতে। এখন ও বাড়িতে নেই। থাকলে আপনার সঙ্গে অবশ্যই আলাপ করিয়ে দিতাম। আসলে শুধু ওই...গ্যাংটক...শিলিগুড়ি....আর মিসহ্যাপের ব্যাপারটা বোগাস। উই আর অ্যাবসোলিউটলি ও. কে., মিসেস দত্তগুপ্ত।'

টুপুর জলের গ্লাস নিয়ে এল। সঙ্গে শৌখিন কাচের প্লেট—তাতে চারটে মিষ্টি। প্লেট আর গ্লাস সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে টুপুর প্রমিতাকে বলল, 'খেয়ে নাও, আন্টি।'

টুপুরের মিষ্টি মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল প্রমিতা। কী আশ্চর্য! এই মেয়েটা ওর কাছে রেপ্‌ড অ্যান্ড মার্ডারড্‌ ছিল। আর এখন আঁচড়হীন বেঁচে উঠেছে! সুন্দরভাবে বেঁচে আছে!

প্রমিতার চোখে জল এসে গেল। উঃ! কতদিন যে ও টুপুরের কথা ভেবেও চোখের জল ফেলেছে! কিন্তু রুমকিকে সেসব কথা বলে লাভ নেই।

হঠাৎই টুপুরকে কাছে টেনে নিল প্রমিতা। একেবারে জাপটে ধরে আদরে-আদরে অস্থির করে তুলল ওকে। যেখানে-সেখানে চুমু খেতে লাগল, আর চাপা স্বরে বলতে লাগল, 'টুপুর...টুপুর...টুপুর...।'

আসলে প্রমিতা ভেতরে-ভেতরে 'রিতু-রিতু' বলছিল। তবে বুঝতে পারছিল, রিতুর ব্যাপারটা এরকম বানানো গল্প নয়। আর সেইজন্যই ওর প্রবল কান্না পাচ্ছিল।

টুপুর আচমকা এই আদরের জন্য তৈরি ছিল না। তা ছাড়া বারো বছর বয়েসে এ ধরনের বাচ্চা-বাচ্চা আদর মোটেই মানানসই নয়। তাই ও অস্বস্তি পাচ্ছিল।

আলতো করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। তখনই ও দেখল, প্রমিতার চোখে জল।

একটু পরে টুপুরকে ছেড়ে দিল প্রমিতা। চোখ মুছল। নাক টানল কয়েকবার। লাল নাকের ডগা লালচে দেখাচ্ছিল। টেবিলে রাখা মিষ্টির প্লেটের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে প্রমিতা ভাঙা গলায় বলল, 'এত মিষ্টি আমি খেতে পারব না।'

টুপুর অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। ও আঙুল তুলে শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'খেতেই হবে, আন্টি। আমি কাউকে মিষ্টি এনে দিলেই দেখি সে শুধু বলে, এত মিষ্টি খেতে পারব না।'

টুপুরের কথায় বিষণ্ণ হাসল প্রমিতা। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে—তুমি যখন বলছ—।'

রুমকি এবার টুপুরকে বললেন, 'টুপুর, তুমি যাও। হাত-মুখ ধুয়ে হোমটাস্ক শুরু করো। আমি আন্টির সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলে আসছি।'

টুপুর ভেতরে চলে যেতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রুমকি। বললেন, 'নিজেকে ভীষণ গিলটি মনে হচ্ছে, মিসেস দত্তগুপ্ত। বাট য়ু নো, ইট ওয়জ ইয়োর হাজব্যান্ড্স আইডিয়া, অ্যাজ আই টোল্ড য়ু। উনি বারবার বলছিলেন, আমি এই অ্যাক্টিংটুকু করলে আপনি স্টেব্‌ল হতে পারবেন। বিকজ শক ওয়জ রুইনিং ইয়োর লাইফ।'

প্রমিতা ভাবলেশহীনভাবে রুমকির কথা শুনছিল।

সুচরিতার ব্যাপারটা প্রথমদিকে পরমেশ কাউকেই ভেঙে বলেনি। পরে প্রমিতার অসহায় অবস্থা ওকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দেয়। ওর মনে হতে থাকে, শোকে পাগল প্রমিতা হয়তো কোনদিন নিজের সর্বনাশ করে বসবে। দুশ্চিন্তায় দিশেহারা পরমেশ সায়েন্স কলেজের কয়েকজন বন্ধুকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানায়। তখন পরমেশের এক বন্ধু প্রথম এই আইডিয়াটা দেয়। তারপর একজন কমন ফ্রেন্ডের থ্রু-তে ব্যাপারটা অপরূপ জানতে পারেন। ওঁর মনে হয়, মানবিকতার খাতিরে কিছু একটা করা উচিত। রুমকি একসময় অভিনয়-টভিনয় করতেন। একদিন রুমকি আর অপরূপ বাড়িতে বসে ডিসকাস করতে-করতে ব্যাপারটা ফাইনাল শেপ নেয়। তখন ওরা পরমেশের সঙ্গে আলোচনা করে সবকিছু সেট্‌ল করে।

তারপর তো সবটাই প্রমিতার জানা।

পরমেশ যেদিন সুদেব সামন্তর কাছে মার খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল, সেদিন প্রমিতার মনে হয়েছিল, এরকমটা যে হবে তা ও জানত। তাই ও এতটুকু অবাক হয়নি, হইচই করেনি। বরং বুঝতে পেরেছে, ঠান্ডা মাথায় কিছু একটা ওকে করতে হবে। এমন কিছু একটা যা সুদেব সামন্ত রুখতে পারবে না।

কিন্তু প্রমিতা পুরোপুরি ঠান্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারেনি। যখনই কিছু একটা করার কথা ভেবেছে তখনই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে মাথার ভেতরে—আর সবকিছু

pathagar.net

কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে।

তাই এতদিন পর্যন্ত ও শুধু সাহস করে সুদেবের পিছু নিতে পেরেছে। তার বেশি এগোতে পারেনি।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, প্রমিতা সত্যি-সত্যি ঠান্ডা পাথর হয়ে গেল।

কী ঠকানো গল্প দিয়ে সমবেদনা জানানো!

ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেল প্রমিতা। না, পরমেশকে ও কোনও কথা বলবে না। শুধু রিতুকে সব বলবে। রাতে স্বপ্নের মধ্যে রিতু যখন দেখা করতে আসবে তখন ও সব বলবে মেয়েকে।

নিজেকে অবাক করে চারটে মিষ্টিই খেয়ে ফেলল প্রমিতা। তারপর জল খেল। খালি পেটে কখনও লড়াই করা যায় না। ওকে শক্ত হতে হবে। আঘাত সইতে হবে। আঘাত করতেও হবে।

রুমকি সান্যাল অপরাধীর মতো ইনিয়েবিনিয়ে কীসব বলছিলেন, কিন্তু প্রমিতার কানে সেসব কথা একফোঁটাও ঢুকছিল না।

সৌজন্যের 'ধন্যবাদ' জানিয়ে ও বেরিয়ে এল রুমকিদের বাড়ি থেকে। রুমকি বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'আবার আসবেন—সবাইকে নিয়ে আসবেন।'

এ-কথায় প্রমিতা শুধু চোখ তুলে রুমকির দিকে দেখল—কোনও জবাব দিল না।

বাইরের রাস্তায় এসে এদিক-ওদিক তাকাল প্রমিতা। বুঝতে চাইল. বড় রাস্তাটা কোনদিকে।

আকাশে মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাল। ওপরে তাকিয়ে মেঘের চেহারা দেখল প্রমিতা। নাঃ, কিছু করার নেই—বৃষ্টি আসছেই।

একজন রিকশাওয়ালাকে জিগ্যেস করে জানল, বড় রাস্তাটা কাছেই। তখন সেদিকে হাঁটা দিল প্রমিতা। হাতঘড়ির দিকে ওর আর তাকাতে ইচ্ছে করল না। সময় জানার সময় চলে গেছে।

হঠাৎই বড়-বড় ফোঁটায় বেশ জোরে বৃষ্টি নামল।

রাস্তার লোকজন মাথা বাঁচানোর তাগিদে যে যেদিকে পারল ছুট লাগাল।

কিন্তু প্রমিতা বৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে নিশ্চিন্তে হেঁটে চলল। কারণ, ও জানে, বৃষ্টিতে ভিজলে পাথরের কিছু হয় না।

তেরো

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর পরমেশ বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল, আর মাঝে-মাঝেই আড়চোখে প্রমিতার দিকে দেখছিল।

প্রমিতা ডাইনিং টেবিলের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিল। টেবিলে রাখা একটা ছোট রেডিয়ো। রিতু সবসময় এই পুঁচকে রেডিয়োটা নিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াত।

শোওয়ার ঘরের দরজা দিয়ে ডাইনিং স্পেসের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। ঠিক যেন ফ্রেমে বাঁধানো একটুকরো ছবি। সেই ছবিতে বিষণ্ণ ভাস্কর্যের মতো প্রমিতা।

আজ সন্ধে থেকেই প্রমিতাকে কেমন যেন মনমরা গম্ভীর দেখাচ্ছে। পরমেশ কোনও কথা বললে প্রমিতা খুব সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছে। ওর মুখের ভাবসাব এতটুকু বদলাচ্ছে না।

পরমেশের কাছে ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় লাগছিল। ও মনে-মনে আঁচ করতে চাইছিল, এমন কী হয়েছে যার জন্য প্রমিতা এত নিষ্প্রাণ, থমথমে।

অনেকক্ষণ ওকে লক্ষ করার পর পরমেশ ওকে ডাকল, 'অ্যাই—প্রমি—শোবে এসো—।'

প্রমিতা ঘরের সিলিংয়ের দিকে চেয়ে ছিল। পরমেশের ডাকে চোখ নামাল, মরা মাছের চোখে তাকাল স্বামীর দিকে।

পরমেশ হাতের ইশারা করল ওকে : 'কী হল? এসো...রাত হয়ে গেছে।'

রেডিয়ো অফ করে দিল প্রমিতা। রোবটের মতো উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রাণহীন পায়ে হেঁটে সুইচবোর্ডের কাছে গেল। ডাইনিং স্পেসের আলো-পাখা অফ করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকার ওকে জড়িয়ে ধরল।

ডাইনিং স্পেসের ছায়া থেকে শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল প্রমিতা। অর্ধেক আলো অর্ধেক ছায়ায় ওকে অলৌকিক দেখাচ্ছিল। পরমেশ একটু অবাক চোখে ওকে দেখতে লাগল।

প্রমিতা শোওয়ার ঘরের টেবিলের কাছে গেল। টেবিল থেকে খবরের কাগজ আর চশমাটা হাতে নিল। বিছানায় দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত বুবুর দিকে একবার তাকাল।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রমিতা। বয়েসটা কম হলে পৃথিবীতাপের মোকাবিলা কত সহজে করা যায়! আর বয়েসটা পঁয়তাল্লিশ হলে বুকের ভেতরটায় কেউ নারকেল-কোরানি দিয়ে কোরাতে থাকে। যেমন প্রমিতার কোরাচ্ছে।

'কী হয়েছে তোমার?' আলতো নরম গলায় জিগ্যেস করল পরমেশ।

প্রমিতা ঠোঁট টিপে মাথা নাড়ল : 'না, কিছু না....।'

pathagar.net

বিছানায় উঠে পড়ল। শুয়ে পড়ল পরমেশের পাশে। চোখে চশমা লাগিয়ে খবরের কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে।

বাইরে আকাশে মেঘ ডাকল। আবার হয়তো বৃষ্টি আসবে।

পরমেশ চশমা খুলল। হাতের বইটা আর চশমাটা বালিশের পাশে রেখে প্রমিতার দিকে ফিরল। ওর থুতনি ছুঁয়ে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, প্রমি?'

খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে প্রমিতা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'কিছু না।'

'কেউ তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?'

'না—।'

পরমেশ প্রমিতার প্রোফাইলের ক্লোজ আপ দেখতে পাচ্ছিল। ওর ডানদিকের চোখে চাপা অভিমান খুঁজে পেল। ওর গালে আঙুল ঘষতে-ঘষতে পরমেশ ডাকল গাঢ় স্বরে, 'প্রমি—।'

প্রমিতা ভেবেছিল পরমেশকে কিছু বলবে না, কিন্তু ওর ভেতরের অভিমানের আঁচে জেদটা ধীরে-ধীরে গলে যাচ্ছিল। ওর হাত থেকে খবরের কাগজটা খসে পড়ল বিছানায়। ঘরের সিলিংয়ের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই গালের ওপরে চলতে থাকা পরমেশের আঙুলগুলো ও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

ভেবেছিল রিতুকে সব বলবে। কিন্তু ঘুম এলে তারপর তো স্বপ্ন—সেই স্বপ্নের মধ্যে আসবে রিতু। তারপর মামের সঙ্গে কথা বলবে।

কিন্তু কোথায় ঘুম! একটা অস্থির জ্বালা-পোড়া প্রমিতার ভেতরে ছটফটিয়ে মরছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিল প্রমিতা। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আজ আমি টুপুরদের বাড়িতে গিয়েছিলাম....।'

পরমেশ যেন ইলেকট্রিক শক খেল। ও চট করে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইল। স্তম্ভিত হয়ে অবাক চোখে প্রমিতার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি টুপুরদের বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—।' প্রমিতা তখনও ঘরের সিলিংয়ের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে।

পরমেশ প্রমিতার বাঁধন থেকে আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিল। প্রমিতার মুখটা নিজের দিকে ঘোরাতে চাইল।

প্রমিতা প্রথমটা শক্ত হয়ে ছিল। তারপর ধীরে-ধীরে শরীরটা নরম করল। মুখটা সামান্য হেলিয়ে ঠান্ডা চোখে তাকাল স্বামীর দিকে।

'তুমি আমার সঙ্গে এইরকম নাটক করতে গেলে কেন?'

'বিশ্বাস করো, তোমার অবস্থা আমি আর সইতে পারছিলাম না।' পরমেশের গলা হঠাৎই ধরে গেল।

'টুপুরের যদি সত্যি-সত্যি আমাদের রিতুর মতন কিছু হয়, সেটা ওই রুমকি সান্যাল সইতে পারবে?'

পরমেশ কোনও জবাব দিতে পারল না।

প্রমিতা অনেকটা আনমনাভাবে নিচু গলায় বলল, 'সেরকম কিছু হলে ওর ঠোঁটের লিপস্টিক, ম্যাচ করা শাড়ি-ব্লাউজের শখ, মেপে কথা বলার স্টাইল সব উধাও হয়ে যাবে। এমনকী যে-কোম্পানিতে ও চাকরি করে তার ঠিকানাও গুলিয়ে যাবে। ওই মেয়েছেলেটা কী করে বুঝবে আমার বুকের ভেতরে কী হচ্ছে! পারত—যদি ওর টুপুরের রিতুর মতন কিছু হত, তা হলে বুঝতে পারত....।'

কথা বলছিল আর চশমার নীচ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল।

পরমেশ ওকে আঁকড়ে ধরল। ওর গলার খাঁজে মুখ গুঁজে দিল। জড়ানো গলায় বলল, 'প্রমি, আমার ভুল হয়ে গেছে....ক্ষমা করো। আসলে তোমার ওই পাগল করা কষ্ট আমি আর সইতে পারছিলাম না। ভয় পাচ্ছিলাম, তুমি যদি হঠাৎ করে কিছু একটা করে বসো....।'

'কিছু একটা মানে?' পরমেশকে আলতো করে ঠেলে দিল প্রমিতা। ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। ওর বাঁ গালের গোল পোড়া দাগটা একবার দেখল।

পরমেশ কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। বলবে-কি-বলবে না করেও শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'কিছু একটা মানে...সুইসাইড...মানে...।'

চোখ থেকে চশমাটা খুলে বালিশের পাশে রাখল প্রমিতা। হাত দিয়ে চোখ আর গাল মুছে নিল। ওর ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসির ছোঁয়া দেখা গেল বলে মনে হল।

'সুইসাইড!' প্রমিতার হাসির ছোঁয়াটা আরও স্পষ্ট হল : 'রিতু আমাকে সুইসাইড করতে দিলে তো! মেয়েটা রোজ রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখা দেয়, আর জানতে চায়, কী হল। ওর কাছে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। জানো, লজ্জায় মরে যাওয়ার চেয়ে এমনি মরে যাওয়া অনেক সহজ।...আমাকে কিছু একটা করতে হবে....।'

পরমেশ ভাঙা গলায় বলল, 'আমি তো চেষ্টা করলাম—পারলাম কোথায়!'

'ওভাবে হবে না। অন্য কোনওভাবে....।'

প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল পরমেশ।

এ কোন প্রমিতা! সাধারণ একজন মা, সাধারণ একজন গৃহবধূ প্রমিতাকে এখন কোনও যুদ্ধের সেনাপতি বলে মনে হচ্ছে। যে যুদ্ধের ছক তৈরি করে, ষড়যন্ত্র করে, প্রখর বুদ্ধির জটিল দাবাখেলায় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জিততে চায়।

পরমেশ ঝুঁকে পড়ে প্রমিতাকে জড়িয়ে ধরল। মেয়ে গেছে। মেয়ের মাকে ও আর হারাতে চায় না। বরং মায়ের মধ্যে দিয়েই হারানো মেয়েকে খুঁজে পেতে চায়।

প্রমিতা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। পরমেশের আদর ও টের পাচ্ছিল বটে, কিন্তু ওর মন পড়ে ছিল অন্য কোথাও।

এমন সময় বৃষ্টি শুরু হল। তারই মধ্যে গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল কয়েকবার। পরমেশ ঘরের আলোটা নেভানোর জন্য আন্দাজে বেডসুইচের দিকে হাত বাড়াল। সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

ঘর অন্ধকার হতেই প্রমিতা খুব নিচু গলায় বলে উঠল, 'আমাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দেবে?'

শুক্লাদের চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ির উলটোদিকে একটা চায়ের স্টলে বসে ছিল সুদেব সামন্ত। একটু আগেই শুক্লার স্বামী সুদীপ্ত বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। সুদেব জানে ও কোথায় গেছে।

সুদেব তৈরি হল। ওর বুকের ভেতরটা ধক-ধক করছিল। এখুনি কাজ শুরু করতে হবে। কারণ, এখন থেকে প্রায় দু-ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। শুক্লা একা থাকবে। কমপক্ষে দু-ঘণ্টার আগে সুদীপ্ত ফিরবে না। তার মধ্যেই সুদেবকে কাজ সারতে হবে। চেটেপুটে সব শেষ করতে হবে।

প্রায় একমাস ধরে এই ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটটার দিকে নজর রেখেছে সুদেব। বুঝতে চেয়েছে স্বামী-স্ত্রীর রুটিন। তাতে ও দেখেছে, প্রতি মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার সুদীপ্ত সন্ধে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে যায়, আর ফেরে ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে। হাতে থাকে বাজার করা শাকসবজির প্লাস্টিকের প্যাকেট।

সুদীপ্তকে ফলো করে ওর সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছে সুদেব।

সুদীপ্ত ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হাজরা রোড ব্রাঞ্চে কাজ করে। এ ছাড়া ও প্রতি মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার শ্যামবাজারের কাছে একটা বাড়িতে টিউশানি করতে যায়। সেখানে সাতজন এইচ. এস. ক্যান্ডিডেট ওর কাছে ইংরেজি পড়ে। টিউশানির পর ও শ্যামবাজারের বাজার থেকে আনাজপত্র কিনে বাড়ি ফেরে।

সুদীপ্তর পিছু নেওয়া ছাড়াও ওর সম্পর্কে বেশ কিছু খোঁজখবর নিয়েছে সুদেব। সুদীপ্ত যেদিন অফিস কামাই করেছে সেদিন ওর ব্যাঙ্কে গেছে। ব্যাঙ্ক-লোন নেওয়ার ছলছুতোয় অন্য কোলিগদের কাছে টুকটাক প্রশ্ন করেছে। একদিন তো একজন কোলিগ বলেই বসল, 'আপনি কি বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ করার চেষ্টা করছেন? ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে! এই তো, গত বছর—।'

সুদেব আর বেশি ঘাঁটায়নি। কারণ, ও নিজে সবসময় সন্দেহের আওতার বাইরে থাকতে চায়।

যে-ছেলেমেয়েগুলো সুদীপ্তর কাছে ইংরেজি পড়ে তাদের কাছেও খোঁজখবর

করেছে সুদেব। বানিয়ে-বানিয়ে বলেছে যে, ওর ভাইপোকে সুদীপ্তর কোচিং-এ দেবে। তাই কেমন পড়ায়, কামাই-টামাই করে কি না, খুব রাগী না শান্ত এই সব নানান প্রশ্ন করেছে।

এইভাবে অনেক পরিশ্রমের পর ও শুক্লা আর সুদীপ্ত সম্পর্কে মনে-মনে একটা মোটা ফাইল তৈরি করে ফেলেছে। তারপর দিনক্ষণ দেখে চরম আঘাত হানার জন্য তৈরি হয়েছে।

এর মধ্যে কোনও-কোনও দিন প্রমিতা সুদেবকে দেখতে পেয়েছে, ফলো করেছে। কিন্তু সবসময় ওর ওপরে নজর রাখতে পারেনি। প্রমিতা বুঝতে পারছিল, শুক্লা মেয়েটার কপালে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে পারে।

আজ, এখন, সেই দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে—কিন্তু প্রমিতা জানে না। ও দোতলায় মেয়ের ঘরে বসে আপনমনে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। বিয়ের আগে থেকেই প্রমিতার সেলাইয়ের শখ। রঙিন সুতোয় বুনে-বুনে ও খুব সুন্দর-সুন্দর ছবি আঁকতে পারে।

সুদেব সামন্ত সেলাই জানে না। তবে যেটা জানে তাতে ওর জুড়ি মেলা ভার। ও খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে ছক কষে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে পেশাদার শিল্পীর মতো জাল বুনে-বুনে তারপর আসল কাজে নেমেছে।

গত একমাস ধরে নজর রাখার কাজটা খুব সাবধানে সেরেছে সুদেব। এ-ব্যাপারে ফুটপাতের চায়ের বা তেলেভাজার দোকানগুলো ওকে দারুণ হেল্প করেছে। কখনও এ-দোকানে, কখনও ও-দোকানে খদ্দের সেজে বসে থেকেছে। সময় কাটিয়েছে। আবার যাতে কেউ ওকে সন্দেহ না করে সেদিকেও নজর রেখেছে।

সত্যি, কোনও মানুষের ওপরে একমাস নজরদারি করলেই তার সম্পর্কে কত কী জানা যায়! যেমন, সুদেব এখন শুক্লা আর সুদীপ্তর রোজকার রুটিন গড়গড় করে বলে দিতে পারে।

কপালের ঘাম মুছল সুদেব। এই একমাস ধরে ও কম কষ্ট করেনি। অবশ্য কেষ্ট পেতে গেলে কষ্ট ছাড়া উপায় কী! আর শুক্লার মতো টসটসে কেষ্ট পাওয়ার জন্য ও আরও অনেক বেশি কষ্ট করতে রাজি আছে।

প্রায় প্রতি রাতে শুক্লাকে ও কল্পনা করেছে। সেইসঙ্গে সুদীপ্তকেও। তারপর মনে-মনে সুদীপ্তর সঙ্গে জায়গা বদল করেছে।

সুদীপ্তর চেহারা দেখে সুদেবের মনে হয়নি ও শুক্লাকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারে। সুদেব ওর চেয়ে অনেক বড় খেলোয়াড়। সত্যিই যে তাই, সেটা শুক্লা আজ টের পাবে।

দোকানের চা-বিস্কুটের দাম মিটিয়ে রাস্তায় নামল সুদেব। অটো আর প্রাইভেট কার ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে। এ-রাস্তায় কোনও বাসরুট নেই। আর লরি-ট্রাক চলতে শুরু করবে রাত আটটার পর।

pathagar.net

ডান পকেটে হাত ঢোকাল। ছোট্ট পকেট-ছুরিটা মুঠো করে ধরল। তাতে ভরসা পেল যেন। ছুরিটা ছোট হলে কী হবে, বেশ কাজের। তা ছাড়া গলার নলি কাটতে গেলে কী-ইবা এমন বড় ছুরি দরকার!

এপাশ-ওপাশ দেখে খুব সাবধানে রাস্তা পার হল। তারপর পায়ে-পায়ে ফ্ল্যাটবাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

রাস্তার আলো খারাপ থাকায় জায়গাটা বেশ অন্ধকার। পাশের ভ্যাট থেকে বৃষ্টি-ভেজা আবর্জনার গন্ধ আসছে। সেখানে মেথরদের দুটো হাত-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি দুটো ময়লা বোঝাই। তার পাশে একটা বেড়াল ময়লা ঘাঁটছে।

সুদেব ভ্যাটের দিকটায় এগিয়ে গেল। সাবধানে দেখল এদিক-ওদিক। ও ফ্ল্যাটবাড়িটায় ঢোকার সময় কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়। এটাই প্রথম শর্ত। তারপর শুক্লার ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় ওকে কেউ দেখে ফেলুক সেটাও চলবে না। দ্বিতীয় শর্ত।

আর তৃতীয় শর্ত হল, শুক্লাদের ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর সময় কারও চোখে পড়া চলবে না।

এসব ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই পেচ্ছাপের বেগ টের পেল। আবর্জনার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্যান্টের চেন খুলল। নিজেকে হালকা করতে-করতে অস্থির মনটাকে সুস্থির করতে চাইল। মনে-মনে এক-দুই গুনতে শুরু করল।

একটু পরে প্যান্টের চেন বন্ধ করে চটপট পা চালাল। নাঃ, এমন কেউ নেই যে ওকে লক্ষ করছে।

সুড়ুৎ করে শুক্লাদের ফ্ল্যাটবাড়িটায় ঢুকে পড়ল সুদেব সামন্ত। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

ওর মনে হল, সিঁড়িটা ওর কতদিনের চেনা। সেই চেনা সিঁড়িতে পা ফেলে ধাপে-ধাপে ওপরে উঠছিল আর ওর বুকের ভেতরে একটা ধকধকানি ধাপে-ধাপে বাড়ছিল।

এই ধকধকানি কিন্তু ভয়ের নয়—বরং একটু পরেই যে শুক্লার সঙ্গে ওর দেখা হবে এই নীরব শব্দ তারই সংকেত। সুদেবের উত্তেজনার পারা বাড়ছে। বাড়ছে।

'শুক্লা—শুক্লা—।' বলে মনে-মনে কয়েকবার উচ্চারণ করল ও। কত রাতে যে দোকানে শুয়ে-শুয়ে এই নাম ধরে ডেকেছে! আর সেইসঙ্গে বালিশটাকে চটকেছে!

সুদেবের কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। সিঁড়িতে নিজের পায়ের শব্দ ওর কানে আর ঢুকছিল না। ও যেন পা ফেলছিল সিমেন্টের মেঝেতে নয়—স্পঞ্জের ওপরে।

ভাগ্য একটু বেশি ভালো বলতে হবে—কারণ, সিঁড়িতে কারও সঙ্গে ওর দেখা হল না। শিকারি বেড়ালের পায়ে ও পৌঁছে গেল তিনতলার ফ্ল্যাটের দরজায়। ডানদিকের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার দিকে একপলক তাকাল, তারপর চোখ ফেরাল

শুক্লাদের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে।

দরজায় লাগানো নেমপ্লেটটা মনে-মনে একবার পড়ে নিল সুদেব। শুক্লার নামের ওপরে আঙুল বুলিয়ে একটা ঢ্যারা চিহ্ন আঁকল। আবছা হাসিতে সামান্য বেঁকে গেল ওর ঠোঁটের রেখা। এইবার কাজ শুরু।

বাঁহাতের বুড়ো আঙুলে শুক্লাদের কলিংবেল টিপল সুদেব। আর একইসঙ্গে পকেট থেকে একটা সাদা খাম বের করে নিল। খামের ওপরে গোটা-গোটা হরফে লেখা : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটু পরেই দরজার পাল্লা খুলে গেল। তবে পুরোটা না—মাত্র ইঞ্চিতিনেক। সেই ফাঁকে ডাগর মেয়ের ফরসা মুখ-চোখ দেখা গেল। চোখে এখন চশমা নেই। কিন্তু সংশয়ের ছায়া রয়েছে।

সুদেব বুঝল, দরজার পাল্লাটা সিকিওরিটি চেনে আটকে আছে। যে করে হোক, ওকে দিয়ে পুরো দরজাটা খোলাতে হবে। যে করে হোক।

ওকে দেখেই সুদেব একগাল হাসল, বলল, 'ভালো আছেন, দিদি?'

শুক্লা সামান্য হেসে 'হুঁ' বলল। কিন্তু ওর চোখ থেকে সংশয়ের ছায়াটা পুরোপুরি গেল না।

সুদেব এবার খামটা দেখাল শুক্লাকে। বলল, 'দিদি, চারতলায় উঠছিলাম, হঠাৎই আপনার দরজার কাছে এই খামটা পেলাম—ভেতরে অনেকগুলো একশো টাকার নোট রয়েছে....।'

খামের মুখটা খোলা ছিল। সুদেব এমনভাবে সেটা ধরল যেন শুক্লা ভেতরের নীলচে নোটগুলো দেখতে পায়।

'....তারপর খেয়াল করে দেখি খামের ওপরে "সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়" লেখা....আবার আপনার দরজাতেও ওই একই নাম....মানে, ভাবলাম....।'

চট করে দরজাটা পুরোটা খুলে গেল। সুদেবের সামনে শুক্লা প্রকাশিত হল।

একটা গোলাপি ম্যাক্সিতে শরীর ঢাকা। হাতায় আর গলায় কুচির কাজ। জলে ভেজা মুখ—বোধহয় মুখ-টুখ ধুচ্ছিল।

ম্যাক্সিটা বেশ ঢোলা হলেও ওর শরীরের আকর্ষণ বোঝা যাচ্ছে।

আহা, কী দারুণ দেখতে! সুদেবের শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল।

সুদেব যেন জানত, ওর এই খামের ফাঁদে পা দেবে শুক্লা—দরজা খুলে দেবে। কারণ, লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস।

অনেকরকম চিন্তাভাবনার পর দরজা খোলানোর এই ছকটা তৈরি করেছিল সুদেব। আটটা একশো টাকার নোট একটা সাদা খামে ভরেছিল। তারপর খামের ওপরে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছিল সুদীপ্তর নাম।

সুদেব জানত, টাকাভরতি খামটা শুক্লাকে দিয়ে দিলেও কোনও অসুবিধে নেই।

pathagar.net

কাজ শেষ হলে পর সুদেব অনায়াসেই খামটা নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

শুক্লার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে ভাবল সুদেব : বোকা মেয়ে, কিন্তু মিষ্টি মেয়ে।

শুক্লা তখন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে খামটার দিকে।

'হ্যাঁ....সুদীপ্ত আমার হাজব্যান্ডের নাম....। হয়তো ওর পকেট থেকে পড়ে-টরে গেছে...।'

সুদেব হেসে খামটা এগিয়ে দিল শুক্লার হাতে।

শুক্লা খাম থেকে টাকাগুলো বের করে গুনল। তারপর আবার খামে ভরে রাখল।

'দেখেছেন, কী কেয়ারলেস! আপনি না দেখতে পেলে কী সর্বনাশ হত বলুন তো!'

সুদেব হাসল। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ওর আশঙ্কা হচ্ছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে বড় বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে। কেউ যদি ওকে এই অবস্থায় দেখে ফ্যালে তা হলে পরে পুলিশের কাছে সহজেই উগরে দিতে পারবে : '....হ্যাঁ, একটা লোক শুক্লার সঙ্গে কথা বলছিল। ফরসা, মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো, গায়ে....। লোকটাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। লোকটার চাউনি....।'

সুদেব আর দেরি করল না। ওর কৌশলের দ্বিতীয় ধাপে চলে গেল।

'দিদি, একগ্লাস জল খাওয়াবেন? গলাটা কেমন টেনে গেছে....।'

'খাওয়াব না মানে!' চোখ বড়-বড় করে বলে উঠল শুক্লা, 'আপনি আমার এতবড় উপকার করলেন—আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—।'

সুদেব যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। চট করে পা বাড়িয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে গেল ও।

এইবার দরজাটা বন্ধ করতে হবে। তার জন্য হয় একটা ছল-ছুতো দরকার—নয়তো সরাসরি বন্ধ করতে হবে—নিজের আসল উদ্দেশ্যটা গোপন না রেখেই—ওই সুচরিতা মেয়েটার মতন।

কিন্তু সুদেবকে এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। কারণ, শুক্লা ওকে বলল, 'দরজটা বন্ধ করে দিন—আমাদের ফ্ল্যাটে যা চাঁদা আর সেল্‌সম্যানের উৎপাত—দিন নেই রাত নেই সবসময় এসে বিরক্ত করে।'

সুদেব আবারও হাঁপ ছাড়ল। মেয়েটা কী ভালো! ওর সমস্যাগুলো ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারছে।

বাঁ পকেটে হাত চালিয়ে রঙিন রুমাল বের করল। তারপর রুমালটা হাতে রেখে সেই অবস্থাতেই দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল। দরজার কোথাও সুদেবের আঙুলের ছোঁওয়া লাগল না। আঙুলের ছাপের ব্যাপারে সুদেব আজ সাবধান হয়ে এসেছে। এমনকী দোকান থেকে একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভ্‌সও কিনে এনেছে।

রুমালটা পকেটে ফিরিয়ে রাখতে গিয়ে গ্লাভ্‌সজোড়া সুদেবের হাতে ঠেকল।

তাতে মনে জোর পেল ও।

শুক্লা ততক্ষণে চলে গেছে ফ্রিজের কাছে। টাকার খামটা ফ্রিজের ওপরে রেখে প্রায় ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ঠুং-ঠাং শব্দ তুলে প্লেট আর চামচ হাতে নিয়ে আবার চলে এল ফ্রিজের কাছে। দরজা খুলে দুটো মিষ্টি বের করে প্লেটে সাজাল। তারপর সুদেবের কাছে ফিরে আসতে-আসতে বলল, 'এই নিন—এই মিষ্টি ক'টা খেয়ে জল খান। বিকেলে কিনে এনে ফ্রিজে রেখেছি। আসলে হঠাৎ করে কোনও গেস্ট-টেস্ট এসে গেলে তক্ষুনি যাতে দোকানে ছুটতে না হয় তার জন্যে সবসময় আগে থাকতে কিনে ফ্রিজে রেখে দিই...কী হল, বসুন!'

শেষ কথাটা শুক্লা বলল সুদেব তখনও দাঁড়িয়ে ছিল বলে।

সুদেব একটু ইতস্তত করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ওর সামনের সেন্টার টেবিলটা সস্তা, কাঠের তৈরি। ওপরে লেসের কাজ করা মামুলি একটা টেব্‌ল-ক্লথ।

শুক্লা মিষ্টির প্লেটটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, 'পাঁচ মিনিট ওয়েট করে তারপর মিষ্টিগুলো খান।'

সুদেব অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন?'

'এক্ষুনি খেলে—ফ্রিজের তো—চট করে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।'

এ-কথা শুনে হেসে ফেলল সুদেব।

'হাসছেন কী! জানেন, লাস্ট উইকে আমার ছোটমামা এসেছিল। তো ফ্রিজ থেকে বের করে মিষ্টি দিয়েছি। খেয়েদেয়ে যখন গেল তখন গলা বসে গেছে। আমি লজ্জায় পড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি দুটো ডিসপ্রিন ট্যাবলেট ছোটমামার হাতে দিয়ে বললাম, বাড়িতে গিয়ে গার্গ্‌ল করে নিয়ো, ঠিক হয়ে যাবে। ছোটমামার তাতে ভরসা হল না। বলল, "তোর মিষ্টি খেয়ে কাল স্কুলটা কামাই হয়ে গেল।" ছোটমামা বরানগর হাই স্কুলে বায়োলজি পড়ায়....নিন, এবার খান।'

শেষ কথাটা সুদেবের মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারে। সুদেব অদ্ভুত চোখে শুক্লাকে দেখছিল। কী অনায়াসে একজন অচেনা লোককে নিজের ঘরোয়া কথা বলে চলেছে। সবাইকে এত সহজে বিশ্বাস করে কথার-খই-ফোটানো এই মেয়েটা!

সুদেব প্লেটের দিকে হাত বাড়াতেই 'দাঁড়ান, আপনার জন্যে জল নিয়ে আসি।' বলে শুক্লা তরতরে পায়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

সুদেব চামচের দিকে হাত না বাড়িয়ে মিষ্টির দিকে হাত বাড়াল। চামচে আঙুলের ছাপ ফেলার কোনও ইচ্ছে ওর নেই।

মিষ্টিতে কামড় দেওয়ার সময় নিজের হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল ও। সাতটা কুড়ি সবে পেরিয়েছে। এখনও সময় আছে। কিন্তু তাই বলে অযথা সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। এই কথা ভেবে মিষ্টিগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে লাগল।

pathagar.net

শুক্লা রান্নাঘর থেকে আধগ্লাস জল নিয়ে তার সঙ্গে ফ্রিজের জল মেশাল। তারপর গ্লাসটা নিয়ে এল সুদেবের কাছে। টেবিলে ঠক করে রেখে বলল, 'জানেন, আপনি খুব অনেস্ট। আজকের এই খুন, চুরি, ডাকাতির যুগে আপনার মতো লোক খুব বেমানান। ওঃ, আমার তো আপনাকে "থ্যাংক য়ু"-ই বলা হয়নি—' সুদেবের কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল শুক্লা : 'থ্যাংক য়ু—।'

মিষ্টি খেতে-খেতে মুখ তুলে মেয়েটাকে একবার দেখল সুদেব। চোখে হাসল।

'আপনার নামটা এখনও জানা হয়নি।' ম্যাক্সিতে হাত মুছতে-মুছতে বলল শুক্লা, 'অবশ্য আমারটাও বলা হয়নি। আমার নাম শুক্লা—।'

হাসল সুদেব। বলল, 'জানি—দরজায় নেমপ্লেটে লেখা আছে।'

'ওহ্-হো! তাই তো! দেখেছেন আমি কী বোকা!'

'আমার নাম সুদেব সামন্ত। মনে আছে, আগে একদিন আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম—।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়ছে। আপনি ইলেকট্রিক না কীসের যেন কাজ করেন....।'

'হ্যাঁ, আমি ইলেকট্রিক মিস্তিরি....।'

'ছিঃ, এভাবে বলছেন কেন! কোনও প্রফেশানই ছোট নয়। আমার হাজব্যান্ড—সুদীপ্ত—ও তো ব্যাঙ্কের ক্লার্ক। তা ছাড়া টিউশানি করে। ব্যাঙ্কে লোন করে এই ফ্ল্যাটটা নিয়েছে। মাইনে থেকে মাসে-মাসে অনেকগুলো করে টাকা কাটে। সেইজন্যেই টিউশানি নিয়েছে। তা ওকে যদি কেউ ব্যাঙ্কের কেরানি আর ঠিকে মাস্টার বলে তা হলে কেমন শোনাবে!'

সুদেব মাথা নেড়ে সায় দিল : 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ব্রোকারকে দালাল বললে বাজে শোনায়। আচ্ছা, আমি তা হলে ইলেকট্রিক মিস্তিরি না—ইলেকট্রিশিয়ান। এবার ঠিক আছে?'

এ-কথা শুনে শুক্লা হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। মুখে হাত চাপা দিয়ে দুলে-দুলে হাসতে লাগল।

সুদেব সরল মেয়েটাকে দেখতে লাগল।

ম্যাক্সিটা বেশ মানিয়েছে। অবশ্য ওকে সবকিছু পরলেই মানাবে—এত টকটকে ফরসা! মাথার চুলটা পিছনে হর্সটেল করে বাঁধা। কানের পাশ থেকে কিছু অবাধ্য চুল শূন্যে বেরিয়ে ভাসছে, ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে।

মেয়েটার গলায় সরু চেন। কানে সোনার দুল। কপালের ওপরে যেখানে চুল শুরু হয়েছে, সেখানে সিঁদুরের ছোঁয়া। ও একটু ঝুঁকে বসেছে বলে ম্যাক্সির গলার কাছটা বেশ খানিকটা হাঁ হয়ে আছে।

সুদেবের কল্পনা সেই হাঁ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মিষ্টি খাওয়া শেষ। এবার জলের গ্লাস হাতে নিতে হবে।

আঙুলের ছাপের ব্যাপারটা মনে পড়ল সুদেবের। গ্লাভ্‌সজোড়া পকেট থেকে বের করে এখনই কি হাতে পরে নেবে? তাতে কি মেয়েটা সন্দেহ করবে না?

শুক্লা হঠাৎই বলল, 'আপনাকে দেখতে মোটেই ইলেকট্রিশিয়ানদের মতো নয়...।'

'তা হলে কেমন দেখতে?'

'অনেকটা হিরো-হিরো টাইপের....খুব হ্যান্ডসাম....।'

কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল সুদেব। মেয়েটা এত উলটোপালটা কথা বলে! আর এত কথা বলে!

'আপনি ইচ্ছে করলেই সিনেমায় নামতে পারতেন। আমার কলেজের এক বন্ধু রূপেন—মানে, ক্লাসমেট—ও সিনেমায় চান্স পাওয়ার জন্যে রোজ ক্লাস কামাই করে টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো পাড়ায় গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত। অবশ্য চান্সও পেয়েছিল। তিনটে সিনেমায়।....কী হল, আপনি জল খাবেন না?'

সুদেবকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে শুক্লা আচমকা জিগ্যেস করল, 'আপনার যে গলা টেনে গেছে বললেন....।'

'আপনার মজার কথা শুনতে-শুনতে সব গুলিয়ে গেছে।'

শুক্লা আবার হাসিতে ভেঙে পড়ল।

একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছেন, তবে ওটা "মজার কথা" নয়—"বেশি কথা"। সুদীপ্ত সবসময় বলে আমি নাকি খুব বকবক করি। তো আমিও বলেছি, বিয়ের আগে বনবিতান কি মিলেনিয়াম পার্কে গিয়ে এই বকবকানি শুনতে তো বেশ লাগত! একটা সিনেমাও তো শান্তিতে দেখতে দাওনি! আসলে একা-একা থাকতে আমার ভীষণ বোর লাগে। ভাগ্যিস আপনি আজ এলেন। ও তো পড়াতে গেছে...ফিরতে-ফিরতে সেই ন'টা-সাড়ে ন'টা.....কী হল, জল খান—।'

নাঃ, আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। মনে-মনে একটা মতলব তৈরি করল সুদেব। হিসেব কষে দেখল তাতে কোনও ভুল নেই। তাই কথাবার্তার মোড় ঘোরাল সেদিকে।

'একজন সাধারণ ইলেকট্রিশিয়ানকে আপনি এত খাতির করলেন....মিষ্টি খাওয়ালেন....মানে, আমাদের মতো লো স্ট্যান্ডার্ডের লোকজনকে কেউ তো মানুষ বলেই মনে করে না....সেখানে আপনি....।'

'কীসব বাজে বকছেন! আপনি যে আমার বিশাল উপকার করলেন....বলুন, আটশো টাকা আজকের দিনে কিছু কম!'

হাত-পা নেড়ে চনমনে গলায় কথা বলছিল শুক্লা। ওর দিকে হাত তুলে ওকে থামতে ইশারা করল সুদেব। তারপর বলল, 'আমার একটা কথা রাখবেন, প্লিজ....?'

'কী কথা?'

'আপনার এই ফ্ল্যাটে ইলেকট্রিকের লাইন কিংবা কোনও ইলেকট্রিক আইটেম যদি খারাপ থাকে তা হলে আমি সেটা বিনাপয়সায় সারিয়ে দেব। আপনার খাতিরের বদলে এইটুকু করার অনুমতি আমাকে দিতে হবে।'

হাঁটুতে দু-হাতের চাপড় মেরে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুক্লা। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'তাতে যদি আপনার শান্তি হয় তো তাই। আমাদের ইলেকট্রিক আয়রনটা খারাপ হয়ে গেছে। জামাকাপড় দোকান থেকে ইস্তিরি করাতে হচ্ছে বলে সুদীপ্ত খুব খেপে গেছে। দিন-রাত গজগজ করছে আর বলছে, "একটা মিস্তিরি পাচ্ছি না যে, বাড়িতে ডেকে এনে সারাব। ফরেন জিনিস, দোকান-টোকানে দিলে পার্ট্স-ফার্ট্স সব ওলটপালট করে দেবে। আর এদিকে বাইরে ইস্তিরি করিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ...।" ওটা পারলে একবার দেখে দিন।'

'কোথায় ইস্তিরিটা? নিয়ে আসুন—।'

শুক্লা উঠে দাঁড়াল। 'এক্ষুনি নিয়ে আসছি।' বলে চলে গেল শোওয়ার ঘরের দিকে।

সুদেব ওর রসে আঠালো ডানহাতের আঙুল চট করে জলের গ্লাসে ডুবিয়ে দিল। তারপর হাতটা বের করে নিয়ে জামায় মুছে নিল। এবং উঠে দাঁড়িয়ে বাঁহাত পকেটে ঢুকিয়ে রবারের গ্লাভ্সজোড়া বের করে নিল।

ও যখন গ্লাভ্স হাতে পরছে তখন শুক্লা ইস্তিরিটা নিয়ে ফিরে এল।

'এ কী? হাতে গ্লাভ্স পরছেন কেন?' অবাক হয়ে ও প্রশ্ন করল।

একই ছন্দে গ্লাভস্ পরতে-পরতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সুদেব। বলল, 'ইলেকট্রিকের কাজ করতে গেলে আমি হাতে গ্লাভ্স পরে নিই। এগুলো রবারের গ্লাভ্স। এগুলো পরে নিলে আর শক খাওয়ার ভয় থাকে না।'

শুক্লার হাতের ইস্তিরিটার দিকে তাকাল সুদেব। হালকা বিদেশি ইলেকট্রিক আয়রন। বেসপ্লেটটা পাতলা স্টিলের—তবে টেফলন কোটেড। সুদেব মনে-মনে আঁক কষে নিশ্চিত হল যে, এই ইস্তিরিতে ওর কাজ হয়ে যাবে। তা হলে শুধু-শুধু আর পকেট থেকে ছোট ছুরিটা বের করতে হবে না।

এইবার সত্যি-সত্যি ওর জল তেষ্টা পেল।

ঝুঁকে পড়ে গ্লাভ্স পরা ডানহাতটা জলভরা গ্লাসের দিকে বাড়িয়ে দিল সুদেব।

গ্লাস থেকে ঢকঢক করে জল খেতে-খেতে শুক্লার জন্য ওর মায়া হল। এই সরল মেয়েটা আর কখনও বকবক করতে পারবে না ভেবে ওর খারাপ লাগল।

চোদ্দো

সুদীপ্তদের ফ্ল্যাটে ঢুকেই রাজতনু একটা পোড়া গন্ধ পেল। উনুনে বসানো রান্না পুড়লে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় গন্ধটা মোটেই সেরকম নয়। বরং যেসব রেস্তরাঁয় তন্দুরি চিকেন কিংবা শিককাবাব রান্না করা হয়—রান্নার সময় যেরকম গন্ধ বেরোয়—গন্ধটা তার খুব কাছাকাছি।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা। এ সময়ে ফ্ল্যাটবাড়িটা নিঝুম থাকার কথা। কিন্তু এখন সুদীপ্তদের ফ্ল্যাটের সামনে যেরকম ভিড় আর হইচই তাতে মনে হচ্ছে, ফ্ল্যাটে অমিতাভ বচ্চন কিংবা মাধুরী দীক্ষিত অতিথি হয়ে এসেছেন। আর তাঁদের দেখতেই যত রাজ্যের গুঞ্জন, উঁকিঝুঁকি।

সেই উপচে পড়া ভিড় ঠেলে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে সাব-ইনস্পেকটার রাজতনু চ্যাটার্জি। সঙ্গে দুজন কনস্টেব্‌ল অন স্পেশাল ডিউটি।

টেলিফোনে মার্ডারের খবর পাওয়ার পর ডিউটি অফিসার ও. সি.-কে জানায়। কিন্তু তখন এস. আই. বলতে একজনই হাজির ছিল থানায়—রাজতনু চ্যাটার্জি। ও. সি. রাজতনুকে ডেকে ইনভেস্টিগেশানে যেতে বলেন। তখন খাতায় জেনারেল ডায়েরি লিখে দুজন কনস্টেব্‌লকে সঙ্গে নিয়ে থানা থেকে জিপ নিয়ে বেরিয়েছে রাজতনু। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর থেকেই ওর মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধতে শুরু করেছিল।

ফ্ল্যাটের মধ্যে খুন হয়েছে একজন অল্পবয়েসি মেয়ে।

সাত-আট মাস আগের ঘটনা মনে পড়ে গেল রাজতনুর। এক প্রফেসারের মেয়ে খুন হয়েছিল বাড়িতে। মেয়েটার বয়েস ষোলো কি সতেরো ছিল....বাড়িতে একাই ছিল। তারপর...।

কী যেন নাম ছিল মেয়েটার? হ্যাঁ, মনে পড়েছে—সুচরিতা। আরও মনে পড়েছে, সিন অফ দ্য ক্রাইম-এ গিয়ে রাজতনু আপসেট হয়ে গিয়েছিল।

সব দেখে-শুনে রাজতনুর মনে হয়েছিল, খুনটা সাইকোপ্যাথের কাজ। এবং এই সাইকোপ্যাথ হয়তো সিরিয়াল কিলার হয়ে উঠতে পারে।

সেইজন্যই মনে-মনে ওইরকম দ্বিতীয় একটা খুনের অপেক্ষায় ছিল রাজতনু। এই খুনটা সেই খুন কি না কে জানে!

একটা আক্ষেপের ঢেউ উঠল রাজতনুর বুকের ভেতরে।

সেই হবু সিরিয়াল কিলারের সিরিয়াল প্রথম এপিসোডেই খতম করতে চেয়েছিল ও। সন্দেহ করে হালসীবাগানের ওই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিটাকে অ্যারেস্টও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কনভিক্‌শান আনতে পারেনি। লোকটা বেকসুর খালাস হয়ে গেছে।

pathagar.net

যদি এই খুনটা সত্যি-সত্যি দ্বিতীয় এপিসোড হয় তা হলে ভীষণ দুশ্চিন্তার ব্যাপার। যে-করে-হোক সিরিয়ালটাকে এবার থামাতে হবে। নইলে আরও ক'টা মেয়ের প্রাণ যাবে, কে জানে!

সেইজন্যই রাজতনু মনে-মনে চাইছিল, প্রথম খুনটার সঙ্গে এই দ্বিতীয় খুনটার যেন কোনওরকম সম্পর্ক না থাকে।

কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢোকামাত্রই পোড়া গন্ধটা রাজতনুকে ধাক্কা মারল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা তীব্র আশঙ্কা ওর মনে জায়গা করে নিল।

দুজন প্রৌঢ় ফ্ল্যাটের দরজা আগলে রেখে পাবলিককে সামাল দিচ্ছিলেন। রাজতনুকে দেখেই ওঁরা পথ ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আসুন, স্যার—ভেতরে আসুন।'

একজন কনস্টেব্‌লকে ওঁদের সঙ্গে দরজায় পাহারায় দাঁড় করাল রাজতনু। তারপর অন্য কনস্টেব্‌লটিকে সঙ্গে নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরে চোখে পড়ার মতো অনেক জিনিস থাকলেও সবচেয়ে আগে চোখে পড়ল মেঝেতে আলুথালু হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটার মৃতদেহ। ছন্নছাড়া পোশাক-আশাক। ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের রেখা শুকিয়ে আছে।

আর তখনই পোড়া গন্ধটার কারণ খুঁজে পেল রাজতনু।

একটা বিদেশি ইলেকট্রিক ইস্তিরি মেয়েটার মুখের ওপরে রাখা আছে। ইস্তিরির জন্য বাঁ চোখ আর গালটা ঢাকা পড়ে গেছে। ইস্তিরির মেইন্‌স কর্ডটা চলে গেছে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা এক্সটেনশান বোর্ডের দিকে। লাল-কালো ফাইবারের তৈরি এক্সটেনশান বোর্ডের মেইন্‌স কর্ডটা দেওয়ালের প্লাগ পয়েন্টে গোঁজা। আর প্লাগ সকেটের পাশের সুইচটা অন করা রয়েছে।

যেটুকু দেখা যাচ্ছে, মেয়েটার মুখের চামড়া—বিশেষ করে বাঁ-দিকটা—পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

দৃশ্যটা রাজতনুকে শিকড় পর্যন্ত নাড়িয়ে দিল। পোড়া গন্ধের সঙ্গে-সঙ্গে সাইকোপ্যাথের গন্ধ পেল ও। সেই গন্ধটা আরও জোরালো হল মৃতদেহের অবস্থা দেখে।

মেয়েটার গায়ের গোলাপি ম্যাক্সির শতচ্ছিন্ন অবস্থা। যতদূর মনে হয়, তারই ছেঁড়া ফালি দিয়ে মেয়েটার দু-হাত মাথার ওপরে তুলে একটা সোফার পায়ার সঙ্গে বাঁধা। ম্যাক্সির নীচের দিকটা প্রায় উরু পর্যন্ত উঠে গেছে। ফরসা ধপধপে গলা আর উরুতে অনেকগুলো লালচে আঁচড়ের দাগ। অর্থাৎ, খুনির সঙ্গে মেয়েটার ধস্তাধস্তি হয়েছে ভালোই।

বসবার ঘরের এককোণে চেয়ারে বসে ফরসা, রোগা চেহারার একটা অল্পবয়েসি ছেলে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ওকে সামাল দিচ্ছে আরও দুজন। রাজতনুর বুঝতে

অসুবিধে হল না, ওই ফরসা, রোগা ছেলেটাই মেয়েটার স্বামী।

সাধারণত, কোনও বিবাহিতা মেয়ে খুন হলে সন্দেহের আঙুল ওঠে তার স্বামীর দিকে। এবং শতকরা প্রায় নব্বইভাগ ক্ষেত্রেই সন্দেহটা সত্যি হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজতনুর সেরকম মনে হল না।

ওই ইলেকট্রিক ইস্তিরি। ছিঁড়ে ফালা-ফালা করা ম্যাক্সি। তারপর ডেডবডির যা উচ্ছন্নে-যাওয়া অবস্থা তাতে মেয়েটার স্বামীকে অনায়াসে রেহাই দেওয়া যায়।

পোড়া গন্ধটা রাজতনুর নাকে ধীরে-ধীরে সয়ে এসেছিল। কিন্তু ও লক্ষ করল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেব্‌লটি নাকে রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে আছে।

একবার ভাবল, কনস্টেব্‌লটাকে ডেকে বলে, 'নাক থেকে রুমাল সরিয়ে নাও। দশ কি পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই গন্ধটা নাকে সয়ে যাবে—তখন গন্ধটাই তুমি আর টের পাবে না। ফলে কষ্ট কম হবে।'

কিন্তু কিছু বলল না। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে থানার ও. সি.-কে ফোন করল। ও. সি.-র অনুমতি নিয়ে লালবাজারে ফোন করতে হবে। এরকম একটা ভায়োলেন্ট সেক্স-ক্রাইমের ঘটনা—ডাক্তার, ফটোগ্রাফার, ফোরেনসিক এক্সপার্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্টের লোকজন—সবাইকেই রাজতনুর চাই। এক্ষুনি।

ফোনের পালা শেষ হলে ঘরের কোণের দিকে তাকাল রাজতনু।

মেয়েটার স্বামীর সঙ্গে একবার প্রাথমিকভাবে কথা বলা দরকার। পরে থানায় ডেকে নিয়ে ধীরে-সুস্থে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।

ঘরের কোণের দিকে এগোল রাজতনু।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে সঙ্গী দুজন উঠে দাঁড়াল। তবে ফরসা, রোগা ছেলেটি দু-হাতে মুখ ঢেকে বসেই রইল।

ওদের কাছে গিয়ে রাজতনু বসল না। ফোরেনসিক টিম আসার আগে এ-ঘরের জিনিসপত্র যত কম ছোঁয়া যায় ততই ভালো।

পকেট থেকে ডায়েরি আর পেন বের করে কথা বলতে শুরু করল রাজতনু। আর কথার ফাঁকে-ফাঁকে দরকারি তথ্যগুলো লিখে নিতে লাগল।

সুদীপ্তর সঙ্গী দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে যিনি বয়স্ক তিনি বললেন, 'আমার নাম বলরাম শাসমল—সামনের ফ্ল্যাটে থাকি। থানায় আমিই ফোন করেছিলাম। তা ছাড়া দরজা ভেঙে ঢোকার পর শুক্লার এই অবস্থা দেখে আমিই দরজায় লোক মোতায়েন করে দিয়েছি। ঘরের মধ্যে গাদা পাবলিকের ভিড় হয়ে গেলে অনেক প্রবলেম। একে তো এই ডিসগাস্টিং সিন—তার ওপর ক্লু-টু নষ্ট হতে পারে....তাই।'

'থ্যাংক য়ু।' বলল রাজতনু। তারপর ভালো করে দেখল ভদ্রলোককে।

বয়েস হয়েছে—ষাট না হলেও ষাটের কাছাকাছি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম।

pathagar.net

মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। শরীর যথেষ্ট ভারী। গাল আর চিবুকের নীচে চর্বির স্তর। একটু ভুরু কুঁচকে কথা বলেন।

বলরাম শাসমলের গায়ে বাদামি রঙের পাঞ্জাবি, তার ওপরে গাঢ় চকোলেট রঙের প্রিন্ট। পরনে পায়ে পাজামা।

ভদ্রলোকের বোধহয় আগের কোনও পুলিশি অভিজ্ঞতা আছে। কারণ, যেভাবে তিনি ক্রাইম সিন আগলে রেখেছেন সেটা সচরাচর দেখা যায় না। অবশ্য টিভি দেখেও এইসব ব্যাপারগুলো আজকাল শেখা যায়।

বলরাম শাসমল বাকি দুজনের সঙ্গে রাজতনুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুদীপ্তকে রাজতনু ঠিকই আন্দাজ করেছিল। শোকে মুহ্যমান দিশেহারা তরুণ। যার কাছে বাঁচার সবক'টা পথই এখন গুলিয়ে গেছে।

তৃতীয় লোকটির নাম পশুপতি চন্দ্র। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। চারতলার একটি ফ্ল্যাটে থাকেন।

পশুপতির চেহারা বেশ রোগা। হয়তো অম্বল জাতীয় কোনও লাগাতার রোগে ভুগছেন। লম্বাটে মুখে বিরক্তির ভাঁজ। চোখে চশমা। গালে দু-একদিনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথার ঝাঁকড়া চুলে সুগন্ধি তেল মেখেছেন—চামড়া-পোড়া গন্ধ ছাপিয়ে তেলের গন্ধটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ওঁর গায়ে হালকা নীল ময়লা হাফশার্ট, আর পায়ে ছাই-রঙা প্যান্ট।

ওঁদের সঙ্গে কথা বলে গল্পটা মোটামুটি জেনে নিল রাজতনু।

মেয়েটার নাম শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামীর নাম সুদীপ্ত। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জুনিয়ার ম্যানেজমেন্ট অফিসার। হাজরা রোড ব্রাঞ্চে কাজ করে। আর সপ্তাহে দু-দিন সন্ধেবেলা শ্যামবাজারের কাছে ইংরেজির কোচিং করায়। আজও ও নিয়মমাফিক পড়াতে বেরিয়েছিল। তখন প্রায় সাতটা বাজে। সাড়ে ন'টা নাগাদ ও ফিরে এসে ফ্ল্যাটের বেল বাজায়। কিন্তু কেউ দরজা না খোলায় বেশ অবাক হয়। বারবার বেল বাজিয়েও কোনও সাড়া না পেয়ে সুদীপ্ত ঘাবড়ে যায়। কারণ, শুক্লা এত রাতে কখনও বাইরে যায় না। অন্তত বিয়ের পর একদিনও যায়নি।

সুদীপ্ত কখনওই ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে বেরোয় না। তাই বাধ্য হয়ে কলিংবেল ছেড়ে এবার দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে।

সেই আওয়াজে পাশের ফ্ল্যাটের বলরামবাবু বেরিয়ে আসেন। তারপর হইচই শুরু হয়ে যায়। ওপর-নীচের ফ্ল্যাটের লোকজনও এসে ভিড় করে। কিছুক্ষণ আলোচনা আর তর্কবিতর্কের পর দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন সবাই দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। ঢুকেই দ্যাখে এই অবস্থা।

শুক্লার হতমান মৃতদেহটার দিকে আর-একবার তাকাল রাজতনু।

সঙ্গে-সঙ্গে আবার সুচরিতার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

সুচরিতার শরীর বিধ্বস্ত ছিল। আর মুখে মাখানো ছিল টমেটো সস।

আর এই মেয়েটার বেলা মুখের ওপরে চাপা দেওয়া ইলেকট্রিক ইস্তিরি।

ইস্তিরিটা গরম হয়ে শুক্লার কোমল ত্বক পোড়ানোর পর ইস্তিরির হিটিং এলিমেন্টটা হয়েতো আরও গরম হয়ে শেষ পর্যন্ত কেটে গেছে।

দুটো মৃত্যুর মধ্যে কি একটা মিল খুঁজে পাচ্ছে না রাজতনু! মনে কি হচ্ছে না, এই খুন দুটো একই লোকের কাজ!

ওপর-ওপর দেখে আঁচ করা যায়, দুটো খুনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

দুটো ক্ষেত্রেই মেয়েটা একা ছিল। দুজনেই খুনিকে স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলে দিয়েছে। প্রথমজনের বেলায় খুনি....।

নাঃ, খুনি যে ইলেকট্রিক মিস্তিরি সুদেব সামন্ত সে-কথা বলা যাবে না। কারণ, আদালত তাকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে।

চিন্তার স্রোতটা ঘোরাল রাজতনু।

দুটো ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা রেপ অ্যান্ড মার্ডার। এবং ভায়োলেন্ট।

শুক্লা একটা অচেনা লোককে দরজা খুলে দিল কেন, এই প্রশ্নটাই বারবার ধাক্কা মারছিল রাজতনুর মগজে। সুদেব সামন্ত যদি সত্যিই খুনি না হয়, তা হলে একই প্রশ্ন ওঠে সুচরিতা মেয়েটার বেলায়। হয়তো সুদেব বেরিয়ে যাওয়ার পর-পরই খুনি ঢুকে পড়েছিল সুচরিতাদের বসবার ঘরে।

রাজতনু ডায়েরিতে বেশ কিছু মন্তব্য লিখল। ঠোঁট কামড়ে কয়েক লহমা চিন্তা করল। মনে-মনে নিজেকে সাইকোপ্যাথ এক খুনির জায়গায় বসিয়ে ভাবতে লাগল, কী করে অচেনা কোনও তরুণীর বিশ্বাস অর্জন করে নির্বিঘ্নে ফ্ল্যাটে ঢোকা যায়।

সুদেব যদি সত্যি-সত্যি খুনি হয়ও, তা হলে সুচরিতার বেলায় সে না হয় সিলিং ফ্যান লাগানোর ছুতোয় ঢুকেছে। কিন্তু শুক্লাদের ফ্ল্যাটে ঢুকল কোন ছুতোয়?

সুদীপ্তকে এবার কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার। দেখা যাক, ও সুস্থির হয়ে উত্তর দিতে পারে কি না।

'সুদীপ্তবাবু, আপনি নিশ্চয়ই চান খুনি ধরা পড়ুক...।'

রাজতনুর এই কথায় সুদীপ্ত মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

সুদীপ্তর দৃষ্টি দেখে মনে হল, এই প্রথম ও রাজতনুকে খেয়াল করল। ওর পোশাকটা খানিক সময় নিয়ে জরিপ করে তারপর যেন বুঝতে পারল, রাজতনু একজন পুলিশ অফিসার।

রাজতনু নিচু গলায় নিজের পরিচয় দিল। তারপর প্রথম কথাটাই আবার বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই চান আপনার ওয়াইফের মার্ডারার ধরা পড়ুক....।'

সুদীপ্ত হাত দিয়ে চোখ মুছল। মাথা ওপর-নীচে ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ— চাই।' এবং কেঁদে ফেলল আবার। মাথা নিচু করল।

pathagar.net

রাজতনু বলল, 'এক্ষুনি ফোরেনসিক টিম আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা চলে আসবেন। আরও ঘণ্টা দুই-তিনেক ফ্ল্যাটে আমাদের কাজ চলতে পারে। আপনি যদি স্ট্রেইন না নিতে পারেন তা হলে অন্য কোথাও আজকের রাতটা রেস্ট নিতে পারেন...।'

বলরাম শাসমল অভিভাবকের সুরে বললেন, 'সে আপনি চিন্তা করবেন না— আমরা তো আছি। তা ছাড়া সুদীপ্তর রিলেটিভদের খবর দেওয়া হয়েছে—ওরা হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।'

রাজতনু সুদীপ্তর কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত রেখে ডাকল, 'সুদীপ্তবাবু—।'

সুদীপ্ত চোখ মুছে আবার মুখ তুলে তাকাল।

কী সরল চোখ! নাকের গোড়ায় দু-পাশে দাগ দেখে বোঝা যায় চশমা পরে— কিন্তু এখন খুলে রেখেছে। ওর আর শুক্লার যৌথ জীবন সবে শুরু হয়েছিল— শুরুতেই শেষ।

রাজতনু কষ্ট পেল মনে-মনে। এই সময় সুদীপ্তকে বিরক্ত করতে ওর মন চাইছে না, কিন্তু উপায় নেই। তাই যে-প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করবে ভাবছিল, সেটাই করল।

'সুদীপ্তবাবু, ভালো করে দেখুন তো, ঘরে কি এমন কোনও জিনিস দেখছেন যেটা আপনাদের নয়?'

সুদীপ্ত উঠে দাঁড়াল। ঘোর-লাগা মানুষের মতো কয়েক পা এগিয়ে গেল শুক্লার মৃতদেহের দিকে। বারবার চোখ মুছে দেখতে লাগল চারপাশটা। ওর দেখার ভঙ্গিটা এমন যেন অচেনা কোনও ফ্ল্যাটে হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছে।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর ঘাড় নাড়ল সুদীপ্ত। না, নিজেদের ছাড়া অন্য কারও জিনিস ওর নজরে পড়েনি।

রাজতনু হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সুদীপ্তর কথায় ও চমকে উঠল। দীর্ঘশ্বাস থেমে গেল মাঝপথে।

'আমাদের ইস্তিরিটা তো খারাপ ছিল! ওটা দিয়ে শুক্লার মুখ পুড়ল কী করে?'

রাজতনু যেন চাবুকের বাড়ি খেয়ে পলকে ঘুরে দাঁড়াল সুদীপ্তর দিকে : 'তার মানে!'

সুদীপ্ত সব বলল। যদিও ও বুঝতে পারছিল না এই ছোট্ট ব্যাপারটায় এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে।

'আমাদের ইস্তিরিটা খারাপ ছিল। তো ভরসা করে এখানকার কোনও ইলেকট্রিকের দোকানে সারাতে দিইনি। আমি...।'

'আপনার ওয়াইফ আপনাকে না জানিয়ে ওটা সারিয়ে রাখেননি তো?' রাজতনু তড়িঘড়ি জানতে চাইল।

'না, না। এই তো, আজ সন্ধেবেলা পড়াতে বেরোনোর সময়েও ইস্তিরিটা নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে। শুক্লা বলছিল, হাজরা রোডের ওখানে কোনও বড় দোকান থেকে ইস্তিরিটা সারিয়ে নিয়ে আসতে।' হঠাৎই কেঁদে ফেলল সুদীপ্ত। জড়ানো গলায় বলল, 'আমার এমনই কপাল যে, ওর লাস্ট রিকোয়েস্টটাও রাখতে পারলাম না। ওঃ গড...।'

রাজতনু ততক্ষণে রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে।

ইলেকট্রিক ইস্তিরির পাশাপাশি ও এবার একজন ইলেকট্রিক মিস্তিরিকে দেখতে পাচ্ছিল।

দু-আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ইলেকট্রিক ইস্তিরিটা সারাল কে?

ও সুদীপ্তকে জিগ্যেস করল, 'কোনও ইলেকট্রিক মিস্তিরি কি কখনও আপনার এই ফ্ল্যাটে এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে। রঞ্জন নামে একটা ছেলে মাঝে-মধ্যে আসে। বিবেকানন্দ রোডে "মা শীতলা ইলেকট্রিক"-এ কাজ করে।'

'রঞ্জন লাস্ট কবে এসেছে?'

একটু চিন্তা করে সুদীপ্ত বলল, 'সে প্রায় মাসখানেক আগে। একটা নতুন প্লাগ পয়েন্ট করে দেওয়ার জন্যে ওকে ডেকেছিলাম—।'

'আজ আপনার অ্যাবসেন্সে রঞ্জন এসে ইস্তিরিটা সারিয়ে দিয়ে যায়নি তো?'

সুদীপ্ত এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল : 'না—অসম্ভব। শীতলা ইলেকট্রিক বা লোকাল কোনও দোকান থেকে এটা সারাব না, আমার আর শুক্লার মধ্যে একজ্যাক্টলি সেই কথাই হয়েছিল—।'

রাজতনু চুপ করে গেল। এখন আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। যা জানার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে।

ঘরের দরজার দিকে তাকাল রাজতনু। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে ফ্ল্যাটের প্রতিটি আসবাবপত্র দেখল। তারপর তাকাল শুক্লার মৃতদেহের দিকে।

ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। আন্দাজ করতে চেষ্টা করল ঠিক কীভাবে ঘটনাগুলো পরপর ঘটে গেছে।

মৃতদেহ ছুঁয়ে দেখেনি রাজতনু। তবে রক্তের জমাট বাঁধার ধরন আর ওপর-ওপর দেখে ওর মনে হয়েছে শুক্লা খুন হয়েছে দেড়-দু-ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ, সুদীপ্ত টিউশানিতে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই খুনি ফ্ল্যাটে ঢুকেছে। শুক্লার সঙ্গে কথা বলে ইস্তিরিটা সারিয়েছে। শুক্লাকে কাবু করে খিদে মিটিয়েছে। সম্ভবত গলা টিপে খুন করেছে ওকে। এবং সবশেষে বিকৃত মনের তাড়নায় ইলেকট্রিক ইস্তিরিটা মেয়েটার মুখের ওপরে রেখে সুইচ অন করে দিয়েছে। তারপর...তারপর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে সিঁড়ি নেমে পৌঁছে গেছে বাইরের রাস্তায়...মানুষজনের

BanglaBook.org

ভিড়ে মিশে গেছে।

রাজতনু জানে, ফোরেনসিক পরীক্ষা না করে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে ওর মনে হল, ছবিটা ও খুব একটা ভুল আঁকেনি।

না, মেয়েটাকে খুন করার পর খুনি কখনওই ইস্তিরি সারাতে বসবে না। যতই সাইকোপ্যাথ হোক না কেন, খুনের পর কোনও খুনিই বেশিক্ষণ স্পটে থাকতে চায় না।

তা ছাড়া রাজতনুর মনে হল, খুনি আগে থেকেই সুদীপ্তদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। জেনেছে ওদের রোজকার রুটিন। এগুলো ভালো করে জানা না থাকলে কোনও খুনিই ফ্ল্যাটে ঢুকে খুন করার ঝুঁকি নেবে না।

বারবার খতিয়ে দেখে রাজতনুর মনে হল, ওর ভাবনায় কোনও ভুল নেই।

আর তাই যদি হয়, তা হলে খুনি গত একমাস কি দু-মাস এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। খুনির ফটো দেখালে এই ফ্ল্যাটবাড়ির কেউ, বা লোকাল কোনও দোকানদার, হয়তো খুনিকে চিনে ফেলতে পারে। বলতে পারে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই ছেলেটাকে আমি....।'

ঘামতে শুরু করল রাজতনু।

ওর মনে পড়ল, সুচরিতার 'ক্লোজ্‌ড' কেস ফাইলে সুদেব সামন্তর ফটো রয়েছে। সেই ফটো এককপি নিয়ে রাজতনু অনায়াসে খোঁজখবরের কাজ শুরু করতে পারে।

চিন্তায় ও এতই বিভোর ছিল যে, ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়া পাঁচ-ছ'জন পেশাদার মানুষকে খেয়ালই করেনি।

ওর ঘোর ভাঙল পশুপতি চন্দ্রের ডাকে।

'স্যার, ফোরেনসিক আর ফিঙ্গারপ্রিন্টের লোকজন সব এসে গেছে—।'

পনেরো

সুদেব সামন্তর দোকানের কাছে এসে প্রমিতার মাথার ভেতরটা কেমন গুলিয়ে গেল। এখানে আসার আগে ঠান্ডা মাথায় অনেক কিছু ছক কষেছিল। মনে-মনে বেশ কয়েকবার সুদেবের সঙ্গে কথাবার্তার রিহার্সালও দিয়েছিল। কিন্তু সুদেবকে দোকানের সামনের ধাপিতে বসে থাকতে দেখেই ওর সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

সুদেবের দোকানে আসবে বলে প্রমিতা যখন তৈরি হচ্ছিল তখন পরমেশ বাড়িতে ছিল না। থাকার কথাও নয়। কারণ, ঘড়িতে তখন সবে চারটে। শীত আসব-আসব করছে বলে রোদটা একটু নরম, আর বাতাসে মৌসম বদলের খবর।

প্রমিতা জানে, পরমেশের আসতে-আসতে সাতটা কি সাড়ে সাতটা। এখন দিল্লির কী একটা প্রজেক্টের কাজ চলছে বলে ব্যস্ততা আর চাপ বেড়েছে। তাই ওর ফিরতে রোজই দেরি হয়।

বুবুও এখন বাড়িতে নেই, একটু আগে ওকে ঘুম থেকে তুলে সুধীরবাবুদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে গেছে রুপি। প্রমিতাদের নতুন কাজের মেয়ে। সুতরাং প্রমিতা নিশ্চিন্ত হয়ে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজছিল।

আয়নায় যে-মুখটা ধরা পড়েছিল সেটা প্রমিতার পছন্দ হল।

গোল ফরসা মুখ। বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশে পৌঁছলেও ভাঁজহীন মুখে তার কোনও চিহ্ন নেই। চোখ সামান্য টানা-টানা। এখনও মনে আছে, বিয়ের আগে এই চোখ নিয়ে পরমেশ একটা কবিতা লিখেছিল। কবিতাটা মুখস্থ না থাকলেও তার একটা লাইন প্রমিতার মনে আছে : '...প্রমিতার চোখ প্রতিমার মতো...।' রিতুর চোখও এইরকম ছিল। প্রমিতার মনে হল, আয়নার কাচের ওপার থেকে তাকিয়ে থাকা চোখ দুটো প্রমিতার নয়—সুচরিতার। ও যেন গভীর ভালোবাসার চোখে মায়ের যুদ্ধযাত্রা দেখছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে সাজগোজ করছিল। পাউডার, ক্রিম, লিপস্টিক, সিঁদুরের সরু রেখার নীচে ছোট্ট কালো টিপ—কোনওটাই বাদ দিল না। তারপর একটা হালকা সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি বেছে নিল। তার সঙ্গে মাননসই ব্লাউজ। শাড়ির পাড়ে আর ব্লাউজের হাতায় ঝলমলে কারুকাজ।

পোশাক পরা হয়ে গেলে ছোট-ছোট সবুজ পাথর বসানো একটা হার গলায় পরে নিল। কানের লতিতে একই পাথরের দুল। তারপর আয়নার কাছ থেকে কয়েক হাত পিছিয়ে দাঁড়াল। আপাদমস্তক পরখ করল নিজেকে।

সত্যিই ওকে স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর দেখাচ্ছে।

রিতুর কথা মনে পড়ে গেল। বিয়েবাড়ি যাওয়ার সময় প্রমিতা যখন সাজত

pathagar.net

তখন রিতু গয়না পরা, শাড়ির ভাঁজ ধরা, সেফটিপিন লাগানো, এসব ব্যাপারে হেল্‌প করত। সাজগোজ শেষ হয়ে গেলে ও কিছুক্ষণ হাঁ করে মাকে দেখত। তারপর মায়ের কাছে এসে কানে কানে বলত, 'মাম, ফ্যান্টা দেখাচ্ছে। বাপিটা হেভি লাকি।' এবং 'চুক' করে মায়ের কানের পাশটায় একটা চুমু খেত।

এখন রিতুর সেই তারিফ টের পেল প্রমিতা। বুঝতে পারল, রিতু চলে যাওয়ায় শুধু মেয়ে নয়, একজন সইকেও হারিয়েছে ও।

সবশেষে শাড়িতে হালকা পারফিউম স্প্রে করে ছোট্ট একটা হাতব্যাগ সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরোল প্রমিতা। হাঁটা দিল 'সামন্ত ইলেকট্রিক'-এর দিকে। মনের জোর যাতে ক্ষয়ে না যায় সেদিকে মনোযোগ দিল। রিতুর মৃতদেহের সেই সস মাখানো ছবিটা প্রমিতাকে মনের জোর ধরে রাখতে সাহায্য করছিল।

এই মুহূর্তে যদি পরমেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তা হলে পরমেশ কী ভাববে? ভাববে প্রমিতা অভিসারে বেরিয়েছে?

হ্যাঁ, অভিসার। সাপের মতো খল, শিয়ালের মতো ধূর্ত, চিতার মতো ক্ষিপ্র, আর বাঘের মতো হিংস্র—এরকম একজন খুনির সঙ্গে ওর আজ গোপন মিলন। না, আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, আজ থেকে অভিসারের খেলা শুরু।

লাল পরেশনাথ, সাদা পরেশনাথ, হলদে পরেশনাথের মন্দিরগুলো ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল প্রমিতা। হালসীবাগান পেরিয়ে নীরোদবিহারী মল্লিক রোডে এসে থমকে দাঁড়াল।

রাস্তায় বিকেলের ব্যস্ততা। তবে এ-রাস্তাটায় গাড়ি চলে কম, লোকজনই বেশি। এ ছাড়া যানবাহন বলতে সাইকেল ভ্যান আর কেক-পাঁউরুটির ভ্যান।

মোড়ের মাথায় এসে ডানদিকে ঘুরে পা চালাল প্রমিতা। বেকারি থেকে কেক-পাঁউরুটির গন্ধ বেরোচ্ছে। তার সামনে দাঁড়ানো দশ-বারোটা ভ্যান। দুপাশের ফুটপাতে স্কুলে-না-যাওয়া বাচ্চাদের ভিড়। ওরা ছুটোছুটি করে খেলছে। কোথাও বা বেঞ্চি পেতে কিছু লোক বসে আছে—গল্পগুজব করছে।

রাস্তাটা পুব-পশ্চিম বরাবর লম্বা হওয়ায় বিকেলের রোদ অনায়াসে ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। প্রমিতা চোখের ওপরে হাতের পাতা মেলে আড়াল তৈরি করল। ডানদিকে খানিকটা হেঁটে এগিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তায় ঘুরল।

উলটোদিকেই সুদেব সামন্তর দোকান। দোকানের সামনে একটা চওড়া সিঁড়ির ধাপ। সেই ধাপে বসে সিগারেট টানছে সুদেব।

দোকান থেকে খানিকটা দূরে একটা কর্পোরেশনের কল। সেখানে জলের লাইন পড়েছে। কয়েকটা মেয়ে বালতি আর কলসি বসানো নিয়ে ঝগড়া করছে।

সুদেব অলসভাবে সিগারেটে টান দিচ্ছিল আর ঝগড়া-করা মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

একটা বড় শ্বাস টেনে নিয়ে রাস্তা পার হল প্রমিতা। ওকে রাস্তা পার হয়ে আসতে দেখেই চমকে উঠল সুদেব। হাতের সিগারেটটা নর্দমা লক্ষ করে ছুড়ে দিয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল। সেই প্রফেসারের বউটা না? এখানে হঠাৎ কী মতলবে? চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করবে নাকি? করলে সুদেবও ছাড়বে না। ওর মেয়েকে যে রেপ করে খুন করা হয়েছে সেটা চেঁচিয়ে জানিয়ে দেবে পাবলিককে। বড়লোকী দমড় একদম পিছনে ঢুকিয়ে দেবে।

সন্দেহের কাঁটা বিঁধছিল সুদেবের বুকে। চোখ সরু করে ও দেখতে লাগল প্রমিতাকে। 'মেয়েছেলেটা দেখছি আমার দিকেই এগিয়ে আসছে....।' ভাবল ও। মনে-মনে একটা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল।

শুধু সুদেব কেন, প্রমিতাকে লক্ষ করছিল অনেকেই। কারণ, এরকম সুন্দর সাজে সুন্দরী কোনও মহিলা একা এদিকে খুব একটা আসে না। কিন্তু প্রমিতার সেদিকে নজর ছিল না। ও সুদেবকে দেখছিল। আর ওর মাথার ভেতর থেকে রিতু চাপা গলায় বারবার বলছিল, 'সাবধান, মাম। কেয়ারফুল। লোকটা কিন্তু ডেঞ্জারাস...।'

সত্যি সুদেবকে সুন্দর দেখতে। কী সুন্দর কোঁকড়া চুল! নেপালিদের মতো ফরসা গায়ের রং। নাক-মুখ বেশ ধারালো। মুখে একটা ভিজে বেড়াল গোছের বোকা-বোকা ভাব থাকলেও সেটা যে আসলে ছদ্মবেশ প্রমিতা জানে। আরও জানে, ওর বাইরেটা যত সুন্দর ভেতরটা ততই বিকৃত, বীভৎস।

সুদেবের কাছে চলে এল প্রমিতা। ফুটপাতে উঠে পড়ল। এইবারই আসল অভিনয়ের শুরু। ও পারবে তো?

ভেতর থেকে সুচরিতা ফিসফিস করে বলছিল, 'তুমি পারবে, মাম! ঠিক পারবে...।'

সুদেব প্রমিতার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আঁচ করতে চাইছিল, প্রফেসারের বউটা ওর কাছে কেন এসেছে।

প্রমিতা একটু ইতস্তত করছিল। একবার ফুটপাতের দিকে চোখ নামাচ্ছিল, আর-একবার তাকাচ্ছিল সুদেবের দিকে। কাল্পনিক সংলাপগুলো বহুবার আওড়ে অভ্যেস করেছে বাড়িতে। এখন সেগুলো বলার সময় এসেছে।

ভেতর থেকে রিতু ওকে ধাক্কা দিল : 'বলে ফ্যালো, মাম—প্রথম লাইনটা বলে ফ্যালো। এক্ষুনি বলো।'

প্রমিতা সুদেবের চোখে তাকাল। নরম গলায় বলল, 'আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি—।'

সুদেব চমকে উঠল। এরকম কথা ও আশা করেনি। তাই থতমত খেয়ে জিগ্যেস করল, 'ক্ষমা! কীসের ক্ষমা?'

pathagar.net

'অনেক ব্যাপারে।' বলল প্রমিতা, 'তার মধ্যে একটা তো....আমার হাজব্যান্ড এখানে এসে আপনার গায়ে হাত তোলার চেষ্টা করেছিল....মানে....।'

প্রমিতাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল সুদেব : 'ছি, ছি....কী যে বলেন, বউদি! সে তো কয়েকমাস আগের ব্যাপার। ও আমি ভুলেই গেছি....।'

কথা বলছিল, আর প্রমিতাকে দেখছিল। হালকা সবুজ শাড়িতে কী সুন্দর মানিয়েছে! দেখতে ঝিনচ্যাক না হলেও তার বেশ কাছাকাছি। মেয়েটাও দেখতে হেভি ছিল। হবে না! যেমন ছাঁচ তেমনই তো সন্দেশ হবে!

কথা বলতে-বলতে প্রমিতা ধীরে-ধীরে সহজ হচ্ছিল। শুরুতে যতটা অসুবিধে হচ্ছিল, এখন আর ততটা হচ্ছে না। আসলে সুচরিতা ভেতর থেকে প্রমিতাকে সাহায্য করছিল।

সুদেবের কথার ঢং প্রমিতাকে এগিয়ে দিল। ও বুঝল, সুদেবও অভিনয় করছে, তবে প্রমিতার চেয়ে অনেক ভালো। প্রমিতা যেন অজান্তেই এক অভিনয়-প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে ফেলল।

'শুধু ওই ব্যাপারটা নয়। আপনাকে....আপনাকে আরও কতগুলো কথা আমার বলার আছে।'

'বলুন না—।'

'এখানে....মানে....এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে...অনেকে দেখছে...।'

প্রমিতা চারপাশে একবার চোখ বোলাল।

সুদেব সেটা লক্ষ করে ডানদিকে আর বাঁ-দিকে তাকাল। দু-চারজন কৌতূহলী লোক সুদেব আর প্রমিতাকে দেখছে। জলের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মেয়েও তাকিয়ে আছে এদিকেই।

তাকানোরই কথা। কারণ, প্রমিতার পোশাক আর সুদেবের পোশাকে বিস্তর ফারাক। প্রমিতার উজ্জ্বল সাজের পাশে সুদেবের সাধারণ টি-শার্ট আর ময়লা প্যান্ট যেন ঝলমলে বিয়েবাড়ির পাশে অন্ধকার বস্তি।

প্রমিতা কী বলতে চাইছে সেটা এতক্ষণে সুদেবের মাথায় ঢুকল। ও তাড়াতাড়ি বলল, 'যদি কিছু মাইন্ড না করেন...মানে আমার দোকানে বসতে পারেন। আসলে ভেতরটা খুব নোংরা। যন্ত্রপাতি, তার-টার সব ছড়িয়ে আছে—আপনার প্রবলেম হবে....।'

প্রমিতা হাসল। পরমেশ এ-হাসি দেখলে বলত, এখনও পুরোনো ধার কমেনি।

'না, না, প্রবলেম কীসের! এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার চেয়ে বরং সেটাই ভালো....।'

ওরা দুজনে ঢুকে পড়ল দোকানে।

সুদেব প্রথমে ঢুকে চটপটে হাতে দোকানের মেঝে থেকে এটা-সেটা সরিয়ে

খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করল। এক কোণ থেকে একটা টুল নিয়ে এসে ফাঁকা জায়গাটায় রাখল। তারপর ঝরঝরে টেবিল-পাখাটা চালিয়ে দিল। খনখন শব্দ আর হাওয়া শুরু হল।

টুলের ওপরটা দু-তিনবার হাত দিয়ে মুছে প্রমিতাকে বলল, 'বসুন, বউদি। গরিবের দোকান—আপনার কষ্ট হবে। কিছু মনে করবেন না।'

প্রমিতা বসল। ক্ষুরধার নজরে শত্রুর আস্তানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। গভীর শ্বাস টেনে দোকানের গন্ধ নিতে চাইল। শত্রুকে ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে চায়।

তামার তারের একটা কাটিম টেনে নিয়ে তার ওপরে বসে পড়ল সুদেব। একটু কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করল। তারপর বলল, 'বলুন, বউদি, কী বলবেন বলুন—।'

প্রমিতা মাথা নিচু করে সিমেন্ট-চটা মেঝের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমার মেয়ে সুচরিতা মারা গেছে আপনি জানেন। মানে....ছ'-মাস আগে ও....ও....ওকে মার্ডার করা হয়েছে। জুন মাসের পাঁচ তারিখে। রবিবার ছিল দিনটা....' প্রমিতা ফুঁপিয়ে উঠল হঠাৎ। ওর শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপর কয়েকবার নাক টেনে বলল, 'খুন করার আগে খুনি ওকে নোংরা করে দিয়েছিল....তারপর ব্রুটালি খুন করেছে।' প্রমিতা চুপ করে গেল। ওর বড়-বড় শ্বাস পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার পর ভাঙা গলায় ও বলল, 'কী বলব আপনাকে....আমি আর আমার হাজব্যান্ড শোকে-দুঃখে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা....।'

প্রমিতার কথা শুনতে-শুনতে সুদেবের মন খারাপ হয়ে গেল। পাপবোধের একটা হালকা ছোঁয়া কোথা থেকে যেন তৈরি হয়ে গেল ওর বুকের ভিতরে। মনে হল, মেয়েটাকে খুন করার কী দরকার ছিল! কিংবা ওইসব নোংরা কাজ করারই বা কী দরকার ছিল! এক-একসময় এমন একটা পাগল-করা ঝোঁক আসে যেটা ভালো-মন্দ সবকিছু ভাসিয়ে দেয়। শরীরটা খাই-খাই করে ওঠে।

নানান কথা ভাবতে-ভাবতে প্রমিতার কথা থেকে মন সরে গিয়েছিল সুদেবের। যখন খেয়াল হল তখন প্রমিতা বলছে, '....বেশ মনে আছে, কোর্টেও আমি অন্যায়ভাবে যা-তা বলেছি আপনাকে। কিন্তু ওই যে বললাম, আমাদের মাথার ঠিক ছিল না। আমরা একটা জেদে অন্ধ হয়ে ছিলাম।

'কিন্তু ঘোর কেটে যাওয়ার পর উঠতে-বসতে শুধু বিবেকের জ্বালা। আপনার কাছে এসে ''আপনি কিছু মনে করবেন না, সুদেববাবু'' এই কথা ক'টা না বললে যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। এই কথা ক'টা বলে জ্বালা জুড়োনোর জন্যে গত দু-মাস ধরে আমি আপনার পেছন-পেছন ঘুরেছি....কিন্তু সামনে এসে বলার

pathagar.net

সাহস পাইনি...।'

'মাস্টার স্ট্রোক, মাম, মাস্টার স্ট্রোক!' খুশিতে ডগমগ হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল সুচরিতা।

সুদেব সামন্তকে ফলো করার সময়ে প্রমিতার কখনও-কখনও যেন মনে হয়েছে সুদেব ফলো করার ব্যাপারটা টের পেয়েছে। তাই সেটার একটা জুতসই সাফাই খুঁজছিল ও। এই মুহূর্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা সাফাইটা ওর মনে ধরল। সত্যিই তো, কোনওরকম ভাবনাচিন্তা না করেই কী সুন্দরভাবে ও বলটা গোলে ঠেলে দিল। আর সুদেব দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গোল খেয়ে গেল।

'গত ক'দিনে আমার অবস্থা যা হয়েছিল তা বলার নয়।' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল প্রমিতা, 'মনে হচ্ছিল, বুকের ভেতরে আগুন জ্বলছে...জ্বলে পুড়ে সব খাক হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে....' চোখ মুছল প্রমিতা। তারপর: 'আপনি আমাদের মাপ করে দেবেন।' সুদেবকে লক্ষ করে হাতজোড় করল।

সুদেব প্রমিতার হাত চেপে ধরল : 'ছি-ছি, বউদি! এ কী করছেন! আপনাদের কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। আমি কিছুই মনে করিনি—।'

'শোকে-তাপে আমরা অ্যাবনরম্যাল হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন....।' আবার ওর চোখে জল এল।

প্রমিতার হাত দুটো আস্তে করে নামিয়ে দিল সুদেব : 'শান্ত হোন, বউদি—শান্ত হোন। জল খাবেন?'

প্রমিতা মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

সুদেব তখন উঠে দোকানের পিছনদিকটায় গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই একটা স্টিলের গ্লাসে জল নিয়ে ফিরে এল। প্রমিতার দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিল। হাতের মুঠোয় ধরা রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছল। তারপর খালি গ্লাসটা সুদেবকে ফিরিয়ে দিল।

সুদেব গ্লাসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রমিতাকে দেখতে লাগল।

এতক্ষণ ধরে যা-যা বলল, সেগুলো সব সত্যি? মেয়েছেলেটার অন্য কোনও মতলব নেই তো! না, তা বোধহয় নেই। হয়তো এতদিনে ওদের ভুল ভেঙেছে। একে মেয়ে বলে কথা। তার ওপর অত সুন্দর দেখতে। ওরকম মেয়ে ইয়ে আর খুন হলে বাবা-মা কিছুদিনের জন্য অ্যাবনরম্যাল হয়ে যেতেই পারে। কিন্তু বউদির হাত দুটো কী নরম!

না, তবুও সাবধান থাকা দরকার। সবসময় সাবধান থাকাটা সুদেব সামন্তর জীবনের একটা অঙ্গ।

সুদেব বলল, 'বউদি, আপনারা পুরো ব্যাপারটা ভুলে যান। আমি আপনাদের

মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলাম—তাই কিছু মাইন্ড করিনি। তবে আমিও তো মানুষ! হয়তো দু-এক সময় বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি। তার জন্যে এই ছোট ভাইটাকে ক্ষমা করে দেবেন....।'

সুদেবের কথায় প্রমিতা ভেতরে-ভেতরে টলে গেল। কী সুন্দর করে কথা বলছে অশিক্ষিত ছেলেটা! ও সত্যি-সত্যিই হয়তো কিছু করেনি। নিছক একরোখা জেদের বশে প্রমিতা আর পরমেশ হয়তো ছেলেটাকে সন্দেহ করে এসেছে।

কিন্তু এই ছেলেটাই তো কোর্টরুমের বাইরে প্রমিতাদের দিকে তাকিয়ে চোখ মেরেছিল!

প্রমিতা দোলাচলে দুলতে লাগল।

ও সুদেবের দিকে তাকিয়ে একচিলতে হাসল : 'ওসব ভুল বোঝাবুঝির কথা ভুলে যান, ভাই। আমাদের বাড়ির ইলেকট্রিকের কাজের জন্যে কখনও ডাকলে রাগ করে ''না'' বলে দেবেন না যেন।'

সুদেব কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'আপনি দাদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। পুরোনো কথা ভুলে যেতে বলবেন....প্লিজ।'

উঠে দাঁড়াল প্রমিতা। বলল, 'আপনার দাদা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাও আমি আবার বলব।'

দোকানের বাইরের দিকে পা বাড়াল প্রমিতা।

সুদেব পিছন থেকে বলল, 'আবার আসবেন, বউদি—।'

'আসব।' সিঁড়ির ধাপ থেকে ফুটপাতে নেমে থমকে দাঁড়াল : 'একটা কথা। আমি যে এখানে এসেছি সেটা আপনার দাদাকে বলবেন না। ওকে না জানিয়ে এসেছি।'

সুদেব ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না....।' তারপর কী ভেবে আর-একবার বলল, 'আবার আসবেন....।'

ছোট্ট করে 'হ্যাঁ, আসব' বলে পা চালাল প্রমিতা।

সুদেব দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রমিতার চলার ছন্দ লক্ষ করতে লাগল।

পিছনটা একটু ভারী। কিন্তু এই বয়েসেও বেশ টাইট ফিগার। লড়লে মজা পাওয়া যাবে।

দোকানঘরের ভেতরে তখনও প্রমিতার পারফিউমের গন্ধ ভাসছিল। চোখ বুজে মাথা পিছনে হেলিয়ে সুদেব লম্বা করে শ্বাস নিল।

'আ-আ-আঃ!'

বাড়ির দিকে যেতে-যেতে প্রমিতা নিজের অভিনয়ের তারিফ করছিল আর সুদেবের কথা ভাবছিল। ছেলেটাও দারুণ অভিনয় করেছে, তবে একটা ব্যাপারে ধরা পড়ে গেছে প্রমিতার কাছে। ছেলেটার নজর প্রায় সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে

pathagar.net

প্রমিতার শরীরে। আর সেই নজরে একটু যেন হ্যাংলামি ছিল। তা ছাড়া হঠাৎ করে হাত চেপে ধরাটা প্রমিতার ভালো লাগেনি।

প্রমিতা একটু অন্যমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই একটা গাঢ় নীল রঙের জিপ ঠিক ওর পাশটিতে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কে যেন ডাকল, 'মিসেস দত্তগুপ্ত—।'

চমকে পাশ ফিরে তাকাল প্রমিতা।

জিপের ড্রাইভিং সিটে বসে আছে সাব-ইনস্পেকটার রাজতনু চ্যাটার্জি। চোখে সানগ্লাস। তাই হঠাৎ করে চিনতে পারেনি প্রমিতা।

'বাড়ি যাচ্ছেন তো? আসুন, উঠে আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিই....।'

চোখে সানগ্লাস থাকলেও প্রমিতা যেন রাজতনুর মুখ দেখে বুঝতে পারল, ও একটু অবাক হয়েছে। এবং সেটা প্রমিতার সাজগোজ দেখে।

ষোলো

গাড়িতে রাজতনু একাই ছিল।

প্রমিতা জিপের সামনের দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে রাজতনুর পাশের সিটে উঠে বসল। রাজতনুর দিকে তাকিয়ে একচিলতে হাসল। ছোট্ট করে বলল, 'থ্যাঙ্কস—।'

রাজতনু গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করেনি। প্রমিতা গুছিয়ে বসতেই গিয়ার দিয়ে গাড়ি চালু করল। বাঁহাতে চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নিল। ওদের দুজনের মাঝে সিটের ওপরে ওটা নামিয়ে রেখে জিগ্যেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

প্রমিতা রাজতনু চ্যাটার্জির দিকে তাকাল।

গায়ে হালকা নীল রঙের একটা হাফশার্ট। প্যান্টের ভেতরে গুঁজে পরেছে। কালো চুলে চকচকে ভাব। চোয়ালের রেখাটা এমনভাবে আঁকা যেন ওটাকে আর নড়ানো যাবে না। ফরসা গালে দাড়ির নীলচে আভা।

প্রমিতাকে প্রশ্নটা করেই রাজতনু আবার সামনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। ব্রেকে পা চেপে বাঁ-দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে হালসীবাগানের দিকে ঢুকে পড়ল।

প্রমিতা কয়েক সেকেন্ড দোনোমনা অবস্থায় ছিল। কী বলবে রাজতনুকে? সত্যি কথা বলবে? নাকি....?

'বুবুর এক ক্লাসমেটের বাড়ি গিয়েছিলাম...ওর পরীক্ষার কিছু পড়া কপি করে আনার জন্যে...।'

কথাটা বলেই প্রমিতার মনে হল ওর হাতে খাতা-টাতা জাতীয় কিছু নেই। শুধু ছোট মাপের একটা হাতব্যাগ রয়েছে। রাজতনু পুলিশের লোক। ও নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করেছে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই নতুন যুক্তি সাজাল প্রমিতা। কেন, কপি করে নিয়ে আসা কাগজটা কি ভাঁজ করে হাতব্যাগে ঢুকিয়ে নেওয়া যায় না? অবশ্যই যায়। কিন্তু সেটা রাজতনু কি সন্দেহের বিষ ছাড়া মেনে নেবে?

রাজতনু বুঝতে পারল যে, প্রমিতা সত্যি কথা বলছে না। হতে পারে চল্লিশ-পেরোনো এই সুন্দরী মহিলার হয়তো কোনও গোপন প্রেমিক আছে। অথবা অন্য কিছু....।

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমাদের থানা এলাকায় আর-একটি মেয়ে খুন হয়েছে। রেপ অ্যান্ড মার্ডার। আপনার...আপনার মেয়ের মতো।'

কথাটা শুনে প্রমিতা যেন ইলেকট্রিক শক খেল। চট করে মুখ ঘোরাল রাজতনুর দিকে : 'কোথায়? কবে?'

রাজতনু সব বলল। সাদা পরেশনাথের সামনে ডানদিকে বাঁক নিতে-নিতে খুন হওয়া মেয়েটার নামও বলল।

pathagar.net

প্রমিতা শুনল। ওর মনে পড়ে গেলে সেই মেয়েটার কথা—সুদেব সামন্ত নিয়মিত যার পিছু নিত।

প্রমিতা মেয়েটার নাম জানে না. তবে বাড়িটা চেনে। ওর ভেতরে একটা দুর্বোধ্য যাতনা শুরু হলো। সেইসঙ্গে চাপা একটা উৎকণ্ঠা।

সেই মেয়েটাই খুন হয়নি তো?

বাড়িটার বর্ণনা জানতে চাইল প্রমিতা।

রাজতনু বলল। প্রমিতা শিউরে উঠল। ওর গায়ে কাঁটা দিল। সুদেব সামন্ত তা হলে থামেনি। এইমাত্র সেই জঘন্য পুরুষটার সঙ্গে ও কথা বলে এল। দেখে বোঝার কোনও উপায়ই নেই যে, সুদেবের ভেতরে একটা লম্বা-জিভ-বের-করা লালা-ঝরানো হিংস্র জন্তু ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে।

রাজতনু প্রমিতাকে দেখছিল। আলতো গলায় জিগ্যেস করল, 'শুক্লা মেয়েটাকে আপনি চিনতেন নাকি?'

চমকে উঠে আমতা-আমতা করতে লাগল প্রমিতা : 'কী বললেন? ওহ্—হ্যাঁ—না, মানে—চিনতাম না। তবে শুনে আপসেট লাগছে।'

'লাগারই কথা।' সামনের দিকে তাকিয়ে রাজতনু বলল, 'লোকটা এত সাংঘাতিক যে, মার্ডার করার পর মেয়েটার মুখের ওপরে একটা ইলেকট্রিক আয়রন বসিয়ে অন করে দিয়ে গেছে...।'

চট করে সুচরিতার মৃতদেহের দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ওঃ!

'আপনার কি মনে হয় এই মার্ডারটাও ওই ইলেকট্রিক মিস্তিরিটার কাজ?'

রাজতনু প্রশ্নটা করামাত্রই প্রমিতা কেমন যেন কাঠ হয়ে গেল। পাড়ায় বোমা-গুলি চললে ঝপাঝপ যেমন দোকানপাটের শাটার বন্ধ হয়ে যায় অনেকটা সেইরকম ঢঙে ওর মনের জানলাগুলো বন্ধ করে দিল।

সতর্ক হয়ে উত্তর দিল, 'কী করে বলব, বলুন। আমি আছি আমার সমস্যা নিয়ে...।'

প্রমিতাদের বাড়ির কাছে এসে জিপ থামাল রাজতনু।

'ধন্যবাদ।' বলে নেমে পড়ল প্রমিতা।

রাজতনু হাসল : 'য়ু আর ওয়েলকাম, ম্যাডাম...। আজ আসি। দরকার পড়লেই ফোন করবেন। আমার মোবাইল নাম্বার তো আপনাদের কাছে আছে—।'

প্রমিতা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, আছে।

রাজতনু সানগ্লাসটা আবার চোখে দিল। তারপর গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

ও চলে যেতেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল প্রমিতা। একটু খারাপ লাগল এই ভেবে যে, রাজতনুকে ও চায়ের আমন্ত্রণ জানায়নি। আসলে একটা আশঙ্কা ওর মনের

ভেতরে কাজ করছিল। চায়ের টেবিলে বসে রাজতনু যদি ওকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে নানান প্রশ্ন করত তা হলে প্রমিতা হয়তো সব প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব দিতে পারত না। ওর আসল অভিসন্ধির আঁচ পেয়ে যেত রাজতনু।

গ্রিলের দরজা খুলে বারান্দায় ঢুকে পড়ল প্রমিতা। চট করে একবার তাকাল হাতঘড়ির দিকে। প্রায় পাঁচটা বাজে। পরমেশ যে এখনও ফেরেনি, সেটা বোঝা যাচ্ছে মারুতিটা বাড়ির সামনে পার্ক করা নেই বলে। হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করে সদর দরজার নাইট ল্যাচ খুলল। দরজার পাল্লাটা ঠেলে দিল ভেতর দিকে।

সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল প্রমিতা। কারণ, 'মাম-মাম' করে ছুটে এসে বুবু ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

তারপরই ওর চোখ পড়ল রুপির দিকে। বয়কাট চুল ময়লা রং মেয়েটা শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রমিতার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সুধীরবাবুদের বাড়ি থেকে বুবু আর রুপি ফিরে এসেছে এটা বোঝা গেল। কিন্তু ওরা বাড়িতে ঢুকল কী করে? ওদের কাছে তো কোনও ডুপ্লিকেট চাবি নেই!

এমন সময় ডুপ্লিকেট চাবি যার কাছে আছে সে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। গায়ে একটা সাদা পোলো নেক টি-শার্ট, আর লুঙ্গি। হাতে এক কাপ চা।

পরমেশ।

পরমেশ অবাক হয়ে দেখছিল সুন্দরী-সাজে দাঁড়িয়ে থাকা বউকে। ওর বয়েস যেন দশ বছর কমে গেছে। অনেকদিন প্রমিতা এইরকম যত্ন করে সাজেনি।

প্রমিতাও তাকিয়ে ছিল পরমেশের দিকে। ও কখন ফিরে এল বাড়িতে?

পরমেশ চায়ের কাপটা সাবধানে ডাইনিং টেবিলে রাখল। তারপর একটু হেসে বলল, 'শরীরটা ভালো লাগছিল না। তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।'

'গাড়ি?' প্রমিতার মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

'গাড়ি মিস্তিরির কাছে। ক্লাচটা বারবার ট্রাবল দিচ্ছিল। তাই ফেরার সময় নীলুদার গ্যারেজে দিয়ে এসেছি....।'

'ও—।' বলে সদর দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল প্রমিতা। তারপর শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল। বুবু ওর পিছু নিল।

ওকে দেখতে-দেখতে চায়ের কাপে চুমুক দিল পরমেশ। নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'তুমি কোথাও বেরিয়েছিলে?'

প্রমিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখটা ঘুরিয়ে তাকাল স্বামীর দিকে। এক লহমা সময় নিয়ে বলল, 'আমি সুদেব সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওকে খুনি ভেবে আমরা যেসব অন্যায় ব্যবহার করেছি, অপমান করেছি, তার জন্যে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম...।'

pathagar.net

পরমেশ যে বেশ অবাক হয়েছে সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা গেল। ও বিড়বিড়

করে বলল, 'ওই ফিল্‌দি জানোয়ারটার কাছে গিয়েছিলে? ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। রিতু বলল, তাই।' খবর-পড়ুয়াদের মতো আবেগহীন গলায় বলল প্রমিতা, 'এখন থেকে রিতু যা-যা বলবে আমি তাই করব।'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভয় পরমেশকে আঁকড়ে ধরল।

রিতু পরমেশকেও কষ্ট দিচ্ছে—কিন্তু মাঝে-মাঝে। সময়ের স্রোত যত বয়ে গেছে সেই কষ্টের তীব্রতাও ধীরে-ধীরে কমে এসেছে। তবে কখনও-কখনও ভয়ঙ্কর আবেগের ঝোড়ো হলকা আচমকা ছুটে এসে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। তখন ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, গলায় দড়ি দিয়ে এক্ষুনি ও রিতুর কাছে চলে যায়।

কিন্তু প্রমিতা! ওর ভেতরের আগুন কাঠকয়লার আঁচের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। রিতু এখনও ওকে পাকে-পাকে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রমিতার জন্য এক অদ্ভুত মায়া টের পেল পরমেশ। ও তাকাল প্রমিতার দিকে। ও তখনও একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে। বুবু ওর শাড়ি খামচে ধরে কী একটা যেন বায়না করছে।

পরমেশ হেসে বলল, 'তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে—।'

প্রমিতা কোনও কথা বলল না। বুবুর হাত ধরে ঢুকে পড়ল শোওয়ার ঘরে।

শনিবার দিন পরমেশের ছুটি থাকলেও ও মাঝে-মাঝেই কলেজে যায়। ও ছাড়াও দু-তিনজন অধ্যাপক শনিবারে আসেন। কারণ, শনিবারে এলে নিরিবিলি বসে কাজ করা যায়। সময়ে-সময়ে কোনও প্রজেক্ট স্টুডেন্ট বা রিসার্চ স্কলারও ওই দিনটায় সায়েন্স কলেজে আসে।

আজ শনিবার। বুবুর স্কুল ছুটি। এগারোটা বাজতে-না-বাজতেই পরমেশ সায়েন্স কলেজে রওনা হয়ে গেছে। প্রমিতার রান্নাবান্নার কাজও শেষ। ও শোওয়ার ঘরে চিত হয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করছিল। আর বারবার চোখ ফেরাচ্ছিল দেওয়াল-ঘড়ির দিকে। ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজলেই ও রাস্তায় বেরোবে। 'সামন্ত ইলেকট্রিক'-এ যাবে।

সময়মতো তৈরি হয়ে নিল। আজ সাজগোজের ঘটা না থাকলেও স্নিগ্ধ মনোরম একটা প্রলেপ রয়েছে। রোজ একইরকম চড়া সাজগোজের বহর দেখলে সুদেব সন্দেহ করতে পারে।

ড্রইং-ডাইনিং-এ এল প্রমিতা। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে 'মেকানো' গেম। তাকে ঘিরে বুবু আর রুপি খেলা করছে।

রুপি আর বুবুকে প্রমিতা বলল, 'আমি একটু আসছি। বড়জোর পনেরো কি

কুড়ি মিনিট। তারপরই ফিরে আসব। কেউ এসে বেল বাজালেও দরজা খুলবি না। কোনও সাড়া দিবি না—বুঝলি?'

বুবু আর রুপি ঘাড় নেড়ে বোঝাল যে, ওরা বুঝেছে। তারপর বুবু মামের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'মাম, দুটো এক্লেয়ার্স নিয়ে আসবে। প্লিজ। তুমি বলেছিলে...।'

প্রমিতা জানে, 'তুমি বলেছিলে' বলাটা বুবুর একটা মজার স্বভাব। কোনও আবদার থাকলেই ও তার শেষে 'তুমি বলেছিলে'-টা জুড়ে দেয়।

'ঠিক আছে। আনব।' বলে ডাইনিং টেবিল থেকে টাকাপয়সা রাখার ছোট্ট পার্সটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল। তারপর নাইট ল্যাচের চাবিটা নিয়ে দরজা টেনে দিয়ে সোজা রাস্তায়।

'সামন্ত ইলেকট্রিক'-এ যাওয়ার গোটা রাস্তাটা ভাবনায় ডুবে রইল প্রমিতা।

গত বুধবার ও একটা মোবাইল ফোন কিনেছে। ফোনটা কেনার সময় ত্রিযামা আর পরমেশ সঙ্গে ছিল।

পাঁচটা নাগাদ পরমেশকে মোবাইলে ফোন করে প্রমিতা চলে গিয়েছিল সায়েন্স কলেজে, সোজা পরমেশের ঘরে। কথা ছিল মানিকতলায় পরমেশের একটা চেনা দোকান থেকে সেটটা কেনা হবে। প্রমিতা পরমেশকে বলল, ত্রিযামাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য, কারণ ও মোবাইল ফোনের নানা কারিকুরি ভালো বোঝে।

শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজন গিয়ে স্যামসাঙ আর-টু টুয়েন্টি সেটটা কিনেছে।

ফোনটা হাতে নিয়ে প্রমিতা কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওর মনে হল, রিতুর ফোনটাই কেউ যেন ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

গাঢ় নীল আর রুপোলি রঙের সেটটা মাপে ছোট, চ্যাপটা মতন। অন করলে সুন্দর নেশা-ধরানো একটা নীল আলো জ্বলে ওঠে ত্রিযামা ফোনটা নিয়ে বোতাম টিপে কীসব সেট করে প্রমিতার হাতে দিয়ে বলল, 'আন্টি, আপনি ফোনটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে আট থেকে দশ ঘণ্টা চার্জ দিন, আমি কাল কি পরশু আপনাদের বাড়িতে গিয়ে সব সেট করে দিয়ে আসব।'

'কী করে ফোন-টোন করতে হয় সেটা দেখিয়ে দিয়ো....' প্রমিতা বলল।

ত্রিযামা হেসে বলল, 'স্যারই তো আছেন...।'

'তা আছে, তবে তোমাদের স্যার শুধু ফোন করতে জানে আর ধরতে জানে—বাকি সব খুঁটিনাটির অত খোঁজ জানে না। সেগুলো তোমার থেকেই বরং শিখে নেব।'

পরমেশ হেসে বলেছিল, 'ঠিকই বলেছ। এই ব্যাপারটায় ত্রিযামা আমার টিচার।'

আসলে প্রমিতা ত্রিযামার সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাইছিল। তাই মোবাইল ফোনের খুঁটিনাটি নিয়ে এত ছুতো।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কলেজ ছুটির পর ত্রিযামা এসেছিল পরমেশদের বাড়িতে।

pathagar.net

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর প্রমিতা ওকে দোতলায় রিতুর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন মোবাইল ফোনটা নিয়ে ত্রিযামার কাছে অনেক কিছু শিখে নিল প্রমিতা। যে-রিং-টোনটা রিতুর ফোনে ছিল বলে অরিন বলেছিল, অনেকগুলো রিং-টোন পরীক্ষা করে-করে সেই রিং-টোনটাই ত্রিযামাকে দিয়ে সেট করাল। তারপর কয়েকবার বাজাল সেই মিষ্টি সুরটা।

ত্রিযামা ফোনবুকে বেশ কয়েকটা জরুরি ফোন নম্বর স্টোর করে দিল। ওর ফোন নম্বরটাও ঢুকিয়ে দিল। তারপর প্রমিতার নম্বরটা নিজের মোবাইলে সেভ করে নিল।

এইসব কাজ করার সময় প্রমিতা চুপ করে রিতুর কথা ভাবছিল। আর ঘরের সুইচবোর্ডটার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল।

সুচরিতাকে নিয়ে অনেক কথাই হল ত্রিযামার সঙ্গে। ওর সঙ্গে কথা বলে প্রমিতা বুঝতে পারল, সুচরিতার শূন্যতা এই ছোট মেয়েটা কী অন্তর দিয়েই না অনুভব করেছে!

কথার শেষে হঠাৎই এক অদ্ভুত প্রশ্ন করেছে প্রমিতা, 'আচ্ছা, ত্রিযামা, তুমি তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছ। তুমি ওই সুইচবোর্ডটা খারাপ করে দিতে পারবে?'

'তার মানে?' অবাক হয়ে পালটা প্রশ্ন করেছে ত্রিযামা।

'তার মানে বোর্ডের ওই সুইচগুলো টিপলে যেন আলো না জ্বলে, পাখা না ঘোরে।'

'তাতে লাভ?' ত্রিযামার কপালে ভাঁজ পড়েছে।

'লাভ?' উদাসভাবে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল প্রমিতা। তারপর হোঁচট খাওয়া গলায় বলল, 'বোর্ডটা খারাপ হওয়ার পর...আমি...আমি একজন ইলেকট্রিক মিস্তিরিকে ডাকতে চাই। আমি চাই, ওই...ওই লোকটা এসে এ-ঘরের লাইনটা সারাক।'

ত্রিযামা অবাক হয়ে প্রমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর জিগ্যেস করল, 'কোন লোকটা, আন্টি?'

'সুদেব—সুদেব সামন্ত। তোমাদের স্যারের সঙ্গে যার হাতাহাতি হয়েছিল। তুমি আর পল্লব সেদিন ওর সঙ্গে গাড়িতে ছিলে...।'

ত্রিযামার সব মনে পড়ে গেল। ওই ঘটনাটা কি সহজে ভোলা যায়!

'ওই লোকটাকে ডেকে লাইনটা সারিয়ে কী লাভ, আন্টি? আপনাদের এরিয়ায় কি আর কোনও ইলেকট্রিক মিস্তিরি নেই?'

'আছে, কিন্তু ওকেই আমার চাই।' ঠান্ডা গলায় বলল প্রমিতা।

'কেন?'

'ওর সঙ্গে আমি ভাব করতে চাই।'

'তারপর?' ত্রিযামা প্রশ্নটা করল এত আলতো গলায় যে, প্রশ্নটা প্রায় শোনাই গেল না। ও অবাক হয়ে নতুন এক প্রমিতাকে দেখছিল।

'তারপর আমার মেয়ে যা বলবে। ওর সঙ্গে....।'

হঠাৎই চুপ করে গিয়েছিল প্রমিতা। আর কোনও কথা বলেনি। শুধু ওর চোখের কোণ ভিজে উঠেছিল।

অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবল ত্রিযামা। তারপর রাজি হল। বলল, 'কাল আমি আর পল্লব এসে সুইচবোর্ডটা খারাপ...মানে, ডিফাংক্ট করে দেব, আন্টি। কিন্তু লোকটাকে ডেকে এনে আপনি আবার বিপদে পড়বেন না তো?'

'না। আমি কেয়ারফুল থাকব। তা ছাড়া সেরকম বিপদ হলে তোমাকে মোবাইলে ফোন করব।'

'কিন্তু তখন যদি আমি দূরে কোথাও থাকি....।'

মলিন হাসল প্রমিতা : 'লোকটাকে আমি দুপুরবেলা...এই দুটো-আড়াইটে নাগাদ ডাকব। তখন বোধহয় তোমরা সায়েন্স কলেজেই থাকবে।'

প্রমিতার কথায় সায় দিল ত্রিযামা।

'তোমাদের স্যার বড় ভালোমানুষ। রিতুর জন্যে ও-ও কম কষ্ট পাচ্ছে না। কিন্তু আমি ওকে এসব কিছু জানাতে চাই না। এই চাপ ও নিতে পারবে না। প্লিজ, তোমরা ওকে কিছু বোলো না। কিন্তু তোমাদের হেল্‌প না পেলে আমার পায়ের তলায় মাটি সরে যাবে। ত্রিযামা, প্লিজ....।' রুদ্ধ গলায় শেষ কথাটুকু বলে ছোট মেয়েটার হাত চেপে ধরল প্রমিতা। ও আর পল্লব একটু হেল্‌প করলেই প্রমিতা পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।

'ছি-ছি, আন্টি, এ কী করছেন! আপনাদের কষ্ট আমরা যথেষ্ট ফিল করি। বললাম তো, কাল দুপুরে আমি আর পল্লব আসব।'

প্রমিতার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুইচবোর্ডটার দিকে তাকাল ত্রিযামা। এ তো খুবই সোজা ব্যাপার! স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে বোর্ডের ওপরের ডালাটা খুলে কয়েকটা সুইচের লাইভ ওয়্যার খুলে দিলেই হবে। তবে তারগুলো খুলতে হবে এমনভাবে, যাতে মনে হয় স্ক্রু ঢিলে হয়ে নিজে থেকেই খুলে গেছে। নইলে সুদেব সামন্তর সন্দেহ হতে পারে।

প্রমিতার কাছ থেকে উঠে সুইচবোর্ডের কাছে গেল ত্রিযামা। ওটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর প্রমিতার দিকে ফিরে বলল, 'রিল্যাক্স, আন্টি। ধরে নিন কাজটা হয়ে গেছে—।'

শুক্রবার দুপুরে সত্যিই কাজটা নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। তাই আজ প্রমিতা রওনা হয়েছে সুদেবকে খবর দেওয়ার জন্য। সুদেবকে গিয়ে ও বলবে, ও যেন দুপুরে, দুটো নাগাদ, সুইচবোর্ডটা দেখতে আসে। তারপর...।

pathagar.net

সতেরো

pathagar.net

সুদেব সামন্ত এসে কলিংবেল বাজাল সওয়া দুটোর সময়।

প্রমিতা জেগেই ছিল। শুধু যে জেগে ছিল তাই নয়, দুরুদুরু বুকে সুদেব সামন্তর কলিংবেল বাজানোর জন্য অপেক্ষা করছিল।

শোওয়ার ঘরের বিছানায় বুবু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পাশে শুয়ে ছিল প্রমিতা। কলিংবেল বাজতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চট করে নিজের মুখটা একবার দেখল। একটা চিরুনি তুলে নিয়ে মাথায় দু-তিনবার বুলিয়ে নিল চটপট। তারপর ড্রইং-ডাইনিং-এ বেরিয়ে এল।

ডাইনিং টেবিলের পাশে মেঝেতে একটা চাদর পেতে রুপি শুয়ে ছিল। হয়তো ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু কলিংবেল বাজতেই ও উঠে বসেছে।

প্রমিতা ওকে বলল, 'তুই শো, আমি দেখছি। বোধহয় ইলেকট্রিক মিস্তিরি এসেছে....।'

দরজার কাছে গিয়ে ম্যাজিক আই-এ একপলক চোখ রেখে দরজা খুলে দিল।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুদেব সামন্ত। হাতে একটা ছোট নাইলনের থলে—বোধহয় যন্ত্রপাতির ব্যাগ।

সুচরিতার কথা মনে পড়ছিল প্রমিতার। বাড়িতে আজ বুবু আর রুপি না থাকলেই ব্যাপারটা সেই হতচ্ছাড়া রবিবারটার মতন দাঁড়াত। একা প্রমিতা। আর চৌকাঠে সুদেব সামন্ত। তারপর....।

প্রমিতার ভেতরটা ভয়ে কেঁপে উঠল। ঠিক তখনই ও শুনতে পেল, মেয়ে ওকে বলছে, 'ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি—।'

সুদেব সামন্ত প্রমিতাকে দেখে বোকা-বোকা হাসল। অকারণেই ইতস্তত করে বলল, 'সুইচবোর্ডটা....মানে, ইয়ে....দেখতে এসেছি, বউদি....।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—আসুন। ভেতরে আসুন।'

সুদেব ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজার পাল্লাটা সেদিনের মতো ঠেলে বন্ধ করে দেবে কি না ভাবছিল। একবার প্রমিতার দিকে দেখছিল, আর-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে খোলা দরজাটার দিকে।

প্রমিতা বেশ সহজভাবে দরজার কাছে এসে পাল্লাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল। নাইটল্যাচ বন্ধ হওয়ার 'ক্লিক' শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেল।

সুদেবের গায়ে একটা ছাই-রঙা টি-শার্ট। পায়ে কালো রঙের সাধারণ একটা প্যান্ট।

ওর পাশ দিয়ে দরজা বন্ধ করতে যাওয়ার সময় ঘামের গন্ধ পেল প্রমিতা। লক্ষ করল, ঘরটা ও ভালো করে দেখছে।

সুদেব ড্রইং-ডাইনিং-এর চারপাশটা যে শুধু খুঁটিয়ে দেখছিল তা নয়, রীতিমতো চাটছিল। কল্পনায় সেই দুর্ঘটনার দিনটা ও দেখতে পাচ্ছিল। সেই সন্ধেটা আর সুন্দর মেয়েটা চট করে ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

কী যেন নাম ছিল? হ্যাঁ, সুচরিতা।

সুদেব লক্ষ করল, ডাইনিং টেবিলের পাশে একটা ফ্রক পরা মেয়ে শুয়ে আছে। মাথাটা কাত করে ওকে দেখছে। চোখে কিশোর বয়েসের কৌতূহল।

তারপরই সুদেবের চোখ গেল দেওয়ালে টাঙানো সুচরিতার ফটোর দিকে। কী জীবন্ত ছবিটা! সুদেবের ভেতরে কী যে একটা হল। ও চট করে ফটোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। ওর যেন মনে হল, ও পুলিশের টি. আই. প্যারেডে দাঁড়িয়ে আছে। আর সুচরিতা ওই ফটো থেকে ওকে চিনে ফেলেছে। ওর দিকে আঙুল তুলে ধরবে এক্ষুনি। আর ওর মা-কে চেঁচিয়ে সুদেবের কথা বলে দেবে....সব ফাঁস করে দেবে।

প্রমিতা সুদেবকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। ও সুদেবের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে ফেলতে চেষ্টা করছিল। ওর চোখের দৃষ্টি আর মুখের প্রতিটি পেশির নড়াচড়া যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করছিল।

'চলুন—ওপরে চলুন।' প্রাণপণ চেষ্টায় কথাবার্তার তাল-লয়-ছন্দ বজায় রাখার চেষ্টা করছিল প্রমিতা, 'আপনাকে বললাম না, দোতলার ঘরের সুইচবোর্ডটাতে কী যেন একটা গোলমাল হয়েছে। তিনটে সুইচ কাজ করছে না।'

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে দোতলার সিঁড়ি উঠতে শুরু করল প্রমিতা। থলে হাতে নিয়ে সুদেব ওর পিছন-পিছন পা বাড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সুদেব মনে-মনে হিসেব কষতে চাইছিল, বাড়িতে এখন আর কে-কে আছে। তা ছাড়া এই মহিলা কি সুদেবকে এখনও সন্দেহ করে? মেয়ের ব্যাপারটা ভুলতে না পেরে জঘন্য ফাঁদ পেতে সুদেবকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসেনি তো?

সুদেব মনে-মনে হাসল। কীসব আবোলতাবোল ভাবছে ও! সেদিন বিকেলে এই ভদ্রমহিলা যখন ওই ক্ষমা-টমা চাইতে এসেছিল, তখন সুদেব বেশ খুঁটিয়ে জরিপ করেছিল। কেসটা ওর জেনুইন বলেই মনে হয়েছে।

একটা কথা মনে পড়ে গেল সুদেবের। প্রমিতা বলেছিল, '....আমি যে এখানে এসেছি সেটা আপনার দাদাকে বলবেন না। ওকে না জানিয়ে এসেছি।'

তা হলে, আজও বোধহয় প্রফেসারের বাচ্চাটা বাড়িতে নেই। শালা সুদেবের গায়ে হাত তোলে—এত হিম্মত! বদলা সুদেব একটা নেবেই। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। যেমন, এই প্রফেসারের বউটাকে ইয়ে করেই বদলা নেওয়া যায়। কিন্তু হুট করে কিছু করে বসাটা এখনই ঠিক হবে না। একই ফ্যামিলিতে দু-দুটো কেস

হলে সুদেব ফেঁসে যেতে পারে। তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভালো। আর সুদেব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে জানে।

দোতলার ছোট মাঝারি ঘরটায় পৌঁছেই সুদেব সামন্ত একটা গন্ধ পেল। মেয়ের গন্ধ। ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র আর ভাঁজ করে রাখা দু-চারটে পোশাক দেখেই ও বুঝতে পারল ঘরটা কার। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, সেদিন মেয়েটা হলুদ সালোয়ার পরেছিল।

পুরোনো কথা ভেবে সুদেব জেগে উঠতে শুরু করল। মায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়ের সঙ্গে শরীরের গরমিল খুঁজল। জোরে শ্বাস টেনে ঘ্রাণ নিল ও। মেয়েলি গন্ধটা ওকে অস্থির করে তুলল। আটপৌরে শাড়িতেও এই বউটাকে কী সুন্দর মানিয়েছে!

প্রমিতা সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে আঙুল তুলে দেখাল, বলল, 'এই সুইচ-বোর্ডটা—।'

সুদেব জবাব দিতে গিয়ে টের পেল, ওর গলা কেমন যেন খসখসে হয়ে গেছে, স্বর আটকে যেতে চাইছে।

ও কোনওরকমে বলল, 'দেখি....এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি...।'

সুদেব সুইচবোর্ডের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রমিতা সরে গেল বটে, কিন্তু সুদেবের সঙ্গে দূরত্ব খুব একটা বাড়াল না। সুদেব নাকে মায়ের গন্ধ পাচ্ছিল। মেয়েরও।

থলে থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে কাজ শুরু করল সুদেব। প্রমিতা একমনে ওর কাজ দেখতে লাগল।

রিতু প্রমিতার কানে-কানে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'এই লোকটাই, মাম, এই লোকটা...।'

প্রমিতা ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠলেও বাইরে সেটা বুঝতে দিল না। দম বন্ধ করে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সুদেব বলল, 'বউদি, একটা পিঁড়ে বা টুল-ঠুল কিছু হবে?'

'এক মিনিট—এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

কথাটা বলেই প্রমিতা চট করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সুদেব একটু অবাক হয়ে প্রমিতার চলে যাওয়া দেখল। কারণ, সুদেব কোথাও ইলেকট্রিকের কাজ করতে গেলে ওকে একা ছেড়ে সাধারণত কেউ কখনও যায় না। অথচ প্রমিতা কত সহজেই না চলে গেল!

প্রমিতার এই বিশ্বাসের জায়গাটা সুদেবকে বেশ নাড়া দিল। ইস, ও একটু চেষ্টা করলেই সম্পর্কটা সত্যি-সত্যি দেওর আর বউদির মতো হয়ে উঠতে পারে। সুদেবের হঠাৎই ভালো হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হল।

প্রমিতা একটু পরে একটা নীল প্লাস্টিকের টুল নিয়ে ফিরে এল। না, সুদেবকে

একা ছেড়ে যেতে ওর এতটুকুও মাথাব্যথা হয়নি। কারণ, রিতুই যখন খোয়া গেছে তখন আর কোন দামি জিনিস খোয়ানোর ভয়! তার চেয়ে বরং সুদেবকে এটা ভাবতে দেওয়া ভালো যে, প্রমিতারা ওকে বিশ্বাস করে আগের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

প্রমিতার কাছ থেকে টুলটা নিয়ে তার ওপরে উঠে দাঁড়াল সুদেব। সুইচবোর্ডের ডালাটা খুলে পজিটিভগুলো ঠিকঠাক করে জুড়তে লাগল। থলে থেকে একটা টেস্ট ল্যাম্প বের করে বারকয়েক এখানে-ওখানে জুড়ে জ্বালিয়ে-নিভিয়ে টেস্ট করল।

মিনিটপনেরোর মধ্যেই সুদেবের কাজ শেষ হয়ে গেল। সুইচবোর্ডের ডালাটা সেট করে তার স্ক্রুগুলো ভালো করে টাইট দিল। তারপর হাততালি দিয়ে হাত ঝেড়ে বলল, 'নিন, বউদি, সব ও. কে. করে দিয়েছি—।'

সুদেব সামন্তর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে প্রমিতা কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। সুদেবের কথায় হঠাৎই ওর ঘোর কেটে গেল। তাড়াতাড়ি করে বলল, 'একটুখানি বসুন, আপনার জন্যে একটু জল নিয়ে আসি—।'

সুদেব কোনও জবাব দেওয়ার আগেই প্রমিতা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুদেব টুকিটাকি যন্ত্রপাতিগুলো থলেতে গুছিয়ে নিয়ে প্রমিতার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

প্লেটে সাজানো চারটে মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে ফিরে এল প্রমিতা। সুদেব তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশটা দেখছিল।

'এটুকু খেয়ে নিন....।'

সুদেব চমকে প্রমিতার দিকে তাকাল। তারপর মিষ্টির প্লেটের দিকে। কয়েক সেকেন্ড অপলকে তাকিয়ে রইল। ইলেকট্রিক মিস্তিরিকে এতটা আতিথেয়তা! তাও আবার যাকে এরা মেয়ের খুনি বলে সন্দেহ করে!

প্রমিতা মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলে সুদেবের অভিব্যক্তি পরখ করছিল। রিতুর বিছানাটা দেখিয়ে বলল, 'বসুন। এটুকু খেয়ে নিন। আপনি আমাদের বাড়িতে আজ প্রথম এলেন....।' প্লেটটা বিছানার এক কোণে রাখল প্রমিতা।

থলেটা মেঝেতে রেখে সুদেব পায়ে-পায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। বসল। এই মহিলা কি সুদেবের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য 'প্রথম এলেন' কথাটা বলল?

'প্রথম কোথায়?' হেসে বলল সুদেব, 'এর আগে দুবার এসেছি, বউদি। আপনি ভুলে গেছেন—।'

'সেগুলোকে আসা বলে না।' নিচু গলায় বলল প্রমিতা। ওর কথার সুরে আপনজনের ছোঁয়া পাওয়া গেল।

pathagar.net

কথা বলতে-বলতে ও ছোট একটা টেবিল একপাশ থেকে টেনে নিল। ওটার ওপরে রাখা কয়েকটা বইপত্র আর ম্যাগাজিন মেঝেতে নামিয়ে হাতের গ্লাসটা টেবিলে রাখল। টেবিলটা সাজিয়ে দিল সুদেবের সামনে। প্লেটটা বিছানা থেকে তুলে রাখল গ্লাসের পাশে। বলল, 'নিন...।'

সুদেব প্রমিতার অতিথিপরায়ণতা লক্ষ করছিল। ওর ভাবভঙ্গি দেখে আঁচ করতে চেষ্টা করছিল মিষ্টিগুলোতে বিষজাতীয় কিছু মেশানো আছে কি না।

প্রমিতা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু একটা বলতে হয় তাই বলল, 'সুইচগুলোতে আর কোনও প্রবলেম হবে না তো?'

'না, না।' সামান্য হেসে বলল সুদেব, 'যদি বাই চান্স হয় তা হলে আমাকে শুধু একটা খবর দেবেন....।'

মিষ্টিগুলোয় বিষ মেশানো নেই তো?

'জানেন, এটা আমার মেয়ের ঘর।' মন্তব্যটা করার সময় সুদেবকে জরিপ করছিল।

'তাই?' ঘরটার চারদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল সুদেব। চিমটি কাটার মতো করে একটা সন্দেশের টুকরো ভেঙে নিয়ে মুখে দিল। জিভ নাড়াচাড়া করে বেশ ভালো করে ওটার স্বাদ নিল।

না, অস্বাভাবিক কোনও স্বাদ টের পাওয়া যাচ্ছে না।

ঠিক তখনই নীচ থেকে ফোন বেজে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল।

প্রমিতা ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'ফোন বাজছে। আপনি খান—আমি একটু কথা বলেই আসছি—।'

প্রমিতা চট করে আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার আগে মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, 'সব ক'টা মিষ্টি খেতে হবে কিন্তু...।'

ও চলে যেতেই সুদেব হাত সরিয়ে নিল মিষ্টি থেকে। বাইরের ছাদের দিকে তাকাল।

ঘরের বাইরে খোলা ছাদ। সেখানে প্রথম শীতের নরম রোদ তেরছা হয়ে পড়েছে। এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে টাঙানো দড়িতে কয়েকটা শাড়ি-জামাকাপড় ঝুলছে। ছাদের পাঁচিলে বসে একটা নিঃসঙ্গ কাক বেশ কিছুক্ষণ ধরে 'কা-কা' করে ডাকছিল। সুদেব কান পেতে সেই ডাকটা শুনছিল।

হঠাৎই ও উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। মিষ্টির প্লেটটা হাতে নিয়ে চটপট ছাদে চলে এল। নীচে নামার সিঁড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল যে, প্রমিতা এখুনি ওপরে উঠে আসছে না। তারপর কয়েকটা মিষ্টির টুকরো ভেঙে ছুড়ে দিল পাঁচিলে বসা কাকটার সামনে।

কাকটা ডাক থামিয়ে একলাফে নেমে এল ছাদে। ঘাড় সামান্য বেঁকিয়ে

টুকরোগুলো তুলে নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেগুলো শেষ করে দিল। তারপর পাঁচিলে ফিরে গিয়ে আবার ওর ডাক শুরু করল।

সুদেব কাকটাকে লক্ষ করতে লাগল। কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর হঠাৎই এগিয়ে গেল দড়িতে ছড়ানো শাড়ি-জামাকাপড়গুলোর দিকে। শাড়ির পাশে ছড়ানো একটা গোলাপি রঙের ব্লাউজ। ব্লাউজের নীচেই একটা ব্রা। তারপর একটা কালো রঙের শায়া, বাচ্চাছেলের রঙিন জামা, হালকা বাদামি রঙের একটা ফুলশার্ট আর একটা তোয়ালে।

সুদেব ব্লাউজটার কাছে এগিয়ে গেল। ছাদের দরজার দিকে একবার তাকাল। তারপর ব্লাউজ আর ব্রা-টা খাবলা মেরে মুঠো করে নাকে চেপে ধরল। লম্বা শ্বাস টেনে ঘ্রাণ নিল।

আ—আ—আঃ!

প্রমিতার গন্ধ। গন্ধটা খারাপ নয়।

সুদেবের শরীর খারাপ হতে শুরু করল।

ব্লাউজ আর ব্রা-টা ছেড়ে দিয়ে শায়াটাকে নিয়ে পড়ল।

আঃ!

একইরকম গন্ধ।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে ঝিম মেরে রইল। তারপর জলদি পা ফেলে ঘরে ফিরে এল। মিষ্টিগুলো টপাটপ মুখে পুরে দিল। স্বাদটা ওর ভালো লাগল।

প্লেট নামিয়ে রেখে জলর স্বাদ পরীক্ষা করল সুদেব। 'না, ঠিক আছে' গোছের সিদ্ধান্ত নিয়ে ও যখন জল খাচ্ছে তখন ফিরে এল প্রমিতা।

'সরি। আমাদের এক রিলেটিভ ফোন করেছিল।'

আসলে ফোন করেছিল ত্রিযামা। ও আজ সায়েন্স কলেজে যায়নি। তাই আন্টির খোঁজ নেওয়ার জন্য এ সময়ে ফোন করেছে। সুদেব সামন্তর কথাও জিগ্যেস করেছে।

জলের গ্লাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সুদেব।

'আজ আসি, বউদি...।'

প্রমিতা সুদেবের হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দিল। আলতো হেসে বলল, 'এটা রাখুন।'

টাকাটা হাতে নিয়ে সুদেব বলল, 'এত কেন? আপনি কুড়ি টাকা দিলে... মাল-মেটিরিয়াল তো কিছুই লাগেনি...।'

'না, না। ওটা রাখুন। আবার আসবেন।'

নোটটা পকেটে রেখে থলেটা তুলে নিয়ে প্রমিতাকে পাশ কাটাতে চাইল সুদেব। বলল, 'আসব। যদি ইলেকট্রিকের কিছু খারাপ-টারাপ হয়...।'

pathagar.net

'খারাপ?' একটা যেন ঘোরের মধ্যে বলে উঠল প্রমিতা, 'মেয়েটা চলে যাওয়ার পর থেকে ভীষণ খারাপ লাগছে। সবসময় ভাবি, এই বোধহয় ও ফিরে আসবে। তাই এই ঘরটাকে যতটা পারি গুছিয়ে রাখি...।'

'হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম, যে....। মানে, এ-ঘরে কেউ থাকে না...অথচ আপনি সুইচবোর্ড সারাচ্ছেন...। যে চলে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না, বউদি।'

'আসবে না?'

অদ্ভুত সুরে কথাটা বলেই আচমকা টলে পড়ে গেল প্রমিতা।

সুদেব যদি ওকে না ধরে ফেলত তা হলে হয়তো মেঝেতে মাথা ঠুকে গিয়ে বিশ্রী চোট পেত।

সুদেব হাত থেকে থলেটা ছেড়ে দিল। প্রমিতার শরীরটাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে গেল বিছানার দিকে। বারবার 'বউদি, বউদি' বলে ডাকতে লাগল।

প্রমিতার গন্ধ পাচ্ছিল সুদেব। কিন্তু এখন অস্থির হলে চলবে না। কন্ট্রোল। কন্ট্রোল। নীচের তলায় কাজের মেয়েটা জেগে আছে।

বিছানায় প্রমিতাকে শুইয়ে দেওয়ার সময় সুদেবের ভেতরটা আকুলিবিকুলি করছিল। শরীরটাকে ভীষণ চটকাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কন্ট্রোল।

সুদেবের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল প্রমিতা। সুদেবের আস্থা অর্জন করার জন্য কত বড় ঝুঁকি ওকে নিতে হচ্ছে।

কিন্তু ওর যে উপায় নেই! রিতু ওকে দিয়ে এসব করাচ্ছে।

সুদেব সামন্ত নিশ্চয়ই ওর এই অভিনয়টুকু ধরতে পারেনি। নিশ্চয়ই ভেবেছে, একজন শোকপাগল মা হঠাৎই মানসিক ধাক্কা খেয়ে অচেতন হয়ে গেছে।

আঠেরো

সন্ধে সাতটা বাজতেই দোকান বন্ধ করে রাস্তায় পা দিল সুদেব। ওর হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। এখন ওর ছুটি। এখন ঘণ্টাদুয়েক ও খুশিমতন সময় কাটাবে। এদিক-ওদিক ঘুরবে, এখানে-সেখানে দাঁড়াবে, নানান কথা ভাববে। কিন্তু তার আগে একা চিলড্রেন্স পার্কে গিয়ে চুপচাপ একটু বসবে। হাতের প্যাকেটটার দিকে তেরছা নজরে একবার তাকাল ও।

কাল থেকে ওর ঘুসঘুসে জ্বর। গা ম্যাজম্যাজ করছে। হাত-পা একটু-একটু ব্যথা করছে। জ্বর-জ্বর ভাবটা কমানোর জন্য মান্নাদার 'মেডিকো' থেকে তিনটে ক্যালপল ট্যাবলেট কিনে এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছে। তাতে ম্যাজমেজে ভাবটা কমেছে, গা ব্যথাও কমেছে খানিকটা। কিন্তু তবুও শরীরটা ঠিক জুত লাগছে না।

সকালবেলা একটানা দোকানে বসে কাজ করেছে। তারপর বিকেল হতেই বাতাসে একটা চিটচিটে শীতের ভাব টের পেয়েছে। হয়তো জ্বর-জ্বর ভাব থাকায় ঠান্ডাটা ওর বেশি লাগছিল।

কাজ করতে-করতে উঠে পড়েছে সুদেব। দোকানের পিছনে গিয়ে দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো হাতকাটা সোয়েটারটা নিয়ে এসেছে। ওটা গায়ে দিয়ে বাকি কাজ সেরেছে। তারপর দোকান বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

গাঢ় সবুজ রঙের সোয়েটার। কোমরের বর্ডারের কাছে বুনুনি খুলে গিয়ে পাকানো কেন্নোর মতো উল বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সোয়েটারটা সুদেব ছাড়েনি। ওর কাছে এটা খুব পয়া। অবশ্য কেন তা জানে না।

সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে ও আবার কাজে হাত লাগিয়েছিল। একটা ইলেকট্রিক হিটারের কয়েল সেট করছিল। ওর মনে হল, সোয়েটার নয়, ও আসলে একটা সবুজ বর্ম পরে নিয়েছে। এই বর্মটা যে-কোনও বিপদ থেকে ওকে বাঁচাবে।

আসলে সবুজ রংটাও সুদেবের খুব পয়া। ছোটবেলা থেকেই এটা ওর বিশ্বাস। তবে এই বিশ্বাস তৈরি করতে ওর রগচটা নেশাখোর বাবা বোধহয় অজান্তে সাহায্য করেছিল।

ছোটবেলায় সুদেব যেমন দুরন্ত ছিল তেমনই ছিল কৌতূহলী। গুলতি দিয়ে ব্যাং কিংবা পাখি মারা, ফড়িং-এর লেজে সুতো বেঁধে 'ঘুড়ি' ওড়ানো, প্রজাপতি ধরে কাঠিতে গেঁথে ফেলা—এরকম আরও কত উলটোপালটা খেলা ছিল ওর। একবার তো আঠাকাঠি দিয়ে বাচ্চা বুলবুলি ধরে সেটার গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছিল!

বাবার হাতে এসব কীর্তি ধরা পড়লেই পাওনা হত বেধড়ক মার। মারার জন্য একটা পেয়ারা গাছের ডাল ঘরের কোণে রাখা থাকত। সেই 'লাঠি'টা বাবা ছাড়া আর কারও ছোঁওয়ার অধিকার ছিল না।

pathagar.net

সুদেবদের ঘরে সবুজ রঙের একটা বিছানার চাদর ছিল। রংটা অনেকটা কচি কলাপাতার মতো। বাবা যখন ওকে পেটানোর জন্য লাঠিটা নিয়ে আসতে ঘরে ঢুকত, তখন আর-এক ঘর থেকে সবুজ চাদরটা টেনে নিয়ে পালাত সুদেব। একছুটে কলাবাগানে গিয়ে চাদরটা মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকত। ছড়ানো কলাপাতার সঙ্গে চাদরের রংটা মিশে যেত। সুদেব তখন দম বন্ধ করে কাঁপত আর প্রাণপণে ভগবানকে ডাকত : বাবা যেন কিছুতেই ওকে খুঁজে না পায়।

বাবা জানত সুদেব কলাবাগানেই লুকিয়ে আছে। তাই সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করত আর গরগর করে ডাকত : 'সুদু! অ্যাই সালা সুদু! বেরিয়ে আয় বলছি!'

সুদেব চাদরটাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকত।

পরদিন নেশার ঘোর কেটে গেলে বাবা অনেক শান্ত-সভ্য হয়ে যেত। তারপর সকাল সাড়ে আটটা বাজতে-না-বাজতেই ধানকলের কাজে বেরিয়ে পড়ত।

এই কারণেই সবুজ চাদরটাকে ভীষণ ভালোবাসত সুদেব। সেইসঙ্গে সবুজ রংটাকেও।

কিন্তু মায়ের ওপরে ভীষণ রাগ হত ওর। মা যে কেন বিপদের সময় ওকে আগলে রাখতে পারে না কে জানে! সেইজন্য ওর কান্নাও পেত, কষ্ট হত বুকের ভেতরে। তখন কষ্ট ভোলার জন্য ও নানান খেলায় মেতে উঠত। সেই খেলায় কোনও সঙ্গীসাথীর দরকার হত না।

বাবা ছোটবেলায় মারা গেলেও বাবাকে ভোলেনি সুদেব। কালো শুকনো রোগা-ক্যাংঠা লোকটা সন্ধের পর তাড়ি গিলে জানোয়ার হয়ে উঠত। মাকে চিৎকার করে কাঁচা খিস্তিখেউড় করত আর ছলছুতো পেলেই সুদেবকে ধরে পেটাত।

সুদেবের মাঝে-মাঝে মনে হত বাবার তাড়ির মধ্যে ফলিডল মিশিয়ে দেয়। সেইজন্য ও একশিশি ফলিডল এলাকার বড়লোক প্রভাকর সাউদের গোলাঘর থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল। বেশ মনে আছে, ফলিডলের শিশিটা সুদেব বাড়ির কাছে কলাবাগানে পুঁতে রেখেছিল। আর প্রতিদিন সূর্য ডোবার পর ও ভাবত, আজই ওটা মিশিয়ে দেবে তাড়িতে।

বড় একটা বোতলে করে তাড়ি কিনে নিয়ে আসত বাবা। তারপর উঠোনে একটা টুলে বসে শুরু করত। কয়েক গেলাস চড়ানোর পরই বাবা ভাট বকতে শুরু করত। আর বারবার বিকট শব্দে ঢেঁকুর তুলত।

একটা পেয়ারা গাছের আড়াল থেকে ধীরে-ধীরে জানোয়ার-হয়ে-যাওয়া বাবাটাকে দেখত সুদেব। ওত পেতে থাকত কখন লোকটা বেহুঁশ হবে। তারপর ও ছুট লাগাবে কলাবাগানে। মার্কা দেওয়া গাছটার গোড়ার মাটি খুঁড়ে ফলিডলের শিশিটা বের করে নেবে। তারপর....।

এমন নয় যে, ব্যাপারটা সুদেবের সাহসে কুলোয়নি। আসলে কোনওদিনই ও মনপসন্দ কোনও সুযোগ পায়নি। অপেক্ষা করতে-করতে দিনের-পর-দিন কেটে গেছে। মারের-পর-মার খেয়ে গেছে সুদেব। কিন্তু শোধ নেওয়া হয়নি।

তারপর একদিন....একদিন ওর বাবা যখন হঠাৎই বুকে হাত চেপে ছটফট করতে-করতে মারা গেল, সেদিন হতাশা আর ক্ষোভে পাগলের মতো মাটি চাপড়েছিল ও। ফলিডলের শিশিটা কোনও কাজে লাগল না!

ছুটে কলাবাগানে চলে গিয়েছিল সুদেব। দু-হাতের থাবা দিয়ে ভেজা মাটি খুঁড়ে ফলিডলের শিশিটা বের করে নিয়েছিল। তারপর ছিপি খুলে ফলিডল ঢেলে দিয়েছিল নিজের মাথায়। বিষাক্ত তরল ওর মাথা, গাল, গলা বেয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল নীচে। সেই তরলের একটা ফোঁটা ভুরুর ওপর থেকে টপ করে খসে পড়েছিল চোখের পাতায়।

তখনই পুকুরের দিকে ছুটে গিয়েছিল ছেলেটা। শরীর আর মনের জ্বালা জুড়োতে ঝাঁপ দিয়েছিল জলে। আধঘণ্টা ধরে পাগলের মতো এলোমেলো সাঁতার কেটেছিল।

কে একজন ওর নাম ধরে ডাকতেই সুদেব চমকে উঠল।

'এই যে, সুদেব—তুমি কাল আসবে বলেছিল—কতক্ষণ ওয়েট করলাম—এলে না তো!'

সুদেবের চোখের সামনে থেকে পুরোনো সময়ের ছবিটা সরে গেল। খেয়াল করল, কখন যেন সন্ধে নেমে গেছে। আর ও দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করেছে।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে সৌম্য চেহারার একজন প্রৌঢ়। মুখটা খুব চেনা। নামটাও ও জানত, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে পড়ছে, ও ভদ্রলোকের বাড়ি চেনে, আর ভদ্রলোক ক'দিন ধরেই ওঁর বাড়ির একটা টিউবলাইট সারানোর কথা বলছেন।

'আমার শরীরটা ভালো নেই—জ্বর-জ্বর মতন হয়েছে। মনে হয় পরশু যেতে পারব—।' সুদেব ক্লান্ত গলায় বলল।

'ও, তাই?' ভদ্রলোক আন্তরিক গলায় বলতে চাইলেন, 'ঠিক আছে....সেরে ওঠো....তারপর যেয়ো....।'

কথাটা বলে ভদ্রলোক নীরোদবিহারী মল্লিক রোডের দিকে হাঁটা দিলেন। তখনই সুদেবের নামটা মনে পড়ল। রবিরঞ্জন....কী যেন? চ্যাটার্জি বোধহয়।

রাস্তার এদিক-ওদিক তাকাল। কেকের ফ্যাক্টরি আর গোডাউনের সামনে ভ্যানগাড়ির সারি। গাড়ি লোড হচ্ছে।

ফুটপাথের কোণে মুনিয়ার চায়ের দোকানে বেশ ভিড়। জোর আড্ডা চলছে। ক্রিকেট, ফুটবল, কিংবা পলিটিক্স নিয়ে। এসব আলোচনা সুদেবের একঘেয়ে লাগে।

সুদেব পা বাড়াল।

pathagar.net

সামনে খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেই চিলড্রেন্স পার্ক। আর ডানদিকে নতুন তৈরি হওয়া ফ্ল্যাটবাড়ির কমপ্লেক্স। কিছু ফ্ল্যাটে লোকজন এলেও বেশিরভাগ ফ্ল্যাট এখনও অন্ধকার, খালি।

রাস্তাটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি কোণ করে বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে। তারপর চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ ফুট গিয়েই আবার ডানদিকে ভাঁজ খেয়ে এগিয়ে গেছে।

বাঁ-দিকে ঘুরে এগোল সুদেব। গলাটা কেমন যেন শুকনো লাগছে। তেষ্টা পাচ্ছে ভীষণ। ও পায়ে-পায়ে পার্কের কাছে এগিয়ে গেল।

পার্কের দরজা খোলা। ভেতরে অনেক গাছগাছালি। তার মধ্যে একটা বড়সড় নারকেল গাছও রয়েছে। দুটো সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প পার্কের ভেতরে আলো ছড়াতে চেষ্টা করছে।

পার্কে ঢুকে পড়ল সুদেব। ওর অপেক্ষার ধৈর্য বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেটটা চট করে তুলে ধরল। একটানে কাগজের মোড়কটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে দিল ছোট-ছোট গাছের কোণে, অন্ধকারে। ওর হাতে শুধু একটা বোতল ধরা রইল।

পার্কের একপাশে একটা গাছের আড়ালে বসে ছিপি খুলে শুরু করল সুদেব। বোতলে মদের সঙ্গে পরিমাণ মতো থাম্‌স আপ মেশানোই ছিল। সুতরাং বোতলটা গলায় উপুড় করে ঢকঢক করে কাজ চলতে লাগল।

কয়েক ঢোঁক খাওয়ার পরই সুদেব বুঝতে পারল ওর শরীরটা জেগে উঠছে। জ্বরের জ্বালাটা কমে গিয়ে নতুন এক জ্বালা শুরু হয়েছে।

ওর সুচরিতার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল শুক্লার কথাও। ওদের সঙ্গে ইয়ের আনন্দটাও ঝিলিক দিয়ে গেল।

'আ-আঃ!' বলে আরও কয়েক ঢোঁক গলায় ঢালল সুদেব।

এই সময় যদি পার্কের মধ্যে একটা মেয়ে চলে আসে!

এপাশ-ওপাশ তাকাল সুদেব। অনেকটা দূরে দুটো ছেলে বসে গল্প করছে। এ ছাড়া আর কেউ নেই।

আচ্ছা, যদি প্রফেসরের বউটা এখন চলে আসে এখানে!

সুদেবের ঘোর লাগতে শুরু করল। একইসঙ্গে ও প্রমিতাকে নিয়ে ভাবতে লাগল।

গত শনিবার ও যে-কন্ট্রোল দেখিয়েছে তার জবাব নেই। নইলে বউটা তো ছিল বলতে গেলে হাতের মুঠোয়। ওর বেহুঁশ শরীর, গায়ের গন্ধ, সুদেবকে দারুণভাবে উসকে দিচ্ছিল। কিন্তু সুদেব নিজেকে ব্যাপক চেষ্টায় সামলে রেখেছিল। ওর মনে শুধু একটাই প্রশ্ন বারবার উঁকি দিচ্ছিল : বউটা কি সত্যি-সত্যি প্রায়শ্চিত্ত করছে? সুদেবকে মিথ্যে সন্দেহ করে বাজে ব্যবহার করার জন্য সত্যি খারাপ

লাগছে ওর?

মদ খেতে-খেতে ওর মনে হল, হয়তো ব্যাপারটা সত্যি। প্রমিতা যদি ওকে এককণাও সন্দেহ করত, তা হলে ওকে এভাবে দোতলার ফাঁকা ঘরে ডেকে এতটা ঝুঁকি নিত না।

ভাবতে-ভাবতে সুদেবের হঠাৎই মনে হল, আচ্ছা, প্রফেসরের বউটা সুদেবকে পছন্দ করে ফেলেনি তো! সিনেমায় তো অনেক সময় এরকম হয়।

কথাটা ভেবে আপনমনেই হেসে উঠল সুদেব। আকাশের দিকে মুখ তুলে হাসতে-হাসতে বলল, 'ধুস শালা—।' মদের বোতলে শেষ চুমুক দিয়ে খালি বোতলটা ছুড়ে দিল পার্কের অন্ধকার কোণে।

শীতের বাতাসে তখন নারকেল গাছের পাতা খসখস করে নড়তে শুরু করেছে।

দেখে সুদেবের মনে হল, পাতাগুলো যেন সুদেবের মনের কথা টের পেয়ে ফিসফিস করে বলছে, 'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ—।'

এটা ভাবামাত্রই সুদেবের শরীর আরও তীব্রভাবে জেগে উঠল।

নীরোদবিহারী মল্লিক রোডের ফুটপাতে ত্রিযামা আর পল্লব দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দুজনের সাজপোশাক এমন যে, ওদের বন্ধুদের পক্ষেও ওদের চট করে চেনা মুশকিল।

পল্লব আর ত্রিযামার কাঁধে গাঢ় নীল রঙের নতুন কিটব্যাগ। মাথায় লাল টুপি। গায়ে হালকা সবুজ স্লিভলেস জ্যাকেট। এ ছাড়া ত্রিযামার চোখে চশমা, ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক, মুখে হেভি মেকআপ। আর পল্লবও চোখে মেটাল ফ্রেমের শৌখিন চশমা লাগিয়েছে।

ওদের দুজনের হাতে রুলটানা প্যাড আর খোলা পেন। যেসব অল্পবয়েসি ছেলে-মেয়ে বাড়ি-বাড়ি সার্ভে কিংবা সেল্‌সের কাজে বেরোয়, ওদের হাবভাব ঠিক তাদের মতো।

একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল ত্রিযামা আর পল্লব। দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছিল।

'আমরা ''গোদরেজ লক্‌স'' থেকে আসছি....।' ত্রিযামা বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আমাদের কোম্পানি একটা পাবলিসিটি ড্রাইভ শুরু করেছে। আমাদের তালার বিক্রি বাড়ানোর জন্যে একটা স্পেশাল গিফ্‌টের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গিফ্‌ট পেতে হলে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে....।'

দোকানদার একটা বিড়িতে টান দিচ্ছিল। সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লুঙ্গিটাকে ঠিকঠাক করে বসল।

pathagar.net

'আপনি দোকান বন্ধ করার সময় কী তালা ইউজ করেন? মানে, কোন কোম্পানির তালা?'

দোকানদার বোকা-বোকা ভঙ্গিতে হেসে ফেলল। ওর রুক্ষ পোড় খাওয়া মুখ একটু নরম হল। বলল, 'সে কি আর জানি! এই তো, এইরকম সাইজের ইস্টিলের তালা। দুটো লাগাই। ওই যে, দেখুন না, ডালার পাশে কড়ায় লাগানো আছে—।'

ত্রিযামা তালা দুটো খুঁটিয়ে দেখার ভান করল। খুব মনোযোগে প্যাডের ওপরে খসখস করে পেন চালাল। তারপর পাশে দাঁড়ানো পল্লবকে ইশারা করতেই পল্লব ওর কিটব্যাগ থেকে একটা গোদরেজের তালার বাক্স বের করল। গোদরেজ কোম্পানির 'নভ্‌তাল' তালা—পাঁচ লিভারের।

তালাটা ও ত্রিযামার হাতে দিল। ত্রিযামা সেটা দোকানদারের হাতে দিয়ে হেসে বলল, 'এই নিন, আপনার স্পেশাল গিফ্‌ট....।'

দোকানদার একগাল হেসে তালাটা নিয়ে বলল, 'আর-একটা হবে? আমি তো দুটো তালা লাগাই....।'

ত্রিযামা মিষ্টি করে হাসল : 'এবারের স্পেশাল গিফ্‌ট একটাই। যদি পরের বারে স্কোপ থাকে দেব। কাইন্ড্‌লি আপনার নাম আর অ্যাড্রেস বলুন—।'

দোকানদার নাম-ঠিকানা বলল। ত্রিযামার ইশারায় পল্লব ওর প্যাডে নাম-ঠিকানা টুকে নিল।

ত্রিযামা 'থ্যাংক য়ু' বলে দোকানদারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। এরকম একটা সুন্দরী মেয়ের হাত হাতের মধ্যে পেয়ে দোকানদার হকচকিয়ে গিয়ে হাতটা চেপে ধরল। তারপর ছেড়ে দিল।

দোকানদারের মুখের চেহারা দেখে ত্রিযামার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে হাসি চেপে ও এগিয়ে গেল পরের দোকানটার দিকে। পল্লবও ওর সঙ্গে-সঙ্গে চলল।

ফুটপাত ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ত্রিযামা পল্লবের দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, 'কীরে, ভয় করছে?'

পল্লব মাথা নাড়ল : 'না! তবে তোর অ্যাকটিং দেখে হাসি পেয়ে যাচ্ছে। দারুণ অ্যাকটিং করছিস কিন্তু। টিভি সিরিয়ালে তোর মামলা ফিট হয়ে যেত—।'

'নে, এবার কেয়ারফুল হ। আর দুটো দোকান। তারপরই আসলটা—টাইগার্‌স ডেন....।'

পল্লব বলল, 'টাইগার্‌স ডেনের নিকুচি করেছে। তোকে টাচ করলে শুয়োরের বাচ্চাকে গুঁড়ো করে দেব।'

'কী হচ্ছে!' ওকে ধমক দিল ত্রিযামা। তারপর আলতো করে জানতে চাইল, 'আমাকে টাচ করলে গুঁড়ো করে দিবি কেন?'

পল্লব ত্রিযামার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বলল, 'সেটা আমার পারসোনাল ব্যাপার।'

আরও দুটো দোকানের কাজ সেরে ওরা এসে পড়ল টাইগার্স ডেন 'সামন্ত ইলেকট্রিক'-এর সামনে।

দেখল দোকান বন্ধ।

দোকানটা যে বন্ধ থাকবে সেটা পল্লব আর ত্রিযামা জানে। আর জানে বলেই আজকের এই বেপরোয়া পরিকল্পনা নিয়ে ওরা পথে নেমেছে।

সুদেব সামন্তর ব্যাপারটা নিয়ে প্রমিতা প্রায়ই ত্রিযামার সঙ্গে আলোচনায় বসেছে। এক-একদিন ত্রিযামার সঙ্গে পল্লবও হাজির থেকেছে।

সুদেব সুইচবোর্ড সারিয়ে যাওয়ার পর ত্রিযামার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল প্রমিতা। ওকে সময় করে বাড়িতে আসার জন্য বলেছিল।

ত্রিযামা এলে ওকে সেই নির্জন দুপুরের কথা জানিয়েছে প্রমিতা। বলেছে, কী সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছিল ও। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদেবের মধ্যে কোনও বেচাল দেখেনি। প্রমিতাকে শুইয়ে দিয়ে নীচে গিয়ে রুপিকে ডেকে নিয়ে এসেছে ও। রুপিকে বলেছে, 'বউদির চোখে-মুখে জল-টল ছিটিয়ে দাও। হঠাৎ মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে.... তাইতেই....।'

এরপর চলে গেছে সুদেব। তবে যাওয়ার আগে রুপির কাছ থেকে প্রমিতাদের ফোন নম্বর চেয়ে নিয়ে গেছে। বলেছে, 'বউদি কেমন থাকেন পরে ফোন করে খবর নেব।'

ত্রিযামা সব শুনে প্রমিতাকে বলল, 'আন্টি, আপনি কি শিয়োর যে, ওই ইলেকট্রিশিয়ানটাই....?'

প্রমিতা কোনও উত্তর দিল না। গুম হয়ে রইল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ও ভেতরে-ভেতরে কী যেন ভাবছে।

হঠাৎই ও বলল, 'ত্রিযামা, ''সামন্ত ইলেকট্রিক''-এ গিয়ে একবার সার্চ করে দেখা যায় না?'

'আপনি তো বলেছিলেন, পুলিশ সার্চ-টার্চ করেছে....।'

'করেছে। কিছু পায়নি। কিন্তু আমরা যদি....?'

সেই 'যদি' থেকেই আইডিয়াটা প্রথম তৈরি হয়।

pathagar.net

ত্রিযামা আর পল্লব একটা নামি কোম্পানির সেল্‌স গার্ল আর সেল্‌স বয় সেজে কাজে নামবে। নানান দোকানের তালা সার্ভে করার ছল করে ওরা দোকানদারদের নাম-ঠিকানা আর দোকানে লাগানো তালার মডেল টুকে নেবে। যাতে দোকানদাররা আপত্তি না করে সেজন্য স্পেশাল গিফটের ব্যবস্থাও করবে। তারপর....।

প্রমিতা দু-হাজার টাকা ত্রিযামার হাতে জোর করে গুঁজে দিয়েছিল। বলেছিল,

খরচ যা লাগে লাগবে। ত্রিযামা যেন কোনও চিন্তা না করে।

ত্রিযামা আর পল্লব সব ব্যবস্থা করে তৈরি হওয়ার পর প্রমিতা ওদের বলেছিল ক'দিন অপেক্ষা করতে। কারণ, সুদেব সামন্তর রুটিন প্রমিতা ওদের চেয়ে অনেক ভালো জানলেও আরও কিছুদিন ও রুটিনটাকে যাচাই করতে চাইছিল।

সুদেব দোকান খোলে ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে। তারপর দোকানে কাজে বসে। বেলা বারোটা কি সওয়া বারোটায় ও রিপেয়ারের নানান 'কল'-এ বেরোয়। ফেরে মোটামুটি দেড়টা নাগাদ। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার কাজে বেরোয়। ফেরে চারটের কাছাকাছি। তারপর ও একটানা দোকানে থাকে সাড়ে ছ'টা কি সাতটা পর্যন্ত।

সাতটা নাগাদ সুদেব দোকান বন্ধ করে। তারপর কোনও ইমার্জেন্সি কল থাকলে সেখানে যায়। নইলে বিশ্রাম।

প্রমিতা লক্ষ করে দেখেছে, বারোটা নাগাদ রিপেয়ারের কাজে বেরোনোটা সুদেব সহজে কামাই করে না। তাই সুদেবের রুটিনটা আরও ক'দিন চেক করার পর ও ত্রিযামাকে বলল, সাড়ে এগারোটার সময় রেডি থাকতে। প্রমিতা সুদেবের পাড়ার কাছাকাছি কোনও দোকান-টোকানে গিয়ে ছল করে সময় কাটাবে, আর লক্ষ রাখবে সুদেব কখন বেরোয়। ও যন্ত্রপাতির থলে নিয়ে বেরোলেই প্রমিতা ত্রিযামাকে ওর মোবাইলে ফোন করে দেবে। তক্ষুনি ত্রিযামা আর পল্লব ত্রিযামাদের গাড়িতে করে রওনা হবে। চলে আসবে সুদেবের পাড়ার কাছাকাছি। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ওদের নকল সার্ভের কাজ শুরু করবে।

সুদেব যখন দোকান বন্ধ রাখে তখন কাঠের পাল্লার দুটো হাঁসকলে দুটো তালা লাগায়। সেই তালা দুটো খোলার জন্য দরকার দুটো নকল চাবি। তারপর সেই নকল চাবি দিয়ে....।

হালসীবাগানের মোড়ের 'সন্তোষ সুইট্স'-এ দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবছিল প্রমিতা। দোকানদারকে কুড়ি টাকার সন্দেশ দিতে বলে ও অপেক্ষা করছিল। আর নজর রাখছিল, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট আর নীরোদবিহারী মল্লিক রোডের ক্রসিং-এর দিকে। সুদেব সামন্ত ফিরে আসছে দেখতে পেলেই ও মোবাইল ফোন থেকে ত্রিযামাকে রিং করে দেবে। আর তক্ষুনি ওরা সাবধান হয়ে গিয়ে পিটটান দেবে।

আজ সকাল থেকে সেই প্ল্যানমতোই কাজ হয়ে চলেছে। ঠিক বারোটা পাঁচে দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে গেছে সুদেব।

মিষ্টি কিনে ফুটপাতের একপাশে এসে দাঁড়াল প্রমিতা। 'সন্তোষ সুইট্স'-এর সামনে ফুটপাতে আর রাস্তায় অনেক শালপাতার বাটি ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো ঘিরে মাছি উড়ছে। একটা নেড়ি কুকুর এসে ছোঁকছোঁক করছে।

ত্রিযামা আর পল্লবকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল প্রমিতা। বিশেষ করে ওদের রঙিন

পোশাক আর টুপির জন্য অনেকেই ওদের অবাক চোখে দেখছিল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে প্রমিতার বুকের ভেতরে নিঃশব্দে হাতুড়ি পড়ছিল। সুদেব সামন্তর দোকানের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ত্রিযামার বুকের ভেতরেও ঠিক একই ব্যাপার চলছিল। তবে পল্লবের ওসব কিছু হচ্ছিল না। ও শুধু জানে, কোনও বিপদ হলে হাত-পা ব্যবহার করতে হবে।

দরজার হাঁসকলে লাগানো তালা দুটো দেখল ত্রিযামা। দুটো তালা একইরকম—আলিগড়ের, চকচকে লোহার তৈরি। রোদে-জলে সামান্য জং ধরেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তালার নাম পড়া যাচ্ছে : ATOOT–60।

ত্রিযামা পল্লবকে চাপা গলায় বলল, 'চটপট প্লাস্টিসিন মোল্ডটা বের কর।'

পল্লব ওর কিটব্যাগের চেন খুলে গোলাপি রঙের একটা ময়দার তাল মতো বের করল। নরম জিনিসটাকে হাতের মুঠোয় কয়েকবার চটকাল।

ত্রিযামা তালা দুটোর ওপরে ঝুঁকে পড়ে হাতের প্যাডে কীসব লেখালিখির ভান করছিল। সেই ভঙ্গি বজায় রেখেই আস্তে করে বলল, 'নে, কুইক—চটপট ছাপ তুলে নে—।'

রাস্তায় লোকজন তেমন ছিল না। তা সত্ত্বেও ত্রিযামা আর পল্লব দুপাশ থেকে তালা দুটোকে আড়াল করে দাঁড়াল। পল্লব মোল্ড দিয়ে চাবির গর্তের সামনের দিক আর পিছনের দিকের ছাপ তুলে নিল। তারপর কিটব্যাগ থেকে দুটো পলিথিনের প্যাকেট বের করে দুটো চাবির ছাপ আলাদা দুটো প্যাকেটে রেখে দিল।

কাজ শেষ করে যখন ওরা অন্য আর-একটা দোকানে সার্ভের জন্য এগোচ্ছে, তখন পল্লব লক্ষ করল, ত্রিযামার কপালে-গালে ফুটে উঠেছে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

বেশ কয়েকদিন হল শীত শুরু হয়ে গেছে। তাই ঘামের বিন্দুগুলো পল্লবকে অবাক করল। ও জিগ্যেস করল, 'কীরে, ঘামছিস?'

অপ্রতিভভাবে হাসল ত্রিযামা। মুখে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছে নিয়ে বলল, 'কই, না তো!'

এমন সময় ত্রিযামার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

চমকে উঠল ত্রিযামা। তারপর তাড়াহুড়ো করে কিটব্যাগ থেকে ওর মোবাইল ফোনটা বের করে দেখল।

উইন্ডোতে প্রমিতার নম্বর ফুটে উঠেছে। 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে মোবাইল ফোনে চাপা গলায় কথা বলল ত্রিযামা, 'হ্যালো, আন্টি। আসছে নাকি?'

'না। টেনশানে আর পারছি না। তাই ফোন করেছি।'

'নো টেনশান, আন্টি। কাজ হয়ে গেছে।'

শব্দ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল প্রমিতা।

pathagar.net

pathagar.net

ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে দুটো। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে নতুন তৈরি হওয়া একজোড়া ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে একটা স্কুল-বাস দাঁড়িয়ে ছিল। মিনিবাসের মাপের পুরোনো মডেলের গাড়ি। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্যাটকেটে হলদে রং করা। তার ওপরে কালো হরফে ইংরেজিতে লেখা : SCHOOL BUS।

বাসে ড্রাইভার আর হেল্‌পার ছাড়া একটিমাত্র ছেলে প্যাসেঞ্জার সিটের মাঝামাঝি জায়গায় বসেছিল। চোখে আধুনিক ছাঁদের সানগ্লাস। পাশে রাখা একটা ফাইল।

ছেলেটা বারবারই হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। আর তারপরই নজর দিচ্ছিল ডানহাতে মুঠো করে ধরে রাখা একটা মোবাইল ফোনের দিকে।

বাসের ড্রাইভারের মাথায় খেলোয়াড়ি টুপি। তার নীচ দিয়ে কাঁচাপাকা চুল দেখা যাচ্ছিল। রোগা চোয়াড়ে চেহারা। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। লোকটা কিছু একটা চিবোচ্ছিল—সেই তালে-তালে ওর চোয়াল নড়ছিল।

ড্রাইভারের বাঁ-পাশের সিটে গা এলিয়ে বসেছিল হেল্‌পার। বয়েস সতেরো কি আঠেরো। মাথায় খাড়া-খাড়া ঝাঁকড়া চুল। এক কানে একটা রুপোর মাকড়ি। গায়ে ময়লা হয়ে যাওয়া হলুদ টি-শার্ট। বারমুডা প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকা লিকলিকে ঠ্যাং দুটো প্রায় স্টিয়ারিং পর্যন্ত বাড়ানো।

ছেলেটা গুনগুন করে একটা হিন্দি গানের সুর ভাঁজছিল, আর পা নাচাচ্ছিল। আর ওর ওস্তাদ স্টিয়ারিং-এ একটা হাতের ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বসেছিল। পোড়-খাওয়া মুখে একঘেয়েমিতে অভ্যস্ত নির্বিকার ছাপ।

শীতের দুপুরে রাস্তায় লোকজন কম। হলদে-কালো অটোগুলো মাঝে-মাঝে চঞ্চল ইঁদুরের মতো ছুটে যাচ্ছে। এ ছাড়া প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সি কখনও-কখনও।

অলস আট-দশ মিনিট কেটে যাওয়ার পর আচমকা মোবাইল ফোন বেজে উঠল। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা ছেলেটা চমকে উঠে হকচকিয়ে গেল। কলটা রিসিভ করতে গিয়ে আর-একটু হলেই ও ভুল বোতাম টিপে বারোটা বাজাচ্ছিল। কারণ, এই কলটার জন্যই ও এতক্ষণ দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল।

'হ্যালো—।' ছেলেটি কথা বলল মোবাইল ফোনে।

'ত্রিযামা বলছি। ক্যান্ডিডেট দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়েছে।'

'ও. কে.।' পল্লব বলল।

'তুই গাড়িটা নিয়ে চট করে চলে আয়। যা-যা বলেছি মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ—আছে।' চাপা গলায় জবাব দিল পল্লব।

'তা হলে স্টার্ট রাইট নাউ। গাড়ি নিয়ে সোজা ক্যান্ডিডেটের দোকানের কাছে চলে আয়...!'

ত্রিযামার আদেশ মানে পল্লবের কাছে বিরাট ব্যাপার। ও ছোট্ট করে বলল, 'যাচ্ছি—।' তারপরই সিট ছেড়ে গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে এসে ঝিমিয়ে পড়া ড্রাইভারকে বলল, 'ভাই, এবার স্টার্ট দাও। সামনের মোড়টায় গিয়ে ডানদিকে ঘুরবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝ্যাকোর-ঝ্যাকোর করে ড্রাইভার স্টার্ট দিল। হেল্‌পার ছেলেটা এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসল। স্কুল-বাসটা চলতে শুরু করল।

পল্লব গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে এল সুদেব সামন্তর দোকানের সামনে। ড্রাইভারকে বলে গাড়িটা দোকানের গা ঘেঁষে পার্ক করাল। ফলে দোকানের দরজাটা আড়াল হয়ে গেল।

পল্লব ড্রাইভারকে বলল, 'এবার তা হলে নেমে গিয়ে সামনের একটা চাকা খুলে যা-যা বলেছি শুরু করো। আমি চলে যাচ্ছি। ঠিক তিনটের সময়ে তোমরা গাড়ি নিয়ে ফিরে যাবে।'

পল্লব গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল খালধারের দিকে। ও জানে, ত্রিযামা কাজ সেরে ওদিকেই কোথাও ওর জন্য অপেক্ষা করবে।

পল্লব চলে যাওয়ার পরই ড্রাইভার আর হেল্‌পার হুইল-রেঞ্চ, জ্যাক ইত্যাদি নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। গাড়িটা ডানদিকের ফুটপাত ঘেঁষে পার্ক করা ছিল। তাই ওরা সামনের বাঁ-দিকের চাকার কাছে গিয়ে বসল। চাকাটা খুলতে শুরু করল।

দুপুরবেলা এই সাইড রোডটা কখনওই ব্যস্ত থাকে না। কিন্তু তবুও যে-সামান্য কয়েকজন লোক চলাফেরা করছিল বা রোদ পোহাচ্ছিল তারা ভাবল গাড়িটার হয়তো টায়ার পাংচার হয়ে গেছে, অথবা কোনও কলকবজা বিকল হয়ে গেছে।

ত্রিযামা সুদেব সামন্তর দোকান থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রমিতা আন্টির কাছ থেকে সুদেবের রোজকার রুটিন ও আগেই জেনে নিয়েছে। সেই বুঝেই ও বাড়ির কাছাকাছি চেনা একটা ট্রাভেল কোম্পানির কাছ থেকে এই স্কুল-বাসটা কয়েক ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিয়েছে। ড্রাইভার আর হেল্‌পারকে কী করতে হবে সেটা মালিককে বলে নিয়েছে। আর বাড়তি টাকাও দিয়েছে তার জন্য।

সুদেব কখন দোকান ছেড়ে বেরোয় সেটা লক্ষ রাখছিল ত্রিযামা। আজকের কাজের জন্য ও এক বন্ধুর কাছ থেকে মোবাইল ফোন ধার করে পল্লবকে দিয়েছে।

পল্লবের সঙ্গে কথা শেষ করেই ত্রিযামা প্রমিতাকে ফোন করল।

pathagar.net

'আন্টি—।'

'হ্যাঁ, বলো।' প্রমিতা না চাইলেও ওর গলার স্বর কেঁপে গেল।

'আমরা রেডি। সুদেব সামন্ত কাজে বেরিয়ে গেছে। পল্লব মিনিবাস নিয়ে ওর দোকানের সামনেটা কভার করে দিয়েছে। আপনি এবার স্টার্ট দিন।'

'হ্-হ্যাঁ। রওনা হচ্ছি—।'

'ঘাবড়াবেন না, আন্টি। আমি আর পল্লব ওয়াচ রাখছি। কোনও প্রবলেম হলেই আপনাকে রিং করে দেব। ও. কে.?'

'ও. কে.।' বলল প্রমিতা।

'আপনিও কোনও প্রবলেম ফেস করলে আমাকে ফোন করে দেবেন।'

'হ্-হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'বেস্ট অফ লাক, আন্টি।'

ফোন ছেড়ে দিল ত্রিযামা। এবং তারপরই ফোন করল পল্লবকে।

'পল্লব।'

'হ্যাঁ—।'

'তুই কোথায়?'

'ডানদিকের ফুটপাত ধরে খালধারের দিকে যাচ্ছি।'

'না, এদিকে আসতে হবে না। এদিকটা আমি ওয়াচ রাখছি। বেটার তুই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে চলে যা। কোনও দোকান-টোকানের আড়াল থেকে সুদেবের দোকানের অ্যাপ্রোচ রোডের দিকে নজর রাখ। বাস্টার্ডটাকে দেখতে পেলেই আমাকে ফোন করবি। আমি ইমিডিয়েটলি আন্টিকে অ্যালার্ট করে দেব।'

'ও. কে.। উলটোদিকে চললাম।'

পল্লব অ্যাবাউট টার্ন করল। নীরোদবিহারী মল্লিক রোড ধরে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের ক্রসিং-এর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সুতরাং সুদেব সামন্তর দোকানকে মাঝখানে রেখে ত্রিযামা পুব দিক আর পল্লব পশ্চিম দিক আগলানোর দায়িত্ব নিল।

ত্রিযামা ভাবছিল, 'ওয়াচ তো আমরা রাখছি। কিন্তু আন্টি কাজটা ঠিকমতো হাসিল করতে পারবে তো?'

প্রমিতা হালসীবাগানের ভেতরের রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। ওর বুকের ভেতরে পাগল করা গতিতে ছুটছিল ওর প্রাণ। টেনশান টগবগ করে ফুটছিল। তাই ত্রিযামার ফোনটা আসতেই ও চমকে উঠেছিল।

ত্রিযামার সঙ্গে কথা বলা শেষ করেই প্রমিতা জোরে পা চালাল। চলতে-চলতেই

হাতব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে রিং-এ লাগানো দুটো চাবি অনুভব করল। সুদেবের দোকানের তালাজোড়ার নকল চাবি। পল্লব আর ত্রিযামা ওদের কাজ শেষ করেছে। এখন শুধু প্রমিতার কাজ বাকি—আসল কাজ।

প্রমিতার হৃৎপিণ্ডের কোনও দোষ ছিল না। এই অবস্থায় যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছিল। প্রমিতার বুকের খাঁচায় ওটা ধক-ধক করে মাথা কুটে মরছিল। প্রমিতা সেই ভয়ঙ্কর শব্দটাকে উপেক্ষা করে গাইডেড মিসাইলের মতো ভ্রূক্ষেপহীনভাবে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুদেব সামন্তর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল প্রমিতা। এপাশ-ওপাশ তাকাল। দু-একজন লোক চোখে পড়ছে বটে কিন্তু তারা কেউই এদিকে তাকিয়ে নেই। আর হলদে রঙের স্কুল-বাসটা সুদেবের দোকানটাকে প্রায় শতকরা আশিভাগ আড়াল করে দিয়েছে।

হাতব্যাগ হাতড়ে চাবির রিং বের করল প্রমিতা। তাতে ঝুলছে চকচকে দুটো চাবি। এই চাবি দিয়ে তালাদুটো খোলা যাবে তো?

ওর হাত ভীষণভাবে কাঁপছিল। ভয়ও করছিল। কিন্তু মরা মেয়েটা প্রতিমুহূর্তে ওকে সাহস জোগাতে লাগল।

কাঁপা হাতে কয়েকবারের চেষ্টায় প্রথম তালাটা খুলল প্রমিতা। তারপর দ্বিতীয় তালাটা।

ওর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। থরথর হাতে পাল্লার একটা ভাঁজ খুলে ধাপিতে পা দিয়ে সুদেবের দোকানে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই একটা অদ্ভুত গন্ধ পেল। গন্ধটা কীসের তা ঠাহর করতে না পারলেও গন্ধটা ওর ভালো লাগল না।

সুদেবের দোকানে ঢুকতে পারলে ও কী-কী করবে সেটা বহুবার ভেবেছে প্রমিতা। মনে-মনে রিহার্সালও দিয়েছে অসংখ্যবার। তাই দোকানে পা দিয়েই ও প্রথমে আলোর সুইচ জ্বেলে দিল। কয়েকবার ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরারের পর দুটো টিউবলাইটই জ্বেলে দিতে পারল। একটা টিউবলাইট দোকানের সামনের ওয়ার্কশপ এলাকায়, আর দ্বিতীয়টা পিছনদিকে—সুদেবের ষাট স্কোয়ার ফুটের 'ফ্ল্যাট'-এ।

আলো দুটো জ্বেলেই দোকানের কাঠের পাল্লা টেনে দিল। ভেতর থেকে শিকল এঁটে দিল। হাতব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করে একবার দেখে নিল সেটা ঠিকমতো চলছে কি না। তারপর আবার ব্যাগের ভেতরে রেখে দিল।

একটা টুলের ওপরে হাতব্যাগটা রেখে ওয়ার্কশপটা ভালো করে জরিপ করল প্রমিতা।

একপাশে দাঁড় করানো একটা ঝরঝরে সাইকেল। আর এখানে-সেখানে তারের

pathagar.net

কয়েল, নানান যন্ত্রপাতি, ছোট-ছোট মোটর, ফ্যানের ব্লেড্ তাতাল, এইসব জিনিস ছড়ানো।

নাঃ, সেরকম কিছু ওর নজরে পড়ল না।

তারপর সন্তর্পণে সাবধানে পা ফেলে ও দোকানের পিছনদিকটায় এগিয়ে গেল। চটের দেওয়াল সরিয়ে ঢুকে পড়ল পিছনের ঘরে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রমিতার চোখ বোলানোর কাজ শেষ। স্টোভ, থালা-বাটি-গ্লাস, তক্তপোশ, রেডিয়ো, টিভি আর বেশরম পোস্টারগুলো ও যেন চোখের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে মগজে ঢুকিয়ে নিল। তারপর চোখের কাজ শেষ করে হাতের কাজে নামল।

ছোট্ট আস্তানাটা পাগলের মতো হাঁটকাতে লাগল প্রমিতা। আর একইসঙ্গে বিড়বিড় করে সুচরিতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

'আমি কী খুঁজছি তা নিজেই জানি না। অথচ খুঁজছি।'

'তা বলে তুমি সার্চ করা স্টপ করবে নাকি! অনেক সময় এমন হয় না, মাম, যে আমরা একটা কিছু খুঁজে পাওয়ার পর বুঝতে পারি সেটা খুঁজে পাওয়াটা খুব ইম্পরট্যান্ট ছিল। এটাও ধরে নাও সেইরকম...।'

'হুঁ....ঠিকই বলেছিস....।'

বিড়বিড় করতে-করতে ঘরের নানান জিনিস হাতড়াচ্ছিল প্রমিতা। তক্তপোশের চাদর-তোশক উলটে দেখল।

বিছানায় দুটো বালিশ ওপর-ওপর রাখা। তার গায়ে কমলা রঙের সস্তা 'জামা'। ব্যবহারে-ব্যবহারে জলুশ কমে গেছে। বালিশের পাশে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার—সঙ্গে এক বান্ডিল বিড়ি।

একলহমা কী যেন ভাবল প্রমিতা। তারপর বালিশ দুটো ঝটকা মেরে তুলেই আবার রেখে দিল। কিছু নেই। টিভির পিছনটা উঁকি মেরে দেখল। টিভির টেবিলের নীচটা দেখল : শুধু কয়েকটা পুরোনো খবরের কাগজ।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো দড়িতে জামাকাপড়, প্যান্ট, পায়জামা ঝুলছে। সেগুলো নেড়েচেড়ে পকেটগুলো উলটেপালটে দেখল।

তক্তপোশের পায়ের দিকে এককোণে দু-চারটে ময়লা জামা-প্যান্ট ডাঁই হয়ে পড়ে ছিল। সেখানেও হাতড়ে কিছু পাওয়া গেল না।

হঠাৎই কী ভেবে ঘরের নোংরা মেঝেতে বসে পড়ল প্রমিতা। মাথা হেলিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে খাটের তলায় উঁকি মারল। বিছানার চাদরের ঝুলে থাকা অংশটা ওর নাকে ছুঁয়ে যাওয়ায় একটা তেলচিটে বোটকা গন্ধ ওকে ধাক্কা মারল। গন্ধটাকে আমল না দিয়ে বাঁহাতে চাদর সরিয়ে ও মাথা ঢুকিয়ে দিল খাটের নীচে।

টিউবলাইটের ঠিকরে আসা আলোয় আবছাভাবে একটা ব্রিফকেস নজরে পড়ল ওর। সঙ্গে-সঙ্গে ব্রিফকেসটাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল।

বাদামি রঙের সস্তা ব্রিফকেস। বিশ্রীভাবে রং চটে গেছে। সর্বত্র আঁচড় আর ঘষটানির দাগ।

ব্রিফকেসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রমিতা। আপনমনে বিড়বিড় করতে-করতে ওটা তক্তপোশের ওপরে রাখল। তারপর দুপাশের লকের কাছে চাপ দিতেই ডালা খুলে গেল।

ঢাকনাটা তুলে পিছনদিকে হেলিয়ে দিল। টিউবলাইটের আলোয় ব্রিফকেসের ভেতরের জিনিসগুলো স্পষ্ট দেখা গেল।

কাঁপা হাতে জিনিসগুলো ঘাঁটতে শুরু করল প্রমিতা।

প্রথমেই একটা লম্বা সাদা খাম। খালি। কিন্তু খামের ওপরে গোটা-গোটা হরফে লেখা 'সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়'।

খামটা উলটেপালটে দেখে রেখে দিল। তারপরই আবার অনুসন্ধান।

একসেট শৌখিন জামা-প্যান্ট—সাজগোজ করে কোথাও যাওয়ার জন্য। একশো টাকা আর পঞ্চাশ টাকার নোট মিলিয়ে বেশ কিছু টাকা। পুরোনো কয়েকটা চিঠিপত্র। একটা চামড়ার বেল্ট। দুটো ধারালো ছুরি—একটা বেশ বড়, অন্যটা ছোট। একটা বাঁধানো ডায়েরি।

ডায়েরিটা হাতে তুলে নিল। চটপট পাতা ওলটাতে লাগল।

লোকের নাম-ধাম আর ফোন-নম্বর। এ ছাড়া নানান হিসেবপত্র। ব্যক্তিগত কিছুই লেখা নেই।

এরপরই মোবাইল ফোনটা খুঁজে পেল প্রমিতা। ব্রিফকেসের এক কোণে রুমালে জড়ানো ছিল। রুমালের মোড়ক খুলে ফেলতেই গাঢ় নীল আর রুপোলি রঙের ছোট মোবাইল ফোনটা প্রকাশিত হল।

স্যামসাঙ আর-টু-টুয়েন্টি।

প্রমিতা থরথর করে কেঁপে উঠল। ফোনটা হাতে নিয়ে ব্রিফকেসের পাশে বিছানায় বসে পড়ল।

ঠিক এইরকম মডেলের ফোনই কিনেছে প্রমিতা। এর মধ্যে ফোনের অপারেশান ও ভালোই সড়গড় করে নিয়েছে। তাই এক সেকেন্ডও দেরি না করে ফোনটা অন করল।

নীল আলো। মিষ্টি সুরের বাজনা।

বদ্ধ ঘরে বাজনাটা অসম্ভব জোরালো শোনাল।

সিম কার্ডকে তৈরি হওয়ার সময় দিল। তারপর কাঁপা আঙুলে বোতাম টিপতে

pathagar.net

শুরু করল।

অরিন বলেছিল, রিতুর ফোনের একটা বোতামে সামান্য ডিফেক্ট ছিল। কিন্তু কোন বোতামটায়?

প্রমিতা উদ্ভ্রান্তের মতো মনের ভেতরে হাতড়াতে লাগল। কোন বোতামটা যেন? কোনটা যেন...?

হঠাৎই বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সেই আলোয় উজ্জ্বল একটা সংখ্যা ধরা দিল মনে। চার। ফোর। হ্যাঁ, মনে পড়েছে! অরিন বলেছিল, রিতুর ফোনের 'ফোর' লেখা বাটনটায় একটু ডিফেক্ট ছিল। ওটা একটু মিস করত। কিছু লিখতে হলে তিন-চারবার বোতামটা টিপতে হত।

এটা কার ফোন? রিতুর? না সুদেব সামন্তর? যাচাই করেই দেখা যাক।

ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করল প্রমিতা।

পল্লব একটা চায়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের দু-দিকেই নজর রাখছিল। লোকজনের সন্দেহ এড়ানোর জন্য ওর হাতে একভাঁড় চা আর একটা বিস্কুট। বিস্কুটে ছোট-ছোট কামড় দিচ্ছিল আর চায়ে থেকে-থেকে চুমুক।

হঠাৎই ও দেখল, সুদেব সামন্ত ফিরে আসছে। একহাতে বিড়ি আর অন্যহাতে একটা ডোরাকাটা নাইলনের থলে।

পল্লব অবাক হয়ে গেল। ত্রিযামা যেরকম বলেছিল তাতে সুদেবের ঘণ্টাদুয়েক পরে ফেরার কথা।

পল্লবের বুক কেঁপে উঠল। হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা ফেলে দিল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ত্রিযামাকে ফোন করল।

ত্রিযামার ফোন যে বাজছে সেটা পল্লব শুনতে পেল। অধৈর্য হয়ে ও মনে-মনে বলতে লাগল, শিগগির ফোন ধর! শিগগির!

'হ্যালো—।' ত্রিযামা বলল।

'অ্যাই, সুদেব সামন্ত ফিরে আসছে।' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল পল্লব।

'হোয়াট?'

'লোকটা ফিরে আসছে। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরে। মনে হচ্ছে, দোকানের দিকে টার্ন নিতে পারে।'

'সঙ্গে আর-কেউ আছে?'

'কেউ নেই। ও একা। শিগগির আন্টিকে ফোন কর। রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই।'

'ও. কে.—রাখছি।'

ফোন ছেড়ে দিল ত্রিযামা।

পল্লব মোবাইল ফোন পকেটে রেখে হাতের বিস্কুটে একটা কামড় দিল। তারপর আরও একটু আড়ালে সরে গিয়ে সুদেব সামন্তর ওপরে নজর রাখতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পল্লব যা ভেবেছিল তাই।

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরে এগিয়ে এসে সুদেব ডানদিকে ঘুরল, ঢুকে পড়ল নীরোদবিহারী মল্লিক রোডে।

ওর সুন্দর মুখ, শান্ত চলার ভঙ্গি দেখে কেউই ভাববে না ও একজন খুনি। খুন ওর কাছে পুরোনো খেলা।

পল্লবের বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করল।

pathagar.net

pathagar.net

প্রথমে রিং-টোনটা বাজাল প্রমিতা।

সেটা বাজতে শুরু করতেই ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘুমপাড়ানি গানের মতো একটা সাপ-খেলানো সুর এক বিচিত্র মায়াজাল বিছিয়ে দিল। ছোট্ট নোংরা আস্তানাটাকে সেই সুর হঠাৎই রূপসী করে তুলল।

এই রিং-টোনটা সুচরিতার ফোনে ছিল। সেই একই রিং-টোন সেট করা আছে প্রমিতার ফোনেও। বেশ মনে পড়ছে, ত্রিযামাকে বলে রিং-টোনটা ও সেট করিয়েছিল।

কিন্তু মন বড় অদ্ভুত জিনিস। প্রমিতা হঠাৎই কেমন ধন্দে পড়ে গেল। এই রিং-টোনটাই তো? ওর মনে হল, আজ যাচাই করার দিন। হাতের কাছেই যখন ওর নিজের ফোনটা রয়েছে তখন সরাসরি যাচাই করে নিতে ক্ষতি কী!

সুদেবের ফোনটা হাতে নিয়ে ওয়ার্কশপে চলে এল প্রমিতা। গালে-কপালে কখন যেন ঘামের ফোঁটা তৈরি হয়েছিল। হাতের পিঠ দিয়ে ঘাম মুছে নিল। তারপর চটপটে পা ফেলে টুলের কাছে এসে হাতব্যাগটা তুলে নিল।

ব্যাগ থেকে নিজের মোবাইল ফোনটা বের করল। তারপর দু-হাতে দুটো ফোন নিয়ে পরীক্ষা—কনফারমেটিভ টেস্ট।

একে-একে দুটো ফোনের রিং-টোন বাজাল প্রমিতা।

কোনও তফাত নেই। ছন্দ, তাল, লয়, সুর, উপসুর সব হুবহু একইরকম।

কাঁপা হাতে নিজের ফোনটা হাতব্যাগের ওপরে রাখল। ওর মন সবসময় সাবধান ছিল। কারণ, দুটো ফোন একইরকম দেখতে—তাড়াহুড়োতে কোনটা কার গুলিয়ে না যায়।

এইবার শেষ পরীক্ষা। অগ্নিপরীক্ষা।

প্রমিতার বুক কাঁপছিল, গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, আর হাতের আঙুলগুলো এমন কাঁপছিল যেন অদৃশ্য এক জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে।

সুদেবের ফোনটা বাঁহাতে ধরা ছিল। আর অবাধ্য ডানহাত কিছুতেই নিজেকে স্থির করতে পারছিল না। প্রমিতা ডানহাতটা কয়েকবার ঝটকা দিল। তারপর মন শক্ত করে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে সুদেবের ফোনের চার নম্বর বোতামটা টিপল।

ফোনের পরদায় নতুন কোনও লেখা ফুটে উঠল না। তবে নীল আলোটা জ্বলে উঠল।

আবার বোতামটা টিপল।

এবারেও সেই একই ব্যাপার, কোনও লেখা ফুটল না পরদায়।

তৃতীয়বারে ইংরেজি 'চার' সংখ্যাটা পাওয়া গেল। আর একইসঙ্গে প্রমিতা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল।

এটা রিতুর ফোন! রিতুর ফোন! রিতুর ফোন!

প্রমিতা হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ফোনটাকে বুকে আঁকড়ে শখের-খেলনা-ভেঙে-ফেলা বাচ্চা মেয়ের মতো হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

আর কোনও সন্দেহ নেই—কোনও সংশয় নেই।

সেই রবিবারে সুদেব সামন্তই রিতুর সর্বনাশ করেছিল। হতচ্ছাড়া লোকটা পরমেশ আর প্রমিতাকেও একইসঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। পুলিশ ঠিকমতো প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি বলে আদালতে সুদেব রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। আইন যতই শক্তিশালী হোক, সুদেবের চুলের ডগাও ছুঁতে পারেনি।

এখন এই মোবাইল ফোনটা নিয়ে কিছু একটা করা যায় না! পুলিশ প্রশ্ন তুলতেই পারে, সুচরিতার মোবাইল ফোন সুদেব সামন্তর কাছে কী করে এল। তখন কী উত্তর দেবে সুদেব?

এমন সময় প্রমিতার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

কিন্তু প্রমিতা কিছুই শুনতে পেল না। ও তখন ভেজা চোখে থরথর করে কাঁপছিল, নানান আবেগে ভাসছিল। মনে-মনে চোর-পুলিশ খেলছিল ও। কখনও চোরের হয়ে কখনও পুলিশের হয়ে প্রশ্ন তুলছিল, কাল্পনিক সওয়াল-জবাব চালিয়ে যাচ্ছিল।

'এ-ফোনটা কার, মিস্টার সামন্ত?' সরকারি উকিল খোঁচা-দেওয়া সুরে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ভিজে বেড়াল সুদেব মোলায়েম গলায় বলল, 'আমার ফোন, স্যার—।'

'কোত্থেকে পেয়েছেন ফোনটা?'

'কিনেছি—ফ্যান্সি মার্কেট থেকে।'

'কোনও বিল বা ক্যাশমেমো আছে?'

'না। ওটা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছি তাই কোনও বিল দেয়নি....।'

'ফোনটা যে আপনার সেটা প্রমাণ করতে পারবেন?'

বোকা-বোকা হাসল সুদেব। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমার ফোন-নম্বর বলতে পারি। যাদেরকে লাস্ট দু-তিনদিনে ফোন করেছি তাদের কয়েকজনের নাম আর ফোন-নম্বর বলতে পারি। যেসব ফোন রিসিভ করেছি....ওহ্-হো, আর-একটা স্পেশাল ব্যাপার মনে পড়েছে। আমার ফোনটার চার নম্বর বোতামটায় একটু গড়বড়। দু চারবার না টিপলে কাজ হয় না....।'

ব্যস, সব শেষ!

প্রমিতা অনায়াসেই বুঝতে পারল, এই ফোনটা আদালতে পেশ করেও কোনও

pathagar.net

লাভ হবে না। তা ছাড়া ফোনের গায়ে সুদেবের আঙুলের ছাপ যে পাওয়া যাবে সেটাই স্বাভাবিক। বরং ফোনটা যে কোনও সময়ে রিতুর ছিল সেটা প্রমাণ করাই খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ, সুচরিতা ফোনটা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিল। কিন্তু ফোনের বাক্সটা তো রিতুর ঘরে আছে! তার গায়ে ফোনের সিরিয়াল নম্বরের স্টিকার আছে না? সেই নম্বর দেখে...।

প্রমিতা এতসব ভাবছিল, কারণ, ও এ-কথা জানত না যে, কোনও বিশেষ অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনও আসামি যদি বিচারে একবার বেকসুর খালাস হয়ে যায় তা হলে সেই অপরাধের অভিযোগে তার আর বিচার করা যায় না।

প্রমিতার কান্না থেমে গিয়েছিল। এখন বুক ঠেলে হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সন্দেহ এখন আর নেই বটে, কিন্তু করার কি কিছু আছে?

এমনসময় প্রমিতার মোবাইল ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।

ফোনটা হাতব্যাগের ওপর থেকে তুলে নিল প্রমিতা। বোতাম টিপে 'হ্যালো' বলল।

'আন্টি, আমি ত্রি....।'

অস্পষ্ট ভাঙা-ভাঙা ভাবে এই ক'টা শব্দের টুকরো শোনা গেল।

প্রমিতা বুঝতে পারল ত্রিযামা ফোন করছে। ওর ফোন-নম্বর ফুটে উঠেছে প্রমিতার মোবাইলে। তা ছাড়া ত্রিযামার গলাও চিনতে পারল ও।

প্রমিতা ক্রমাগত 'হ্যালো! হ্যালো!' করতে লাগল, কিন্তু মনে হল না ত্রিযামা ওর কোনও কথা শুনতে পাচ্ছে।

ও-প্রান্ত থেকে শুধু কাটা-কাটা শব্দের টুকরো ভেসে আসছিল। ত্রিযামার কথার একটা বর্ণও প্রমিতা বুঝতে পারছিল না। আজকাল প্রায়ই টাওয়ারের গোলমাল হচ্ছে। এখনও বোধহয় সেই একই সমস্যা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ফোনটা কেটে গেল।

ত্রিযামার কথা শুনতে না পেলেও প্রমিতা একটা বিপদের আশঙ্কা করল। তাই তাড়াহুড়ো করে ওয়ার্কশপ ছেড়ে ভেতরের খুপরি-ঘরে পা বাড়াল। বিছানার কাছে এসে খোলা ব্রিফকেসের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। সুদেবের মোবাইল ফোনটা—নাকি রিতুর ফোন?—ঝটপট রুমালে জড়িয়ে ব্রিফকেসের জায়গামতো রেখে দিল। তারপর ব্যস্ত হাতে ব্রিফকেসের জিনিসগুলো ঠিকঠাক করে আগের মতো সাজাতে লাগল। সুদেব সামন্ত যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে ওর আস্তানায় কেউ হানা দিয়েছিল।

এমন সময় প্রমিতার মোবাইল ফোন বেজে উঠল আবার।

প্রমিতা চমকে উঠল। তারপর ফোন রিসিভ করে 'হ্যালো' বলল।

ও-প্রান্ত থেকে ত্রিযামা উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে বলছিল, 'আন্টি, শিগগির দোকান

থেকে বেরিয়ে পড়ুন। সুদেব সামন্ত ফিরে আসছে।' কিন্তু প্রমিতা কাটা-কাটা অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না।

একটু পরেই ফোনটা কেটে গেল।

প্রমিতা খানিকটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপরে ভর করেই আরও চটপট হাত চালাল। ব্রিফকেস বন্ধ করে ঢুকিয়ে দিল খাটের তলায়। বিছানা, চাদর, বালিশ—সব আগের মতো ঠিকঠাক করে দিল। তারপর ঘরটাকে সূক্ষ্ম নজরে জরিপ করল। কোথাও কোনও গরমিল নেই তো?

নাঃ, সেরকম কিছু চোখে পড়ল না।

ঠিক তখনই ওর মোবাইল বেজে উঠল—কিন্তু এবারে অন্যরকম সুর। কেউ 'এস. এম. এস.' পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই ত্রিযামা।

তাড়াতাড়ি মেসেজটা দেখল প্রমিতা। দেখেই ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল।

'কুইক। সুদেব কামিং ব্যাক। কুইক।'

ত্রিযামাই মেসেজটা পাঠিয়েছে। আগের দুটো ফোনের চেষ্টা থেকে প্রমিতা ব্যাপারটা আঁচ করেছিল। কিন্তু আঁচ করা আর নিশ্চিতভাবে জানা—দুটোর মধ্যে তফাত আছে। সেইজন্যই খবরটা জানামাত্র প্রমিতার ভেতরে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেছে।

মোবাইল ফোনটা হাতব্যাগে ঢুকিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রমিতা দোকানের দরজার কাছে চলে এল। সুইচ টিপে টিউবলাইট দুটো অফ করে দিল। তারপর শিকল খুলে দোকানের দরজার পাল্লা ফাঁক করল। বড় করে একটা শ্বাস নিল। এতক্ষণ ওর দম যেন বন্ধ হয়ে ছিল।

তারপর ধাপি। ধাপি থেকে ফুটপাত। নজর চলল এদিক-ওদিক। না, সুদেবকে এখনও চোখে পড়ছে না।

হাতব্যাগ থেকে চাবির রিং আগেই বের করে নিয়েছিল প্রমিতা। এবার কাঁপা হাতে হাঁসকলে তালা লাগাল।

বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। মাথা দপদপ করছিল। আর রিতু 'ওটা আমার ফোন, মাম! ওটা আমার ফোন!' করে চেঁচাচ্ছিল।

তারই মধ্যে শেষ পর্যন্ত কেমন করে যে তালাদুটো ঠিকঠাক লাগাতে পারল সে ঈশ্বর জানেন।

চাবির রিং হাতব্যাগের ভেতরে রাখতে রাখতে শুরু হল পথ চলা।

দোকানের মুখ আগলে দাঁড়ানো স্কুল বাসটাকে পাশ কাটিয়ে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। তারপর হনহন। ঠিক করল, বাড়ির দিকে নয়, ও খালধারের দিকে যাবে। কিছুটা যাওয়ার পর নিরাপদ জায়গা থেকে ত্রিযামাকে ফোন করবে।

কেক-বিস্কুটের ফ্যাক্টরির সামনে এসে ডানদিকে ঘুরল প্রমিতা। ও প্রাণপণে ভগবানকে ডাকছিল। ওর সঙ্গে যেন সুদেবের কিছুতেই দেখা না হয়। কারণ, দেখা

pathagar.net

হলে মনের এই অবস্থায় প্রমিতা কী করে বসবে কে জানে। হয়তো পরমেশের মতো হঠকারী কোনও কাজ করে রাস্তায় ভিড় জমিয়ে ফেলবে। কিন্তু তাতে যে কাজের কাজ কিছু হবে না সেটা প্রমিতা এতদিনে বেশ ভালো করে বুঝে গেছে।

রোদ মাথায় করে হাঁটছিল প্রমিতা। আর এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। না, সুদেবকে কোথাও চোখে পড়ছে না।

হঠাৎই ব্যাগের ভেতরে ওর মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল।

পথ চলতে-চলতেই ফোন ধরল প্রমিতা।

ত্রিযামা ফোন করেছে। ওর কথা এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে প্রমিতা।

'আন্টি, আপনি কোথায়?'

প্রমিতা বলল।

'আপনি আর পনেরো-কুড়ি মিটার এগোলেই বাঁদিকের একটা মোটর গ্যারাজের পাশে আমাকে দেখতে পাবেন। থ্যাংক গড যে, কোনও প্রবলেম হয়নি। আপনি ঠিক আছেন তো?'

বড় একটা শ্বাস টেনে প্রমিতা শ্রান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তুমি আর পল্লব আমার বাড়িতে চলে এসো। আমি খালধার দিয়ে ঘুরে বাড়ি চলে যাচ্ছি, কেমন?'

'ও. কে., আন্টি।'

প্রমিতা ফোনটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রিতুর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলতে-বলতে ও একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেল। নানান কথা বলার পর ও সুচরিতাকে বলল, 'জানিস, রিতু, জানার অনেক জ্বালা আছে।'

'তার মানে? কী বলছ, মাম?'

'এই যে আমি আজ কনফার্ম্ড হলাম সুদেব সামন্ত লোকটাই তোকে মার্ডার করেছে। করে তোর মোবাইলটা নিয়ে পালিয়েছে। একটু আগেই যে আমি তোর ফোনটা নিজের হাতে নেড়েচেড়ে এলাম! এসব জানার অনেক জ্বালা। অনেক জানলে পর অনেক সইতে হয়।'

'আমিও তো অনেক সয়েছি...অনেক সইছি, মাম। আমার জ্বালা নিভছে কই!'

'জানি, রিতু, জানি...।' প্রমিতার চোখে জল এসে গেল।

বাঘ ঘরে ফিরে এল।

যন্ত্রপাতির ব্যাগটা ও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দ্যাখে ব্যাগের মধ্যে লাইন টেস্টারটাই নেই। বিরক্তির একশেষ। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে মনে পড়ল কাল রাতে কাজ করতে গিয়ে টেস্টারটা বের করেছিল—কিন্তু

পরে আর ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা হয়নি।

মনে-মনে নিজেকেই গালাগাল দিল সুদেব। এরকম ভুল কেউ করে!

ওর সমস্ত কাজের পিছনে একটা চিন্তা থাকে, পরিকল্পনা থাকে, খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর থাকে। সেইজন্যই ও এখনও স্বাধীন, মুক্ত, জেলের বাইরে। ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে কাজ হাসিল করে বলে ও সবসময় নিজেকে তারিফ করে। তা হলে এখন? এই যে টেস্টারের ভুল! বেকার এতটা পথ আসা-যাওয়া।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে দোকানের দিকে ফিরে আসছিল সুদেব। নীরোদবিহারী মল্লিক রোড থেকে ডানদিকে ঘুরেই দেখল একটা হলদে রঙের স্কুল-বাস ওর দোকানটা প্রায় আড়াল করে দাঁড়িয়ে।

সুদেবের বিরক্তি আরও বাড়ল।

ও ড্রাইভার আর হেল্‌পারের কাছে গিয়ে কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই উদোম গালিগালাজ শুরু করল। ওরা চাকা পালটানোর ব্যাপারটা সুদেবকে বোঝাতে চাইছিল, কিন্তু ক্ষিপ্ত সুদেব ওদের পাত্তাই দিল না। ওর দোকান গার্ড করেছে বলে একেবারে মা-মাসি উদ্ধার করতে লাগল।

ড্রাইভার আর হেল্‌পার ওর এই খ্যাপার মতো ব্যবহারে অবাক হলেও কিছু বলল না। বেপাড়া বলে সব গালাগাল হজম করল। ওদের 'নকল' চাকা পালটানোর কাজ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি বাসে উঠে বাস স্টার্ট দিতে শুরু করল।

পকেট থেকে চাবি বের করে দোকানের তালা খুলল সুদেব। চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলার সময় চাবিটা বারকয়েক আটকে যেতে চাইল।

অন্যদিন তো এরকম হয় না! সুদেব একটু অবাক হল। দরজার পাল্লা খুলে দোকানে ঢুকল ও। সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। গোয়েন্দার চোখে দোকানের ভেতরটা স্লো-মোশানে জরিপ করল।

কেউ ঢুকেছিল নাকি ওর ডেরায়?

বড়-বড় করে শ্বাস টানল। কোনও নতুন গন্ধ কি পাওয়া যাচ্ছে?

নাঃ, সেরকম কিছু নেই।

কিন্তু তবুও সুদেবের সংশয় গেল না। ও দোকানটাকে তন্নতন্ন করে সার্চ করতে শুরু করল। ওর অজান্তে কেউ এখানে ঢুকেছিল কি না জানা দরকার। 'কেউ' বলতে পুলিশও হতে পারে।

মরিয়া হয়ে কোনও নতুন জিনিস, কোনও নতুন চিহ্নের খোঁজ করতে লাগল সুদেব। ওর ঘর বা ওয়ার্কশপের কোনও জিনিস একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি না সেটা বুঝতে চাইল।

pathagar.net

প্রায় আধঘণ্টা পর ও নিশ্চিন্ত হল যে, না, কেউ লুকিয়ে ওর আস্তানায় ঢোকেনি।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা এক মহাজনকে ফোন করতে গিয়ে সুদেব দেখল ওর

মোবাইল ফোনটা অন হয়ে আছে। আর ফোনের পরদায় একটা ইংরেজি চার লেখা রয়েছে।

ফোন ছাড়া সুদেব যখনই বাইরে বেরোয় তখন ও ফোনটা অফ করে রেখে যায়। এ-বিষয়ের নড়চড় হয় না কখনও। অথচ এখন ফোনটা অন করতে গিয়ে দেখছে ফোনটা অন করা রয়েছে। তার ওপর একটা চার লেখা রয়েছে পরদায়!

সুদেব নিজে এত বড় ভুল করতে পারে না। তা হলে কি ব্রিফকেসের মধ্যে চাপ লেগে ফোনটা অন হয়ে গিয়ে এই কাণ্ড হয়েছে?

ভারী আশ্চর্য তো!

সুদেব সামন্তর ভুরু কুঁচকে গেল।

একুশ

সংশয় আর সন্দেহের সব পরদা সরে যাওয়ার পর থেকে প্রমিতা আরও ভয় পেয়ে গেল। যেন সাপ নিয়ে খেলতে-খেলতে হঠাৎ করে প্রমিতা জেনে ফেলেছে সাপটার বিষ আছে। তখন খেলার স্বাভাবিক ছন্দ কেটে গেছে। ভয়ের বিষাক্ত লতা প্রমিতার শরীরকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

এইভাবে ওর দিনগুলো কাটতে লাগল। একদিন...দু-দিন...তিনদিন...চারদিন...।

সুদেব সামন্তর সঙ্গে সম্পর্কটা নমনীয় করে তোলার যে-চেষ্টা প্রমিতা শুরু করেছিল তাতে ও অনড় থাকতে পারবে তো? এখন তো ওর মনে আর কোনও সংশয় নেই, দোলাচল নেই! এখন ও জানে, রিতুকে সেই রবিবার কোন জানোয়ারটা মনে-প্রাণে খতম করেছে। এও জানে, সেই অভিযোগে লোকটাকে আর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না।

এই তথ্যটা গত পরশু ও জেনেছে ত্রিযামার কাছ থেকে। ত্রিযামার এক কাকা উকিল। তাঁর সঙ্গে রিতুর ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছিল ত্রিযামা। বলেছিল, মোবাইল ফোনটা পাওয়ার ঘটনা। সব শুনে তিনি বলেছেন, '....মোবাইল ফোনটা যে ভিকটিমের সেটা প্রমাণ করাই খুব কঠিন। তার ওপর একটা চার্জে কোনও অ্যাকিউজ্‌ড একবার "নট গিল্টি" ভারডিক্ট পেয়ে গেলে তাকে আর সেই চার্জে অ্যাকিউজ করা যাবে না।'

প্রমিতা বেশ বুঝতে পারছিল, ওর কাজটা আরও কঠিন হয়ে গেল। সুদেবের দোকানে দাঁড়িয়ে রিতুকে সেদিন যে-কথাটা বলেছিল সেটা আবার মনে পড়ল : জানার অনেক জ্বালা আছে।

শোওয়ার ঘরের এককোণে পাতা ঠাকুরের আসনের সামনে বসে প্রমিতা শুধু শক্তি চেয়েছে, ভরসা চেয়েছে। ও চোখের পাতা ভিজিয়ে বলেছে, 'পুলিশ, উকিল, আদালত—সব শেষ। সবাই হার মেনেছে। তা হলে ন্যায়বিচারের জন্যে আমার ফুটফুটে মেয়েটা কার কাছে যাবে, বলো! ওর আপন বলতে আমরা...ওর "বাপি" আর "মাম"। আমরা যদি কিছু একটা না করি ওর আত্মা কি কোনওদিন শান্তি পাবে? ওর বাপির সেরকম মনের জোর নেই...অবশ্য আমারও নেই। কিন্তু তুমি আমাকে দিয়ে কিছু একটা করাও, ঠাকুর। তুমি তো সব পারো! আমার হতভাগা মেয়েটাকে যেমন করে হোক সুবিচার দাও। তুমি যা করাবে আমি তাই করতে রাজি আছি। কিন্তু আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ো না...দয়া করো...।'

রোজ প্রমিতা এই আকুল প্রার্থনা জানায় আর মনে-মনে বুঝতে পারে ওকে আরও শক্ত হতে হবে, বিষধর সাপ নিয়ে খেলার অভ্যেস করতে হবে। রিতুর শেষ চাওয়াটা যেভাবে হোক....।

প্রমিতার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, আর ও নতুন করে শপথ নেয় বারবার।

দশদিন পর প্রমিতা আবার নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারল।

এই ক'দিন ও বিষাদে মনমরা হয়ে থেকেছে। রাস্তায় প্রায় বেরোয়নি বললেই চলে। বুবুকে স্কুল-বাসে তুলে দেওয়া আর ছুটির পর বাস থেকে নেওয়ার কাজটাও রুপি কিংবা পরমেশকে দিয়ে করিয়েছে। কারণ, প্রমিতার ভয় হচ্ছিল, যদি রাস্তায় বেরোলে সুদেবের সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয়ে যায়! তখন ও হয়তো নার্ভাস হয়ে পড়বে। ওকে দেখে সুদেব হয়তো ধরে ফেলবে যে, প্রমিতা ওর দোকানে তল্লাশি করতে ঢুকেছিল। তারপর....।

না, প্রমিতা কোনও ঝুঁকি নেয়নি।

এই দশটা দিন ল্যান্ডলাইনের কোনও ফোনও ধরেনি প্রমিতা। রুপি, বুবু বা পরমেশ সেই কাজটা করেছে। একদিন সুদেব সামন্ত ফোন করেছিল। রুপি ফোন ধরে প্রমিতার নির্দেশমতো বলে দিয়েছে, 'বউদি বাড়িতে নেই।'

এক অদ্ভুত উৎকণ্ঠা নিয়ে দশটা দিন কাটিয়েছে প্রমিতা। যদি কোনও দুর্বল মুহূর্তে সুদেবের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়! যদি ওর মুখের ভাব পড়ে নেয় সুদেব! যদি পড়ে নেয় ওর অন্তরের কথা!

শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে পরমেশকে নিয়ে খানিকটা সমস্যায় পড়েছে প্রমিতা। ওকে হঠাৎই চুপচাপ আর মনমরা হয়ে পড়তে দেখে পরমেশ কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওর মনে হয়েছে, রিতু যেন নতুন করে আবার ধাক্কা দিয়েছে প্রমিতাকে। একদিন সন্ধেবেলা ঠাকুরের আসনে বসে ওকে কাঁদতেও দেখেছে পরমেশ।

রাতে বিছানায় শুয়ে পরমেশ ওকে অন্তরঙ্গ সান্ত্বনা দিয়েছে। বারবার জিগ্যেস করেছে, 'কী হয়েছে তোমার?'

প্রমিতা কোনও জবাব দেয়নি। জননীর মনে কখন যে কী উথালপাথাল চলে, পিতা কেমন করে তা জানবে!

'প্রমি, যে গেছে সে তো আর ফিরবে না...।'

প্রমিতা কোনও জবাব দেয়নি। একজন কান্না-ভেজা মা অদ্ভুত এক জেদে গোপনীয়তা আঁকড়ে কাঠ হয়ে থেকেছে।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়েছে পরমেশ। ভেবেছে, রিতু বোধহয় মামকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে থাকবে। তাতে প্রমিতার শুকিয়ে আসা ক্ষতচিহ্নে নতুন করে হয়তো ছুরির খোঁচা লেগেছে।

দশটা দিন যেন সরীসৃপের মতো শীতঘুমে কাটাল প্রমিতা। তারপর নড়েচড়ে উঠল, জেগে উঠল। একটা অনন্ত খিদে টের পেল। প্রতিশোধের খিদে।

এই খিদে ন্যায়-অন্যায় মানে না, রীতি-নীতি মানে না, কারও নিষেধ শোনে না।

তুমি আমাকে দিয়ে কিছু একটা করাও, ঠাকুর!

বাজারের লাগোয়া আলো-ঝলমলে দোকানগুলো অবাক চোখে দেখছিল প্রমিতা। ওর চোখে সদ্য-গ্রাম-থেকে-আসা কোনও বালিকার দৃষ্টি। যেন এরকম আলোর রোশনাই ও আগে কখনও দেখেনি।

বুবু প্রমিতার হাত ধরে একটা খেলনার দোকানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আর বারবার 'মাম, বেব্লেড কিনব! তুমি বলেছিলে...' বলে বায়না করছিল। কিন্তু প্রমিতার সেদিকে মন ছিল না। ও হালকা মনে চারপাশের দোকানপাটের আলোকসজ্জা উপভোগ করছিল। মনে হচ্ছিল, কতদিন...ক-তদিন ও চারপাশের জীবনটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। ওর মন সংশয় আর দোলাচলের কাটাকুটি খেলায় কী ভীষণ ব্যস্ত ছিল! বাইরের জগৎটাকে ও যেন প্রায় ভুলতে বসেছিল।

কিন্তু এখন?

এখন সব মেঘ কেটে গেছে। প্রতিশোধের সূর্য উঠেছে। সেই সূর্যের তীব্র আলো সরাসরি গিয়ে বিদ্ধ করেছে সুদেব সামন্তকে।

লক্ষ্য স্থির থাকলে জীবনের জটিলতা অনেক কমে যায়। নিজেকে পাখির পালকের মতো রঙিন আর হালকা মনে হয়। চারপাশের সবকিছু নতুন আর সুন্দর দেখায়।

প্রমিতার মধ্যে নতুন জীবন টগবগ করে ফুটছিল। রিতু মারা যাওয়ার পর যে পরমেশের শত অনুরোধেও কখনও বেড়াতে বেরোয়নি আজ সে-ই পরমেশের কাছে আবদার করে হাতিবাগানে কেনাকাটা করতে এসেছে।

এই অঞ্চলটায় ভিড় সবসময় লেগেই থাকে। তা ছাড়া গাড়ি পার্ক করার ব্যাপারটাও একটা বিরাট সমস্যা। সেইজন্যই পরমেশ গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি। বুবু আর প্রমিতাকে নিয়ে গৌরীবাড়ি থেকে অটোয় চেপে বসেছে।

শুরু থেকেই প্রমিতার স্বাভাবিক হাবভাব পরমেশের কাছে অস্বাভাবিক লাগছিল। ভুরু সামান্য কুঁচকে গেলেও ব্যাপারটাকে ও খুব বেশি আমল দেয়নি। বরং পুরোনো প্রমিতাকে পেয়ে ভালো লাগছিল। পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ছিল।

বিয়ের আগে দু-বছর ধরে প্রমিতার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছিল। সেইসব দিনগুলো প্রায় বিশ বছর আগের হলেও মনে হয় এই তো সেদিন।

নির্জন দুপুরে ভিক্টোরিয়ার মাঠ কিংবা আউটরাম ঘাট—সঙ্গে কোয়ালিটির

pathagar.net

আইসক্রিম। ঠান্ডা সিনেমা হলে পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গ হওয়া। তারপর হল থেকে বেরিয়ে সিনেমার নানান মুহূর্ত আর অভিনয় নিয়ে হাত-পা নেড়ে তুমুল বিতর্ক। রাতে টেলিফোনে কত কথা! কথা আর শেষ হতেই চায় না। শুধু কথা দিয়ে কত দেয়া-নেয়া, কত চাওয়া-পাওয়া, কত মান-অভিমান!

এখন ফুটপাতের ভিড়ে হকারদের জামাকাপড়ের স্টলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে প্রমিতার দিকে তাকাল পরমেশ।

সেই প্রমিতা। এই কুড়ি বছরে মুখের ডোল তেমন একটা পালটায়নি। শুধু গালের নীচটা সামান্য ভারী হয়েছে। বাকি সব আগের মতোই মিষ্টি।

যদি পঁয়তাল্লিশের এই প্রমিতার সঙ্গে পরমেশের আজ, এই মুহূর্তে, প্রথম দেখা হত তা হলেও পরমেশ ওর চোখে পড়তে চাইত, ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইত।

প্রথমে একটা হোসিয়ারির দোকানে ঢুকল ওরা। পরমেশ ছ'টা স্যান্ডো গেঞ্জি কিনল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে ঝলমলে একটা শাড়ির দোকান। প্রমিতার হাজার বারণ সত্ত্বেও পরমেশ শুনল না। জেদ করে আঠেরোশো টাকা দামের একটা বালুচরী শাড়ি কিনল। সবুজের ওপরে বেগুনি আর হলদে বুটি। পরমেশ জানে সবুজ রং প্রমিতার প্রিয়।

ট্রাম-রাস্তায় গাড়ি, বাস আর মিনিবাস জ্যামে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। গাড়ির হর্নের শব্দ, ইঞ্জিনের গর্জন আর ট্রামের ধাতব ঠং-ঠং ঘণ্টি কানে যেন তালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

শাড়ির দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটতে-হাঁটতে একটা ভ্যারাইটি স্টোর্সে গিয়ে ঢুকল। পরমেশ পছন্দ করে একটা দামি টি-সেট কিনল।

প্রমিতা একবার বলল, 'এত দাম দিয়ে টি-সেট কেনার কী দরকার! একটা তো আছে!'

পরমেশ বলল, 'এর ডিজাইনটা একসেলেন্ট। আই অ্যাম গেম।'

প্রমিতা এমনভাবে দৃষ্টি হানল যার অর্থ হল, তোমার টাকা, তুমি যা প্রাণ চায় করো।

হাতে প্যাকেট ঝুলিয়ে ওরা পায়ে-পায়ে ফড়িয়াপুকুরের মোড়ে চলে এল। তখনই একটা খেলনার দোকান দেখিয়ে বুবু ব্লেড কেনার বায়না করতে লাগল। মাম ওকে আমল না দেওয়ায় ও গজগজ করতে লাগল : 'নিজেদেরটা কেনা হয়ে গেছে তো, তাই এখন আমারটা বাদ....।'

পরমেশ তখন বুবুকে বলল, 'চল, আমরা চাইনিজ খেয়ে বাড়ি ফিরি। তা হলে মামকে আর বাড়ি ফিরে রান্নার ঝামেলা করতে হবে না।'

চাইনিজ ফুড বুবুর খুব পছন্দের। ও পরমেশের হাত ধরে বলল, 'বাপি, চাইনিজও খাব, ব্লেডও কিনব...।'

ওর কথায় পরমেশ রাস্তার মাঝখানেই জোরে হেসে উঠেছে। প্রমিতারও ঠোঁটে হাসি। ও বলল, 'যেমন বাবা, তেমনই ছেলে!'

ঠিক তখনই সুদেব সামন্তকে ওরা দেখতে পেল।

ফড়িয়াপুকুরের রাস্তা ধরে ট্রাম-রাস্তার দিকে হেঁটে আসছে। উদ্ধত, দৃপ্ত ভঙ্গি। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। পোশাক দেখে মনেই হয় না লোকটা ইলেকট্রিক মিস্তিরি।

ওর পরনের শৌখিন জামা-প্যান্টের সেটটা চিনতে পারল প্রমিতা। ব্রিফকেসের ভেতরে পরিপাটি করে ভাঁজ করা ছিল।

শার্টটার জমি ঘিয়ে আর হলুদ রঙে ছোপানো। তার ওপরে সরু কালো রেখায় আঁকা লতা-পাতা। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে ছোট-ছোট লাল ফুল।

প্যান্টের রং গাঢ় সবুজ। চকচকে কাপড়টায় সরু-মোটা স্ট্রাইপ। ওটা থেকে ঠিকরে পড়া আলো কাপড়টায় একটা ধাতব মাত্রা যোগ করেছে।

শীত ঠেকাতে সুদেব কোনও সোয়েটার গায়ে দেয়নি বটে, তবে জামার কলারের পাশ দিয়ে উলিকটের গেঞ্জির গোল গলা উঁকি মারছিল।

প্রমিতা লক্ষ করল, সুদেবকে দেখামাত্রই পরমেশ স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে। বিহ্বলভাবে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে—বিভ্রান্ত হরিণের মতো।

প্রমিতা এবার শান্তভাবে সুদেবকে লক্ষ করতে লাগল।

সুদেব সরাসরি ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। নিষ্পাপ ফরসা মুখ, সুন্দর কোঁকড়ানো চুল। পাতলা ঠোঁটে একচিলতে লক্ষ্মীছেলে হাসি।

ওদের কাছাকাছি এসেই হাতের সিগারেটটা তাড়াতাড়ি ছুড়ে ফেলে দিল সুদেব। সিগারেট খাওয়ার সময় কোনও গুরুজন হঠাৎ চোখে পড়ে গেলে ছোটরা যেমন করে। তারপর লম্বা দুটো পা ফেলে ওদের একেবারে কাছে চলে এল ছেলেটা। সাবলীল ভঙ্গিতে চট করে ঝুঁকে পড়ে পরমেশের পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল। পরমেশ 'থাক-থাক' বা অন্যকিছু বলার কোনও সুযোগই পেল না।

একগাল হেসে সুদেব জিগ্যেস করল, 'দাদা, কেমন আছেন?'

সুদেব জানে, বউদির কাছে পৌঁছতে গেলে দাদাকে আগে লাইন করা দরকার।

ওর কাণ্ড দেখে পরমেশ তো ঢোঁক-টোক গিলে একসা। ওর সেই পুরোনো অপমানের কথা মনে পড়ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকলের সামনে সুদেব ওকে মারধোর করেছিল। নোংরা ভাষায় গালাগাল দিয়েছিল। এ ছাড়া গালে বয়ে বেড়ানো সেই কলঙ্কের দাগ—সুদেবের সিগারেটের ছ্যাঁকায় তৈরি। প্রমিতা সেদিন সঙ্গে না থাকলে কপালে আরও কত হেনস্থা ছিল কে জানে!

pathagar.net

সেই লোকটা এখন নির্লজ্জের মতন ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হেসে জিগ্যেস করছে, 'দাদা, কেমন আছেন?'

পরমেশ কোনওরকমে বলল, 'হ্যাঁ—ভালো...মানে, ভালো আছি। আপনি...মানে, তুমি....ইয়ে আপনি ভালো তো?'

'ওই একরকম।' মাথা চুলকে বলল সুদেব, 'ব্যাবসা হেভি ডাউন চলছে।' তারপরই প্রমিতার দিকে ফিরে : 'বউদি, আপনার সুইচবোর্ডটা আর কোনও গন্ডগোল করেনি তো?'

প্রমিতা ছোট্ট করে হেসে বলল, 'না—ঠিকঠাক চলছে।'

পরমেশ ভুরু কুঁচকে প্রমিতার দিকে তাকাল। প্রমিতা এই লোকটাকে দিয়ে সুইচবোর্ড ঠিক করিয়েছে নাকি? কবে করল? কোন ঘরের সুইচবোর্ড?

প্রমিতা রিতুর ঘরের সুইচবোর্ড সারানোর 'গল্প' পরমেশকে বলেনি। পরে যদি ও কিছু জিগ্যেস করে তখন সামলানো যাবে। এখন তো এই আচমকা দেখা হওয়ার ব্যাপারটাকে কাজে লাগানো যাক।

সুদেবকে ও বলল, 'আপনাকে আর-একবার আমাদের বাড়িতে আসতে হবে। আমাদের বাড়ির ওয়্যারিংগুলো সব পালটাতে হবে। কবে একটু সময় করে...।'

'সময় করার কী আছে, বউদি? এ তো আমার কাজ। এই মন্দা বাজারে যদি আপনাদের বাড়ির এই কাজটা পাই তা হলে তো আমারই উপকার হয়...।'

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সুরে সুদেব সামন্ত কথাগুলো বলল।

প্রমিতা দেখল, সুচরিতা যেন কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে সুদেবের পাশে। প্রমিতার কথা শুনে ও খিলখিল করে হেসে হাততালি দিয়ে বলছে, 'গ্র্যান্ড, মাম, গ্র্যান্ড! দারুণ খেলেছ!'

পরমেশ একটু অবাক হয়ে প্রমিতার দিকে তাকাল। আমতা-আমতা করে বলল, 'আমাদের ওয়্যারিংগুলো তো...মানে, সেরকম কিছু তো...মনে হয়, আরও বছর কয়েক চলত। মানে....।'

'তুমি চুপ করো তো!' পরমেশকে থামিয়ে দিল প্রমিতা : 'তুমি ইলেকট্রিক্যালের লোক—তোমার কাছে সব ঠিক আছে। আমার তো অত বিদ্যে নেই! এই তো দিনপনেরো আগে রান্নাঘরের বাইরে একটা চৌকো ইলেকট্রিক বক্সে একবার ফ্ল্যাশ হয়েছিল। তুমি তখন কলেজে। কিছু একটা হয়ে গেলে তো মরতাম আমি! বলুন?' শেষ প্রশ্নটা প্রমিতা করেছে সুদেবকে। সঙ্গে একচামচ মিষ্টি হাসিও জুড়ে দিয়েছে।

সুদেব প্রমিতাকে সমর্থন করে বলল, 'ঠিকই বলেছেন, বউদি। এই তো লাস্ট উইকে আমাদের পাড়ার...।'

সুদেব ওর কাহিনি বলে চলল, আর প্রমিতা সম্মোহিতের মতো ওর দিকে তাকিয়ে সেই বিরক্তিকর গল্প শুনে চলল।

বুবু বারবার প্রমিতার হাত ধরে টানছিল আর ঘ্যানঘ্যান করছিল। মাঝে-মাঝে নাকিসুরে 'বেব্রেড...বেব্রেড' বলছিল।

প্রমিতার মনোযোগের সবটুকুই এমনভাবে সুদেবের দিকে তাক করা ছিল যে, সুদেব সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল।

সুদেবের গল্প শেষ হলে প্রমিতা জিগ্যেস করল, 'তা হলে কবে আসছেন বলুন?'

'আমি ফোন করে যাব'খন...।'

'একমিনিট—' প্রমিতা সুদেবকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমাদের ল্যান্ডলাইনটায় মাঝে-মাঝে ফল্‌স রিং হয়। আপনি বরং আমার মোবাইল নম্বরটা রেখে দিন...।'

পকেট থেকে রিতুর মোবাইল ফোনটা বের করল সুদেব : 'বলুন, বউদি। সেটাই ভালো।'

প্রমিতা ওর মোবাইল নম্বর বলল। সুদেব 'পিপ-পিপ' করে বোতাম টিপে সেটা ঢুকিয়ে নিল রিতুর ফোনের মেমোরিতে।

চোখের সামনে রিতুর ফোনটা দেখেও প্রমিতার আর কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। কারণ, ওর লক্ষ্য স্থির, মনও স্থির। ও দেখল, সুচরিতা তখনও হাসিমুখে ওকে চিয়ার করে যাচ্ছে। হাতের বিশেষ মুদ্রা দেখিয়ে বলছে, 'ওঃ, মাম, ফ্যান্টাস্টিক!'

কথা শেষ করে সুদেব বলল, 'আসি, বউদি। দাদা, আজ আসি—পরে দেখা হবে।'

ও হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম-রাস্তার দিকে এগোল। প্রমিতারা এগোল খেলনার দোকানের দিকে। প্রমিতা ছেলের হাতটা পরমেশের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর পরমেশের অজান্তে সুদেবের চলে যাওয়ার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ওই তো সুদেব! লোকজনের ভিড়ে দাঁড়িয়ে প্রমিতাদের দিকেই দেখছে। প্রমিতাকে দেখছে।

প্রমিতা হাসল। সুদেবও। লতিকামাসির ছবিটা ঝট করে ওর চোখের সামনে ঝিলিক মেরে গেল।

প্রথমে মোবাইল নম্বর। তারপর স্বামীকে আড়াল করে এই তাকানো আর হাসি। অভিনয় কখনও এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। নির্ঘাত কোনও একটা রংমেলান্তি ওর আর বউদির মধ্যে কাজ করে গেছে। সুদেব ভাবল।

এর আগে বহু মেয়ে ওর জন্য মজেছে। ওর জন্য মরেছেও। কিন্তু এই কি প্রথম অন্যরকম কোনও টান টের পাচ্ছে সুদেব? একজন মাঝবয়েসি রূপসীর জন্য টান! তবে এটা ঠিক যে, চল্লিশ পেরোনো মহিলাদের মধ্যে কেমন যেন একটা পোড় খাওয়া চটক আছে। সেইসঙ্গে একটা মোলায়েম মাতা তাপ। ওঃ! সুদেবের শরীরটা কিলবিল করে নড়ে উঠল। কালই ও বউদিকে ফোন করবে। বউদির পুরোনো ওয়্যারিং ঘেঁটে দেখবে স্পার্ক হয় কি না। যদি হয় তা হলে তার মোক্ষম

pathagar.net

দাওয়াই ওর কাছেই আছে। নিজের তাতালটা টের পেল সুদেব।

পরমেশ আবার আড়চোখে প্রমিতাকে লক্ষ করছিল। এ যেন নতুন আর-একজন প্রমিতা। একটা অদ্ভুত দীপ্তি প্রমিতার চোখ-মুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছিল। একইসঙ্গে একটা নতুন আত্মবিশ্বাস ছাপ ফেলেছে ওর মুখে। মনে হচ্ছিল, দীর্ঘ ইনিংস খেলার জন্য তৈরি হয়ে কোনও ব্যাটসম্যান সবে দাঁতে দাঁত চেপে খেলতে শুরু করেছে।

পরমেশের হঠাৎই যেন মনে হল, ওর আড়ালে কোনও একটা খেলা চলছে। মা আর মেয়েতে মিলে খেলছে। আর পরমেশ দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সেই খেলা দেখছে।

না, শুধু মা আর মেয়ে নয়।

সেই খেলাতে ওরা সুদেব সামন্তকেও জড়িয়ে নিয়েছে।

পরমেশ ভেতরে-ভেতরে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। রিতু চলে গেছে। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েকমাস পরমেশের ভয় ছিল প্রমিতা ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা না করে বসে। পরে বুঝেছে, প্রমিতা মোটেই সুইসাইড করবে না। মরা মেয়েটা ওকে দিন-রাত জ্বালিয়ে মারছে। বলছে, 'মাম, কিছু একটা করো...।' তাই, মেয়ের কথা শুনে, প্রমিতা কিছু একটা করতে চাইছে। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। আগুন নিয়ে খেলছে।

এই খেলা খেলতে-খেলতে প্রমিতা মাথা ঠিক রাখতে পারবে তো? নাকি মানসিক চাপ আর টেনশানে শেষ পর্যন্ত ওর মনটা গুলিয়ে যাবে! ও পাগল হয়ে যাবে!

পরমেশ আর ভাবতে পারছিল না। প্রমিতার কিছু একটা হয়ে গেলে ও আর বুবু কী নিয়ে থাকবে?

সুদেব সামন্ত কি এইভাবে ওদের গোটা পরিবারটাকে তছনছ করে দেবে?

শান্ত এবং অক্ষম পরমেশের বুকের ভেতরে হঠাৎই রাগ উথলে উঠল।

বাইশ

রাজতনু চ্যাটার্জি কিন্তু হাল ছাড়েনি। শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে মেয়েটা মারা যাওয়ার পর ও আরও দুশ্চিন্তায় পড়েছে। ওর এলাকায় সিরিয়াল কিলারের সেকেন্ড এপিসোড।

প্রথম এপিসোড নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল রাজতনু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই 'বেনিফিট অফ ডাউট'-ই ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সুদেব সামন্ত ছাড়া পেয়ে গেল। সুচরিতা দত্তগুপ্তর রেপ অ্যান্ড মার্ডারের জন্য ওকে আর ট্রায়ালে দাঁড় করানো যাবে না।

কিন্তু শুক্লা মেয়েটার বেলায়?

ডেডবডি দেখেই রাজতনু আঁচ করেছিল, মেয়েটাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। মেয়েটার ঠোঁটে নীলচে ভাব ছিল, নখের রং বদলে গিয়েছিল, আর ঠোঁটের কোণ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল রক্ত। তা ছাড়া ইস্তিরি দিয়ে মাথাতেও আঘাত করা হয়েছে। কারণ, ইস্তিরির কিনারায় রক্তের দাগ পাওয়া গেছে—আর মাথার পিছনে ক্ষত।

ফরেনসিক এক্সপার্টদের পরামর্শ অনুযায়ী ডেডবডির পোস্ট মর্টেম হওয়ার আগে এক্স-রে করা হয়েছিল। তাতেই জানা গেছে, খুনির আঙুলের হিংস্র চাপে হাইঅয়েড বোন ভেঙে গেছে, ফাটল ধরেছে থাইরয়েড কার্টিলেজেও। অ্যাসফিক্সিয়ায় মারা গেছে শুক্লা।

কিন্তু খুনি ঘরে ঢুকল কী করে?

যদি খুনি শুক্লার চেনা কেউ হয় তা হলে অন্য কথা। কিন্তু অচেনা কেউ যদি হয় তা হলে শুক্লা পট করে দরজা খুলতে যাবে কেন?

তদন্ত করে রাজতনু জেনেছে, শুক্লার কোনও এক্সট্রাম্যারিটাল লাভ অ্যাফেয়ার ছিল না। মেয়েটা সুদীপ্ত বলতে অজ্ঞান ছিল। ওদের দুই প্রতিবেশী বলরাম শাসমল আর পশুপতি চন্দ্র শুক্লাকে বারবার এই সার্টিফিকেট দিয়েছে। তবে শুক্লা একটু টকেটিভ মেয়ে ছিল—লোকজনের সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসত।

রাজতনু বহুবার ভেবে দেখেছে, শুধুমাত্র আড্ডাবাজ হলেই কেউ উটকো লোককে দরজা খুলে দেয় না। তা ছাড়া খোঁজ করে ও জেনেছে, শুক্লা দরজা খোলার ব্যাপারে বেশ সাবধান ছিল।

ফ্ল্যাটবাড়ি বলে এ-বাড়িটায় সেল্‌সম্যান আর সেল্‌সগার্লদের উৎপাত বড় বেশি ছিল। তাদের সম্পর্কে শুক্লা যখন কথা বলত তখন ওর কণ্ঠস্বরে মোটেই সহানুভূতি থাকত না। বরং থাকত রাগ আর বিরক্তি। সেল্‌সম্যানদের ব্যাপার নিয়ে অনেকবার ও ফ্ল্যাট কমিটির কাছে কমপ্লেনও করেছে।

ভাবতে-ভাবতে রাজতনুর মাথা ধরে গেছে, কিন্তু তবুও এই জটিল প্রশ্নটার

pathagar.net

উত্তর বের করতে পারেনি।

বাকি গল্পটা রাজতনু মোটামুটি আন্দাজ করেছে।

খুনি ঘরে ঢোকার পর শুক্লাকে নিশ্চয়ই ছুরি বা রিভলভার দেখিয়ে কাবু করেছে। কারণ, শুক্লার মতো শক্ত-সমর্থ যুবতী মেয়ের একজন রেপিস্টকে যতটা স্ট্রংলি রেজিস্ট করার কথা ততটা স্ট্রংলি রেজিস্ট করা হয়নি। অন্তত মেডিকেল এক্সপার্টদের তাই মত। তা থেকেই রাজতনুর মনে হয়েছে, কোনও অস্ত্র দিয়ে শুক্লাকে ভয় দেখানো হয়েছে। ভয় পেয়ে মেয়েটা লড়াইয়ের মাত্রা কমিয়ে দিয়েছে। অথবা, রেপের আগেই ইস্তিরি দিয়ে আঘাত করে মেয়েটাকে কাবু করেছে খুনি।

আরও একটা ব্যাপার রাজতনুকে অবাক করেছে : শুক্লা কোনও চিৎকার-চেঁচামেচি করেনি কেন?

তার একটা কারণ হয়তো ভয়। আর দ্বিতীয় একটা কারণ হতে পারে, খুনি শুক্লার মুখে রুমাল কিংবা কোনও কাপড়ের দলা ঠেসে দিয়েছিল। তারপর বেগতিক দেখে ইস্তিরিটা ব্যবহার করেছে।

ঘটনাটা ঘটেছে বলতে গেলে ভর সন্ধেবেলা। আশপাশের ফ্ল্যাটে তখন ভালোই লোকজন ছিল। কিন্তু কেউই শুক্লার কোনও ডাকাডাকি বা চিৎকার শুনতে পায়নি।

রাজতনু বারবার লোহার দেওয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছিল। কোনও পথের হদিশ পাচ্ছিল না। শুধু একটা সূত্র ওকে পাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল : খুনি ইলেকট্রিক ইস্তিরি সারাতে পারে। ইস্তিরি। মিস্তিরি। ইস্তিরি। মিস্তিরি....।

শুক্লাকে যে খুন করেছে সে যে বেশ কিছুদিন ধরে শুক্লাদের ফ্ল্যাটবাড়ির ওপরে নজর রাখছিল সেটা রাজতনু বুঝতে পেরেছে। এভাবে নজর রাখা ছাড়া কোনও খুনির পক্ষে সবার চোখের আড়ালে বাড়িতে ঢুকে তিনতলায় উঠে নিখুঁতভাবে কাজ সেরে আবার সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং, সুদেব সামন্ত যদি খুনি হয় তা হলে সে নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন এই এলাকায় নজরদারির কাজ করেছে।

শুধুমাত্র এই একটা সূত্রই রাজতনুকে সুদেবের ফটো নিয়ে পথে নামল।

সাদা পোশাকের পুলিশ সুদেব সামন্তর ছবি নিয়ে শুক্লাদের বাড়ির এলাকায় খোঁজখবর করতে নেমে পড়ল। বিশেষ করে চায়ের দোকানে আর ফুটপাতের হকারদের কাছে সুদেবের ফটো দেখিয়ে ওরা জানতে চাইল, এই লোকটাকে কেউ দেখেছে কি না।

আশ্চর্য! এইভাবে সুদেবের ছবি দেখিয়ে কাজ হল। একটা চায়ের দোকান আর তার কাছাকাছি একটা তেলেভাজার দোকান থেকে জানা গেল, সুদেব সামন্তকে দোকানের মালিক আর হেল্পাররা দেখেছে। ব্যাপারটা মাস কয়েকের পুরোনো হলেও ওরা মনে করতে পেরেছে।

যে-চায়ের দোকান আর তেলেভাজার দোকান থেকে রাজতনুর অনুমানের প্রমাণ পাওয়া গেল, সে-দুটো দোকানই শুক্লাদের বাড়ির ঠিক উলটোদিকে—তবে পনেরো কি বিশ গজ তফাতে।

রাজতনু আর দেরি করেনি। সুদেবের এককপি ফটো নিয়ে সাদা পোশাকে নিজেই পথে নেমে পড়েছে।

চায়ের দোকান আর তেলেভাজার দোকানটায় খোঁজ করে ও জানতে পারল সুদেব চায়ের দোকানেই সময় কাটাত বেশি। তাই সন্ধের পর একবার করে সেই চায়ের দোকানটায় টুঁ মারাটা রোজকার রুটিনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল রাজতনু। দোকানদারকে গোপনে নিজের পরিচয় দেওয়ামাত্র লোকটা কেমন কাঠ-কাঠ হয়ে গেল! অকারণেই ওর রোগা কালো চেহারাটা সিঁটিয়ে গেল। গোল-গোল চোখ দুটো আরও বড় ছানাবড়া গোছের হয়ে গেল। কিন্তু রাজতনু পুরো ব্যাপারটা সামলে নিল অদ্ভুতভাবে।

পুলিশ ফুটপাতের দোকান থেকে পয়সা দিয়ে কিনে চা-বিস্কুট খায় লোকটা লাইফে এই প্রথম দেখল। শুধু তা-ই নয়, অকারণে ওকে দু-পাঁচ টাকা বকশিশও দিতে লাগল রাজতনু। দিনের পর দিন নানান গল্প করে ওকে সহজ-স্বাভাবিক করে তুলল।

সুচরিতার কেসটায় সুদেবের কাছে হেরে নাস্তানাবুদ হওয়ার অপমান রাজতনু ভুলতে পারেনি। মাঝে-মাঝেই সেই স্মৃতি ওর মনে জ্বালা ধরায়। মেয়েটার মা আর বাবার সেই সময়ের অসহায় করুণ অবস্থাটা ওর বেশ মনে পড়ে।

সেইসব অপমান আর অক্ষমতার দিনগুলো ভোলা সহজ নয়। তার ওপর কোর্টে সুদেব সামন্ত যখন আউটরাইট অ্যাকুইটাল পেয়ে গেল তখন রাজতনুর গালে কেউ যেন সপাটে একটা থাপ্পড় মেরেছিল। সেই জ্বালা-ধরা গাল নিয়ে ও বুঝতে পেরেছিল, একটা সিরিয়াল কিলার ছাড়া পেয়ে গেল।

তার পর থেকেই দ্বিতীয় খুনের অপেক্ষায় ছিল রাজতনু।

সন্দেহ নেই দ্বিতীয় খুনটার ক্রিমিনালিস্টিক ক্যারেকটারিস্টিক্স প্রথম খুনটার মতোই। ফাঁকা ফ্ল্যাট, একা মেয়ে, ব্রুট ফোর্স অথবা আর্ম্স ব্যবহার করে মেয়েটাকে কাবু করা, তারপর রেপ অ্যান্ড মার্ডার। নাকি মার্ডার অ্যান্ড রেপ? শুক্লার বেলায় পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট নিশ্চিতভাবে এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারেনি।

এখন রাজতনুর সামনে একমাত্র আশার আলো চায়ের দোকানদার।

কয়েকদিনের চেষ্টাতেই দোকানদার রাজতনুর কাছে সহজ হয়ে গেল। বলল, সুদেব মাঝে-মাঝে সাইকেল নিয়ে আসত। তবে বেশিরভাগ সময়েই আসত পায়দল। এক-একদিন প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কাটাত দোকানে। চা-বিস্কুট আর টোস্ট কি ডিমভাজা খেত। দোকানদারের নাম মানিক—তাকে দু-একদিনের মধ্যেই দিব্যি

pathagar.net

'মানিকদা' পাতিয়ে নিয়েছিল ও।

সুদেব কখনও-কখনও বলত, এই এলাকায় ও একটা ইলেকট্রিকের দোকান খুলবে।

তাতে মানিক জিগ্যেস করেছে, 'হঠাৎ ইলেকট্রিকের দোকান কেন?'

তখনও হেসে ও বলেছে, 'ওটাই আমার লাইন, মানিকদা। ইলেকট্রিকের কাজ-টাজ পেলে দিয়ো...।'

এমনিতে ছেলেটা খুব মিষ্টি স্বভাবের ছিল। হেসে-হেসে কথা বলত।

সুদেব যে সত্যি-সত্যি ইলেকট্রিক মিস্তিরি, মানিক হাতেনাতে তার প্রমাণও পেয়েছিল।

একদিন সন্ধেবেলা আকাশের থমথমে মেঘ ফুটো করে হঠাৎই বৃষ্টি নেমেছিল। সুদেব তখন ভাঁড়ের চায়ে শব্দ করে চুমুক দিচ্ছে।

আচমকা মানিকের পলিথিনের চাল দিয়ে জল ঢুকে দোকানের দুটো আলোই শর্ট হয়ে ফস করে নিভে গিয়েছিল। তো পলকে সব অন্ধকার।

সেদিন মানিক সুদেবের কেরামতি দেখেছিল। দশ কি পনেরো মিনিটের মধ্যে পটাপট সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়েছিল সুদেব। না, মানিকের থেকে একটা পয়সাও নেয়নি। তখন মানিক জোর করে ওকে বিনিপয়সায় একভাঁড় চা আর একটা বিস্কুট খাইয়েছিল।

রোজই গল্প করার সময় রাজতনু মানিককে জিগ্যেস করে, সুদেবকে নিয়ে স্পেশাল কোনও ঘটনা ওর মনে পড়ে কি না।

উত্তরে মানিক শুধু মাথা নাড়ে : না, সেরকম কিছু ওর মনে নেই।

সুদেবের সঙ্গে কি কোনও যন্ত্রপাতি বা আর্ম্স দেখেছে কখনও?

অনেক সময় একটা নাইলনের থলে ওর সঙ্গে থাকত। বলত, ওতে নাকি ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি আছে। তবে একটা ছোট ছুরি ওর পকেটে থাকত। একদিন সামনের কচিদার পানের দোকান থেকে একটা থাম্স আপের বোতল নিয়ে মানিকের দোকানে বসেই পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করেছিল সুদেব। ওটা দিয়ে চাড় দিয়ে বোতলের ছিপিটা খুলে হেসে বলেছিল, 'এই ছুরিটা অল টাইম আমার পকেটে থাকে। এটা দিয়ে বহুত রকম কাজ করা যায়....দেখলে তো!'

ছুরি!

এই ছুরিটা কাজে লাগিয়ে শুক্লাদের ফ্ল্যাটে ঢোকেনি তো সুদেব?

কী করে সুদেব সামন্ত শুক্লাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকল সেটা ভেবে-ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছিল রাজতনু। দরজার বেল বাজালেই কেউ নিশ্চয়ই হাট করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেয় না। লোকটাকে একবার অন্তত মেপে দেখবে, উদ্দেশ্য আঁচ করবে, মনে-মনে বিচার করবে দরজা খুলবে কি খুলবে না।

নাঃ, লোকটার ক্যালি আছে।

শত চেষ্টা করেও রাজতনু এই ফ্ল্যাটে ঢোকার রহস্যের কোনও কূলকিনারা করতে পারছে না। ব্যাপারটা অনেকটা যেন 'ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা'-র মতো।

মনে-মনে যতই মাথার চুল ছিঁড়ুক, যতই লোহার দেওয়ালে ঠোক্কর খাক, রাজতনু চ্যাটার্জি কিন্তু হাল ছাড়েনি।

চায়ের দোকানের মালিককে ও ট্যাক্সিতে করে চারদিন নিয়ে গেছে সুদেবের পাড়ায়—যদি সুদেবের দেখা পাওয়া যায়।

না, পাওয়া যায়নি।

পাওয়া গেল পাঁচদিনের দিন। মানিক ইলেকট্রিক-শক-খাওয়া মানুষের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল। রাস্তায় হেঁটে যাওয়া সুদেবের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এই লোকটা, স্যার—এই ছেলেটাই যেত আমার দোকানে....।'

রাজতনুর চোয়াল শক্ত হল। শনাক্তকরণের কাজ শেষ। তবে এটা যে নিতান্তই হালকা ওজনের সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স তা রাজতনু জানে। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যাবে কীভাবে? অকাট্য প্রমাণ? যাতে শুক্লার মার্ডার কেসে জজসাহেব সুদেব সামন্তকে 'বেকসুর খালাস' বলতে না পারেন!

রাজতনু ভেতরে-ভেতরে খেপে উঠল। যদি ও একটা—অন্তত একটা—সুযোগ পায় তা হলে সুদেবকে দেখে নেবে। ওর ঠোঁটের ওই তাচ্ছিল্যের হাসি পুলিশি ক্ষমতায় চিরে ফালা-ফালা করে দেবে। তার জন্য আইনকে বাঁকিয়েচুরিয়ে নিতে দ্বিধা করবে না। আগে শোধবোধ, পরে আইন।

মোদ্দা কথা হল, খতম, খতম, খতম!

পরমেশ প্যাড আর পেন নিয়ে অঙ্কের মধ্যে ডুবে ছিল। বিদেশের একটা জার্নালে মাসছয়েক আগে একটা রিসার্চ পেপার পাঠিয়েছিল। সেটা রিভিউয়ারদের নানান কমেন্ট্স নিয়ে ফেরত এসেছে। ই-মেইল থেকে সেই কমেন্ট্সগুলো প্রিন্ট করে নিয়েছে পরমেশ। তারপর মন্তব্যের প্রতিটি পয়েন্ট ধরে উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করছে। সেটা করতে গিয়েই কিছু বাড়তি অঙ্ক করতে হচ্ছে। যদি ও হিসেবমতো পেপারটা রিভাইজ করে উঠতে পারে তা হলে হয়তো জার্নালের সম্পাদক পেপারটা অ্যাকসেপ্ট করলেও করতে পারেন। পেপারটা ওই জার্নালে যদি ছাপা হয় তা হলে পরমেশের খুব ভালো লাগবে।

সুচরিতা চলে যাওয়ার পর থেকে এই ভালো লাগাটাকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে পরমেশ। শুরুতে ওর মনে সুদেব সামন্তর জন্য যে-হিংসা আর আক্রোশ

pathagar.net

তৈরি হয়েছিল এখন সেটা স্তিমিত হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেছে। তার বদলে পরমেশ এখন এক আতঙ্কে ভুগছে—প্রমিতাকে নিয়ে।

সুদেবের সঙ্গে প্রমিতার ভালোমানুষি পরমেশের কাছে ভীষণ বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। কিন্তু ও দু-একবার প্রমিতার কাছে নিজের অপছন্দের কথা জানানোর বেশি আর কিছু করেনি। ওর কেমন যেন ক্লান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই ব্যাপারটা থেকে মনটাকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত ওর ভেতরকার অস্থির ভাবটা কাটবে না। রিতুর কষ্ট ওর বুকের মধ্যে আছে ঠিকই, কিন্তু এখনকার ঘটনা, কিংবা তার ইশারা, ওর বুকের মধ্যে সবসময় কাঁটার মতো বিঁধছে।

হঠাৎই ওর ঘরের দরজা খুলে ঢুকলেন ড. অতীন্দ্র বসু। পরমেশের 'অতীনদা'। ওর চেয়ে অতীনদা ছ'বছরের সিনিয়ার। কানের দুপাশে পাকা জুলপি, মাথার মাঝখানটায় টাক। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। চোখ-মুখ ধারালো। চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। ছ'মাসের জন্য টিচিং অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলেন—মাসখানেক হল ফিরেছেন।

'অ্যাই, পরমেশ—তিনটের সময় বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিং। খেয়াল আছে তো?'

পরমেশ মুখ তুলে তাকিয়েছিল, কিন্তু ওর কোনও মিটিং-এর কথা মনে পড়ছিল না, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর মনে পড়তেই ও যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ...মনে পড়েছে। তিনটেয়, না?'

'হ্যাঁ—খেয়াল করে এসো। নইলে কোরাম হবে না—তখন ঝামেলা হবে।'

'হ্যাঁ....যাব....।' কবজি উলটে ঘড়ি দেখল পরমেশ : 'ভাগ্যিস আপনি খেয়াল করিয়ে দিলেন....।'

অতীন্দ্র বললেন, 'ফিরে আসার পর থেকে দেখছি তুমি কেমন বদলে গেছ। আগে তুমি এত আনমাইন্ডফুল ছিলে না। স্টুডেন্টরা যদি তোমাকে এখন ''অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর'' বলে আড়ালে ঠাট্টা করে তা হলে তোমার তরফে কিছু বলার নেই—।' হাসলেন ড. বোস।

পরমেশ বিব্রতভাবে হাসল, বলল, 'বসুন না, অতীনদা—অরুণকে চা দিতে বলছি...।'

'না, না। তাড়া আছে। ঘরে ভিজিটর বসে আছে। তুমি মনে করে তিনটের সময় এসো কিন্তু—।' বলে অতীন্দ্র বোস চলে গেলেন।

পরমেশ আবার ঘড়ি দেখল। একটা পঁয়তাল্লিশ। মিটিং-এর দেরি আছে। অতীনদার কথাটা পরমেশের কানে বাজল : '....তুমি কেমন বদলে গেছ।'

সত্যি। অনেক কিছুই পরমেশ আজকাল মনে রাখতে পারে না। ওর বিপর্যস্ত

মনটা কেমন অবসন্ন আর কাবু হয়ে পড়েছে। ওর চারপাশটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার। ক্রমশ সে-অন্ধকার যেন গাঢ় হচ্ছে।

পরমেশ আবার অঙ্কে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎই ওর সুইংডোর খুলে গেল। কেউ জিগ্যেস করল, 'মে আই কাম ইন, স্যার?'

গলা চিনতে পারল। অঙ্ক থেকে মুখ তুলল।

ত্রিযামা।

ত্রিযামা মানে রাত্রি। কিন্তু ওর মধ্যে অদ্ভুত এক দিনের আলো দেখতে পেল পরমেশ। হেসে বলল, 'এসো, এসো—।'

মেয়েটাকে দেখছিল পরমেশ। এমনভাবে দেখছিল যেন কারও বাইরেটা দেখে ভেতরটা প্রাণপণে আঁচ করতে চাইছে। ওর পারফিউমের গন্ধ পেল। গন্ধটা যেন দুষ্টু বালিকার মতো লুকোচুরি খেলছে। এই আছে তো এই নেই।

ত্রিযামার গায়ে হলুদের ওপরে কালো ছোপ-ছোপ একটা টপ। হাতাটা থ্রি কোয়ার্টার। তার ওপরে কালো রঙের খাটো সোয়েটার। পায়ে গাঢ় খয়েরি জিন্‌স। গলায় সরু চেন। কান থেকে ঝুলছে একইরকম দুটো চেনের টুকরো। একহাতে ধরা বাদামি রঙের একটা ব্যাগ, আর অন্য হাতে মোবাইল ফোন।

ত্রিযামা তাকিয়ে ছিল পরমেশের দিকে। ওর গভীর চোখে কেমন যেন বিষাদের ছোঁয়া টের পেল পরমেশ। ওর মুখে সবসময়ের হালকা খুশির ভাবটা নেই।

'আপনি কি এখন বিজি আছেন, স্যার?'

ত্রিযামার প্রশ্নের ঢংটা পরমেশের কানে বাজল। অল্প-চেনা মানুষ যেভাবে প্রশ্ন করে অনেকটা সেইরকম।

পরমেশ সহজ ভঙ্গিতেই বলল, 'না, বিজি নেই। এসো—বোসো।'

ত্রিযামা দরজার কাছ থেকে ঘরের ভেতরে এগিয়ে এল। একটা চেয়ার টেনে বসল। হাতের ব্যাগটা টেবিলে আলতো করে নামিয়ে রাখল।

ও পরমেশের দিকে না তাকিয়ে নানান দিকে চোখ ফেরাচ্ছিল। হঠাৎই পরমেশের সামনে রাখা পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি পড়াশোনা করছিলেন? আমি তা হলে যাই...।' ত্রিযামা উঠে দাঁড়াল।

পরমেশ একটা গোলমালের আঁচ পাচ্ছিল। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। নইলে ত্রিযামা কখনও এরকম অদ্ভুত আচরণ করে না।

'আরে, উঠছ কেন, বোসো। যা করছিলাম তা পরে করলেও চলবে।' একটু থামল পরমেশ। তারপর নিচু গলায় বলল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো? সামথিং ইজ বাইটিং য়ু—।'

ত্রিযামা ধপ করে বসে পড়ল। তারপর পরমেশকে অবাক করে দিয়ে টেবিলে রাখা ব্যাগটার ওপরে মাথা ডুবিয়ে দিল।

pathagar.net

পরমেশ বিব্রত হয়ে পড়ল। এ সময়ে কেউ যদি হঠাৎ করে ঘরে ঢুকে পড়ে তা হলে কী মনে করবে? মেয়ের সামনে ছাত্রী টেবিলে মাথা রেখে বসে আছে!

'কী হল, ত্রিযামা?' মিচু গলায় কথা বলল পরমেশ, 'সোজা হয়ে বোসো। ইজ সামথিং রং?'

ত্রিযামা সোজা হয়ে বসল। মোবাইল ধরা হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, 'আমার প্রবলেম বলে আপনাকে এমব্যারাস করতে খারাপ লাগছে...।'

'তা কেন? বলো, কী প্রবলেম?'

'আমার আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না—।'

'কেন?'

'ইট হ্যাজ বিকাম হেল।'

পরমেশ চুপ করে রইল। ত্রিযামা এর আগে কখনও বাড়ির কথা সেরকমভাবে বলেনি। পরমেশ শুধু জানে ওর বাবা বিজনেসম্যান, আর মা ইনটিরিয়ার ডিজাইনিং-এর কাজ করেন। তাই পরমেশ ঠিক বুঝতে পারছিল না ওর এখন কী বলা উচিত। ও দেখল, ত্রিযামা টেবিলে হাতের ভর রেখে চোখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে ওর বাদামি ব্যাগের দিকে।

একটু পরে মেয়েটা মুখ খুলল। বিড়বিড় করে যেন আপনমনেই বলল, 'পাপা আর মা রোজ বাড়িতে যা শুরু করেছে! ডিসগাস্টিং। কী করে যে ওরা ঝগড়া করার এত ইস্যু খুঁজে পায়!' একটু চুপ করে থেকে হঠাৎই পরমেশের দিকে চোখ তুলে তাকাল ত্রিযামা : 'আমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না, স্যার....বাড়িটা একেবারে জঘন্য হয়ে গেছে।'

পরমেশ কোনও কথা না বলে সহানুভূতির মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আর কয়েক মাস পরেই তো তোমার ফাইনাল এক্‌জ্যাম হয়ে যাবে। তারপর চাকরিতে জয়েন করে গেলেই আর প্রবলেম হবে না...।'

পরমেশ জানে ত্রিযামা হায়দ্রাবাদের একটা সফ্‌টওয়্যার ডিজাইন কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট হাতে নিয়েই ও সেখানে চলে যাবে জয়েন করতে।

ত্রিযামা বলল, 'কিন্তু আমার যে এম. টেক. করার ইচ্ছে—।'

এটা নতুন তথ্য। পরমেশ এ-কথা জানত না। অবশ্য ত্রিযামার এই সিদ্ধান্তটাও নতুন। হঠাৎই ওর মনে হয়েছে এম. টেক. পড়ার জন্য সায়েন্স কলেজে আরও দুটো বছর থাকলে কেমন হয়। এ ছাড়া প্রমিতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ও আর পল্লব যে-কাজে নেমেছে সেটারও একটা শেষ দেখতে ইচ্ছে করছে।

ওর অসুবিধে শুধু একটাই : বাড়িতে পাপা আর মায়ের রোজকার বিশ্রী ঝগড়া।

ত্রিযামা পরমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে কী এক মায়ার খোঁজ পেল। পরমেশও বিষণ্ণ মেয়েটাকে দেখে কষ্ট পেল। ত্রিযামা কষ্ট পাচ্ছে জানলে ওর ভালো লাগে না।

পরমেশ বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব?'

'বলুন—।'

'তুমি এম. টেক. পড়লে আমার খুব ভালো লাগবে—।'

'জানি।'

এ-কথায় পরমেশ একটু হকচকিয়ে গেল। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁক নিয়ে বলল, 'না, মানে, তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট করাতে পারব। একটা ভালো আইডিয়া আছে আমার কাছে—।'

ত্রিযামা কোনও কথা বলল না। ওর সবচেয়ে প্রিয় স্যারকে আচ্ছন্নের মতো দেখতে লাগল।

'...তা ছাড়া বাড়ির প্রবলেমটার ব্যাপারে একটা সাজেশান তোমাকে দিতে পারি...।'

ত্রিযামা তবুও চুপ। স্যারকে দেখছে।

পরমেশ ওর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। মাথা সামান্য নিচু করে বলতে লাগল, 'তোমার নিজের বাড়িটাকে তুমি অন্য কারও বাড়ি বলে ভাবো—তুমি যেন সেখানে পেয়িং গেস্ট হয়ে আছ। আর তোমার পাপা আর মায়ের রোজকার ব্যাপারটাকে পৃথিবীর নানান নয়েজ বলে ভাবো....অনেকটা গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজের মতন। জানি, কাজটা খুবই কঠিন, কিন্তু একবারটি চেষ্টা করে দেখতে পারো—।'

এবার মাথা নাড়ল ত্রিযামা। নাকের ডগাটা আলতো করে চুলকে নিল একবার। তারপর ঘোর লাগা চোখে পরমেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চেষ্টা করব, স্যার। তবে পারব কিনা জানি না। আপনি কি এটা ভাবতে পারেন যে, আপনার কোনও মেয়ে ছিল না?'

পরমেশ ইলেকট্রিক শক খেল। ঠোঁট কামড়ে চোখ নামাল।

রিতু! রিতু!

'স্যার, প্রবলেমটা কোথায় জানেন? সব সত্যিকে স্বপ্ন বলে ভাবাটা সহজ নয়। আবার সব স্বপ্নকে সত্যি বলে ভাবাটাও বড্ড ডিফিকাল্ট। আমি এখন থেকে দুরকম প্রবলেম নিয়েই থাকব।'

সঙ্গে-সঙ্গে পরমেশের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। বোতাম টিপে কানে ফোন চেপে ধরল।

প্রমিতা।

pathagar.net

'বলো, কী ব্যাপার?'

'মনে আছে তো, আজ পাপুনের জন্মদিন। আমি গিফ্‌ট কিনে এনেছি।'

পরমেশের সত্যিই মনে ছিল না। এখন মনে পড়ল। পাপুন ওর ভাই কমলেশের ছেলে। আজ ৬ বছর শেষ করে সাতে পা দেবে। পরমেশদের সবার নেমন্তন্ন।

জন্মদিন! ওঃ, এরকমই কারও একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠান—মানে, জন্মদিনের উৎসব—আর-একজনের শোকসভা হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যই জন্মদিন পরমেশ সহ্য করতে পারে না।

'আচ্ছা, আমাকে কি যেতেই হবে? তুমি বুবুকে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে যাও না—।'

ওপাশ থেকে প্রমিতা বলল, 'আমার শরীরটা সকাল থেকে একদম ভালো লাগছে না। মাথা ঘুরছে, জ্বর-জ্বর লাগছে—কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না। কোনওরকমে গিফ্‌টটা কিনে এনেছি। তুমি গাড়ি নিয়ে বুবুকে সঙ্গে করে ঘুরে এসো। না গেলে ছোড়দা খুব বাজে ভাববে। এই তো, একটু আগে ফোন করেছিল। আমি বলেছি, আমার ভীষণ শরীর খারাপ—তুমি বুবুকে নিয়ে যাচ্ছ...।'

টেলিফোনে আরও কিছুক্ষণ ওজর-আপত্তি চালিয়ে গেল পরমেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমিতার কাছে হার মানল। বলল, 'ঠিক আছে। আমিই বুবুকে নিয়ে যাব'খন।'

ফোন শেষ করে পরমেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

ত্রিযামা জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, স্যার?'

পরমেশ বলল।

সব শুনে ত্রিযামার কোথায় যেন খটকা লাগল। দু-দিন আগেই প্রমিতা আন্টিকে ও ফোন করেছিল। তখন আন্টি বাড়ির ওয়্যারিং পালটানোর কথা বলেছে। বলেছে, কোনও একটা অজুহাতে সুদেব সামন্তকে বাড়িতে ডেকে ফাঁদে ফেলতে হবে। তবে বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ থাকলে সুদেব কিছুতেই ফাঁদে পা দেবে না।

আজ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে স্যারকে আর বুবুকে পাঠানোটা কি সেই ফাঁদ নাকি?

পরমেশ ছাত্রীকে জিগ্যেস করল, 'কী ভাবছ?'

'স্যার, আপনি খুব কেয়ারফুল থাকবেন।'

'কেন?'

'আন্টির হঠাৎ করে কোনও বিপদ হতে পারে...।'

'তার মানে?'

'না, এমনি বললাম। কারণ, ওই ডেঞ্জারাস সিরিয়াল কিলারটা এখনও ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...।'

'হুঁ—' আনমনে বলল পরমেশ।

'আমি আপনার ঘরে এখন বসে থাকলে কোনও অসুবিধে আছে?'

পরমেশ চমকে ওর দিকে তাকাল।

সত্যি, চব্বিশের সাহস বাহান্নর পরমেশের নেই।

বন্দোবস্ত সব শেষ। এবার আসল কাজ শুরু।

নাটকের সেট সাজানোর পর শিল্পনির্দেশক আর পরিচালক যেভাবে সেটটাকে জরিপ করে, নাটক শুরু করার আগে যেভাবে শেষবারের মতো দেখে নেয়, প্রমিতা দত্তগুপ্ত ঠিক সেইভাবে ব্যাপারটা জরিপ করতে লাগল। মেঝেতে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে একমনে দেখতে লাগল।

প্রমিতার বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজছিল। ওর শরীরের প্রতিটি রেণুকণা সেই তরঙ্গ অনুভব করতে পারছিল।

সুচরিতার ফটোর দিকে একবার তাকাল। মনে-মনে বলল, 'রিতু, তুই আমার পাশে থাকিস কিন্তু...।'

'অবশ্যই থাকব, মাম—!'

গোটা বাড়িতে প্রমিতা একা—সেই রবিবারটায় রিতু যেমন একা ছিল।

ড্রইংরুমের দেওয়ালের ভরসা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রমিতা। মাথায় হাত বুলিয়ে নিল কয়েকবার। একটু যেন ক্লান্ত লাগছে।

ক্লান্ত লাগারই কথা। পরমেশ আর বুবু ছোট দেওরের বাড়ি রওনা হয়ে যাওয়ার পর রুপিকে ছুটি দিয়েছে ও। মেয়েটা বেশ কিছুদিন ধরেই নারকেলডাঙায় ওর মাসির সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলছিল। মাসির হাত দিয়ে দেশে মায়ের কাছে টাকা পাঠাবে। ওর হাতে পঞ্চাশটা টাকা বকশিশ দিয়ে প্রমিতা বলেছে, তাড়াহুড়ো করে ফেরার দরকার নেই। দাদারা খাওয়া-দাওয়া করে ফিরবে। সুতরাং রুপি রাত দশটার মধ্যে ফিরলেই হবে। তবে ওর মেসো যেন ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়।

রুপি বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রমিতা প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে সবকিছু পরিপাটি করে সাজিয়েছে। কারণ, আজ সুদেব সামন্ত আসবে। আসবেই।

পরমেশ যখন সায়েন্স কলেজে তখন সুদেব সামন্তকে মোবাইলে ফোন করেছিল প্রমিতা।

ও-প্রান্তে সুদেব 'হ্যালো' বলতেই প্রমিতা বলেছে, 'কে, সুদেববাবু বলছেন?'

'হ্যাঁ—।'

'আমি প্রমিতা বউদি বলছি—প্রফেসর দত্তগুপ্তের বাড়ি থেকে।'

'হ্যাঁ, বউদি, বলুন।'

'আপনাকে সেই ওয়্যারিংগুলো চেঞ্জ করার কথা বলেছিলাম না—ওগুলো চেক

pathagar.net

করার জন্যে আজ সন্ধেবেলা একবার আসতে পারবেন?'

'সন্ধেবেলা? কখন?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চেয়েছে সুদেব।

'এই ধরুন সাড়ে সাতটা কি আটটা নাগাদ। আজ সাতটা নাগাদ আপনার দাদা ছেলেকে নিয়ে একটা নেমন্তন্নে যাবে। ফিরতে রাত হবে। তাই ভাবছিলাম, যদি সেসময়ে আপনি আসতে পারতেন তা হলে গ্রিলি ওয়্যারিংগুলো চেক করতে পারতেন। আপনার কাজের সুবিধে হত। নইলে আমার ছেলেটা যা দস্যি! ও থাকলে আপনাকে একেবারে হয়রান করে ছাড়বে। ওয়্যারিং চেক করা মাথায় উঠবে।'

সুদেবের বুক উত্তেজনায় ঢিপঢিপ করে উঠেছে। আজ সন্ধেবেলা সুদেবের নেমন্তন্ন—প্রমিতা বউদির কাছে। স্বামী থাকবে না। ছেলে থাকবে না। বাকি রইল কাজের মেয়েটা। তবে বউদি যখন নেমন্তন্ন করছে তখন নিশ্চয়ই ওই মেয়েটার একটা বন্দোবস্ত করবে।

সুদেব মনে-মনে থাবা চাটতে শুরু করল। ফোনে বলল, 'নিশ্চয়ই যাব, বউদি।'

প্রমিতা বলল, 'ওরা বেরিয়ে গেলে আমি আপনাকে ফোন করে দেব।'

'ও. কে., বউদি।'

ফোন কেটে দিল প্রমিতা।

সঙ্গে-সঙ্গে ওর শাড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান টের পেল। চমকে ফিরে তাকাল।

যা ভেবেছে তাই। বুবু। বাথরুমে গিয়েছিল। কখন ফিরে এসেছে কে জানে!

'মাম, আমাকে তুমি দস্যি বললে কেন?' অনুযোগ করে জানতে চাইল বুবু।

ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমু খেল প্রমিতা : 'তুমি দস্যি কে বলেছে? তুমি তো লক্ষ্মীছেলে—লক্ষ্মী বুবু আমার....।'

'না, তুমি এইমাত্র ফোনে কাকে বললে....।' বুবু ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

অনেক আদর-টাদর করে শেষ পর্যন্ত ওকে শান্ত করেছিল প্রমিতা। যদিও মনে-মনে ও তখন ভাবছিল, পরমেশরা বেরিয়ে গেলে ঠিক কীভাবে ও ঘরগুলো সাজাবে।

দোতলায় আর-একবার গেল প্রমিতা। ছাদের দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ করা আছে কিনা দেখল। তারপর সুচরিতার ঘরে ঢুকল। আলো জ্বালল। চারপাশে একঝলক নজর বুলিয়ে নিল। বিছানার তোশকের মাঝামাঝি জায়গাটা টেনে তুলল। খাটের কিনারা থেকে ফুটদুয়েক দূরে একটা চপার শোয়ানো রয়েছে।

রান্নাঘর থেকে অস্ত্রটা এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে ও। সুদেব সামন্ত যদি দোতলায় রিতুর ঘরে ওকে নিয়ে এসে কিছু করতে চায় তা হলে প্রমিতা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

কিন্তু অস্ত্রটা দেখামাত্রই প্রমিতার বুক ধড়ফড় করে উঠল। গলার কাছে শক্ত একটা ডেলা জাঁকিয়ে বসল। ও ভালো করেই বুঝল, মনে-মনে ভাবা এক জিনিস,

আর কাজে করা আর-এক জিনিস।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রমিতা। যেন চপারটার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

নীচে এসে রান্নাঘর, বাথরুম জরিপ করে দেখল। তারপর শোওয়ার ঘর, ড্রইং-ডাইনিংরুম, ডাইনিং টেবিল, সব।

না, কোথাও কোনও ভুল নেই।

শোওয়ার ঘরের বিছানার তোশকের নীচে লুকোনো রয়েছে একটা লম্বা ছুরি। যদি সুদেব সামন্ত একতলার বেডরুমটা ব্যবহার করতে চায় তা হলে সেখানেও রেহাই নেই। প্রমিতা ওকে অবাক করে দেবে। ক্ষিপ্র মুঠোয় চেপে ধরবে ছুরির হাতল। তারপর বাতাস চিরে সুদেবকে চিরে ফেলবে।

খতম।

কিন্তু পারবে তো?

ডাইনিং টেবিলে থালা, গ্লাস, বাটি আর প্লেট সাজানো। আর তার পাশেই নীলচে কাচের গ্লাসে দু-গ্লাস জল—প্লেট দিয়ে ঢাকা। যদি কারও জল তেষ্টা পায়।

ঠোঁটের কোণে হাসল প্রমিতা। কত দিকেই না ও খেয়াল রেখেছে!

বাড়ির সব ঘরে এখন আলো জ্বলছে। উৎসবের রাতের আলোকসজ্জা। না, সুদেব সামন্তের আপ্যায়নে কোনও আয়োজনেরই ফাঁক রাখেনি প্রমিতা।

তৃপ্তির একটা নিশ্বাস ফেলল ও। তারপর বেডরুমে এসে বিছানা থেকে মোবাইল ফোন তুলে নিল। সুদেব সামন্তর নম্বর ডায়াল করল।

'হ্যালো—।' সুদেব।

'আমি—আমি প্রমিতা বউদি বলছি।'

'বলুন, বউদি।'

'আধঘণ্টা হল ওরা বেরিয়ে গেছে। আপনি এখন আসতে পারেন...।'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি—' চাপা গলায় কথাটা বলেই ফোন ছেড়ে দিল সুদেব।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রমিতা পোশাক বদলাতে শুরু করল।

পরনের শাড়ি আর ব্লাউজ খুলে ফেলল। ওগুলো দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল খাট আর দেওয়ালের ফাঁকে। তারপর চটপটে ভঙ্গিতে বিছানায় ভাঁজ করে রাখা একটা ম্যাক্সি তুলে নিল। মাথায় গলিয়ে ওটা পরে ফেলল। নীল আর কালো নকশা কাটা ঝকঝকে ম্যাক্সি। প্রমিতার বয়েস অনেকটা কমে গেল।

দ্রুত পা ফেলে চলে গেল আয়নার কাছে। মাথার চুলে ক্ষিপ্র হাতে চিরুনি চালাল। আয়নায় নিজেকে দু-পলক দেখল। তারপর পারফিউমের শিশি নিয়ে পাগলের মতো স্প্রে করল শরীরে।

pathagar.net

হঠাৎ করে নিজেকে কলস উদ্ভিদ বলে মনে হল প্রমিতার। খিদের লালা গায়ে মেখে চুপটি করে বসে আছে পোকামাকড় ছুটে আসতে আর দেরি নেই।

ডাইনিংরুমে এসে এক-দুই-তিন গুনতে লাগল। অপেক্ষা করতে লাগল। মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে-টিপে পরমেশের নম্বর দেখল, ত্রিযামার নম্বর দেখল, কী ভেবে রাজতনু চ্যাটার্জির নম্বরটাও দেখে নিল। তারপর তিনটে নম্বরই পরপর ডায়াল করে রিং বাজার আগেই চট করে লাইন কেটে দিল। তাতে ওর ফোনে 'ডায়াল্‌ড নাম্বার'-এর লিস্টে এই নম্বর তিনটে সবচেয়ে আগে এসে পড়ল।

নম্বরগুলো তৈরি থাক। যদি বিপজ্জনক কোনও মুহূর্তে ওদের কাউকে ফোন করার দরকার পড়ে!

টেনশান কাটাতে একটা ডাইনিং চেয়ারে বসে পড়ল প্রমিতা। মোবাইল ফোনটা ডাইনিং টেবিলে রেখে দিল।

সবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে কি ফেলেনি, দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল।

শত্রু এসে গেছে !

তেইশ

দরজা খুলেই একটা ধাক্কা খেল প্রমিতা। সত্যি, সুদেব সামন্তকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, ধাক্কা খাওয়ারই মতো।

ভীষণ সেজে এসেছে ও। ওর হাতের নাইলনের থলেটা সাজগোজের সঙ্গে ভীষণ বেমানান লাগছে।

সরু-মোটা স্ট্রাইপ দেওয়া গাঢ় সবুজ রঙের প্যান্ট। তার ওপরে ঘিয়ে আর হলুদ রঙে ছোপানো শার্ট। রঙিন জমিতে লতা-পাতা-ফুল আঁকা। ওর আস্তানায় তল্লাশি চালাতে গিয়ে ব্রিফকেসের মধ্যে এই শৌখিন পোশাকটাই দেখেছিল প্রমিতা।

শীত আজ ততটা নেই। তাই সুদেবের গায়ে শীতের পোশাকের কোনও বালাই নেই।

প্রমিতাকে দেখামাত্রই হাসল সুদেব। তারপর দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল। নাইটল্যাচ আটকে যাওয়ার 'ক্লিক' শব্দ হল।

সুদেবকে লক্ষ করছিল প্রমিতা। ওর বুক দুরুদুরু করছিল। অথচ সুদেবকে দেখে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না ও।

সুদেবের মাথায় তেল-চকচকে কালো কোঁকড়া চুল। ফরসা মুখ আরও ফরসা লাগছে। হালকাভাবে পাউডারের গন্ধ পেল প্রমিতা।

'আসুন—ভেতরে আসুন।' ওকে ডাকল।

ভেতরে তো যাবই। যতটা ভেতরে যাওয়া যায়। প্রথমে ঘরের ভেতরে, তারপর তোমার ভেতরে। মনে-মনে বলল সুদেব।

'বসুন—' ডাইনিং চেয়ারের দিকে ইশারা করে বলল, 'আগে আপনাকে একটু চা করে দিই...।'

চা খেয়ে সময় নষ্ট! পাগল!

'না, না, বউদি। আগে কাজ-টাজ সেরে নিই, পরে চা খাওয়া যাবে।' আপত্তি করে সুদেব বলল। যন্ত্রপাতির থলেটা ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রাখল।

প্রমিতা বুঝল। ঘন-ঘন শ্বাস ফেলল। ওর বুকটা কেমন যেন দম-চাপা লাগছে। একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'তা হলে চলুন, দোতলার ওয়্যারিং-এর অবস্থাটা একবার দেখে নিন...।'

ইলেকট্রিক মিস্তিরি হিসেবে সুদেবের একবার মনে হয়েছিল মেন সুইচ আর মেন লাইন থেকে চেকিং-এর কাজটা শুরু করা দরকার। কিন্তু সিঁড়িকে একপলক তাকিয়েই ও বুঝল, ওয়্যারিংগুলোর অবস্থা ঠিক ততটা খারাপ নয় যে, একেবারে বদলে ফেলতে হবে।

তা হলে প্রমিতা ওকে ডেকে পাঠাল কেন? বাড়িতে যখন ও একা?

pathagar.net

এটা কি প্রেম? নাকি ফস্টিনস্টির প্রথম ধাপ?

নাকি একটা ফাঁদ—সুদেবের জন্য?

আবার এও হতে পারে প্রমিতা ওয়্যারিং-এর অবস্থা না বুঝেই ওকে ডেকেছে।

দুত্তোর! নিকুচি করেছে! কারণ যা-ই হোক, এ-সুযোগ সুদেব ছাড়ছে না। ছাড়ার কোনও মানে হয় না।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে প্রমিতার পিছু-পিছু দোতলায় উঠতে লাগল। ওঠার সময় পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল আর প্রমিতার পিছনে ওর চোখ আটকে যাচ্ছিল। সেটা নিয়ে নানান ভঙ্গি কল্পনা করে ওর চোখ দিয়ে লালা ঝরছিল।

দোতলায় এসে রিতুর ঘর খুলল প্রমিতা। আলো জ্বালল। 'আসুন—' বলে ঘরের ভেতরে ঢুকল।

সুদেবও ঢুকল পিছন-পিছন। ও মনে-মনে হিসেব করে দেখল, প্রমিতার শরীর থেকে ওর উত্তপ্ত শরীর মাত্র ছ'ইঞ্চি মতন দূরে রয়েছে।

ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ওয়্যারিংগুলো দেখল। না, ওগুলোর অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয়। তারগুলোকে অনুসরণ করে সুইচবোর্ডে চলে এল সুদেবের চোখ। প্রমিতাকে পাশ কাটিয়ে বোর্ডটার কাছে চলে গেল। ওটাকে বিনা কারণে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আর দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগল।

তারপর—প্রায় দশ-পনেরো সেকেন্ড পর—সুইচবোর্ডটাকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে-করতেই প্রমিতাকে ডাকল : 'বউদি, এদিকে একবার দেখে যান...।'

প্রমিতা ওর ডাক অমান্য করল না। ধীরে-ধীরে পা ফেলে সুদেবের দিকে এগোল। বুকের ভেতরে বাজ পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। দু-কানে অসহ্য উত্তাপ।

প্রমিতা পাশে এসে দাঁড়াতেই সুদেব ওকে বলল, 'বউদি, এই প্লাগ সকেটের ভেতরটায় উঁকি মেরে একবার দেখুন। ওই যে...দেখুন, আর্থ পিনের সকেটের ভেতরের পাতগুলো কেমন গলে গেছে...।'

প্রমিতাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে ওর শরীর ঘেঁষে দাঁড়াল সুদেব। পিছন থেকে প্রমিতার দু-বাহু চেপে ধরল, বলল, 'দেখতে পাচ্ছেন?'

সুদেবের স্পর্শে চমকে উঠল প্রমিতা। লোকটার হাতের তালু দুটো কী গরম! যেন জ্বর হয়েছে।

সুদেবের কামজর্জর নিশ্বাস প্রমিতার ডান কানে এসে পড়ছিল। আর একইসঙ্গে সুদেবের শরীরটা লেপটে গেল ওর পিছনে—বাঁকে-বাঁকে মিশে গেল। সুদেব ঠোঁট নামিয়ে প্রমিতার গলার খাঁজে রাখল।

প্রমিতার দম আটকে আসছিল। অনেক কষ্ট করে জড়ানো গলায় ও বলল, 'না...না...।'

'কেন?' ওর কাঁধে ঠোঁট ঘষতে-ঘষতে পশু জানতে চাইল।

'এখানে...না। নীচে...।'

প্রমিতা খুব দ্রুত চিন্তা করছিল।

ছল-ছলনা করে ও বাঘকে জাগিয়ে তুলেছে। প্রতিশোধের তাড়নায় প্রবল ঝুঁকি নিয়েছে। ভেবেছে বাঘ যখন ওকে খাবে তখন ও বাঘের গলার নলি কেটে দিয়ে বাঘকে চমকে দেবে। বুঝিয়ে দেবে, কেউই অজেয় নয়। তখন রিতু আবার হাসবে। বলবে, 'ফ্যান্টাস্টিক, মাম, ফ্যান্টাস্টিক!' জয়ের জন্য প্রমিতাকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে।

কিন্তু এখন...কাজে নেমে...বারবার যে হোঁচট খাচ্ছে প্রমিতা! রীতি, নীতি, যুক্তি, সংস্কার ওকে আড়ষ্ট করে তুলছে। মনে হচ্ছে...।

না, অনেক হয়েছে। মনটাকে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকুনি দিয়ে শক্ত করল প্রমিতা। বাজপাখি যখন শালিকের ছানা নখে বিঁধিয়ে নিয়ে যায় তখন মা-শালিক পাগলের মতো বাজপাখির পিছু নেয়। সে কি তখন এই যুক্তি মানে যে, বাজপাখির সঙ্গে লড়াইয়ে সে কোনওদিনই এঁটে উঠবে না? সে কি বোঝে যে, তার যে-ছানাটি শিকারি বাজ নিয়ে গেছে সেটা আর বেঁচে নেই?

চুলোয় যাক রীতি, চুলোয় যাক নীতি, যুক্তি আর সংস্কার। সন্তানহারা মায়ের কাছে এসবের চেয়ে প্রতিশোধ অনেক বড়। প্রতিশোধ বড় মহান।

প্রমিতার মনে তোলপাড় চলছিল। ওর চোয়াল শক্ত হল।

কিন্তু ও কি পারবে চপার চালাতে? সুদেবের শরীরের চাপে ছটফট করতে-করতে ওর হাত কি চপার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে?

প্রমিতার কেন জানি না মনে হল, যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দোতলার চেয়ে একতলাটা বোধহয় বেশি ভালো। সেখানে লম্বা ছুরিটা ছাড়াও আশেপাশে বহু জিনিসপত্র রয়েছে। টেলিফোন রয়েছে, মোবাইল ফোন রয়েছে, ডাইনিং টেবিলে প্লেট-গ্লাস রয়েছে, চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ—আরও কত কী! এতসব জিনিস ওকে বাঁচার কাজে সাহায্য করতেও পারে। যেমন, টেলিফোন হঠাৎ বেজে উঠতে পারে, সুযোগ পেয়ে কোনওরকমে ও মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে দিতে পারে। প্লেট-গ্লাস ভেঙেচুরে ও প্রচণ্ড শব্দ তৈরি করতে পারে, যাতে আশেপাশের বাড়ি থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। টেবিল-চেয়ার উলটে ফেলেও সেই বিপদ-সংকেতের শব্দ তৈরি করা যায়।

এ ছাড়াও একতলায় রয়েছে পালিয়ে বেড়ানোর জায়গা। এমনকী প্রমিতা বাথরুমে ঢুকেও দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে।

এতসব ভেবেই প্রমিতা বলেছিল, 'এখানে...না। নীচে...।'

হঠাৎই একতলায় টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

pathagar.net

প্রমিতা চমকে উঠল। ফোন ধরার নাম করে সুদেবকে কী একটা বলতে গেল, কিন্তু সেটা বলে ওঠার আগেই সুদেব ওকে এক ঝটকায় সামনে ঘুরিয়ে নিয়ে ওর ঠোঁটের ওপরে ঠোঁট চেপে ধরল। প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পিষতে লাগল।

প্রমিতার মুখ থেকে শুধু চাপা 'উঁ-উঁ' শব্দ বেরিয়ে এল। একটা ঘৃণার ঢেউ কোন অতল থেকে পাক খেয়ে ওর গলার কাছে উঠে আসতে লাগল। ওর বমি পেয়ে গেল। একটা 'ওয়াক' গলার ভেতরে তৈরি হলেও ঠোঁটের দরজা খুলে বেরোতে পারছিল না। ওর দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল।

এরপর প্রমিতা যেরকম ভেবেছিল ঠিক তাই হতে লাগল।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখে ওর শরীরটা পাগলের মতো কচলাতে লাগল সুদেব। প্যান্টের শক্ত জায়গাটা প্রমিতার নরম জায়গায় ঘষতে লাগল বারবার।

প্রমিতার ভেতর থেকে একটা কান্না উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু সুচরিতার কথা মনে পড়ায় হঠাৎই কান্নাটা হোঁচট খেল। ভেঙে পড়লে চলবে না।

'আমার সঙ্গে লোকটা এইরকমই করেছিল, মাম।' কাঁদতে-কাঁদতে রিতু বলল, 'আমার মাথাটা জোরে ঠুকে দিয়েছিল দেওয়ালে। তারপর...।'

ফরেনসিক রিপোর্টে এটা জানা গিয়েছিল। সুচরিতার মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন ছিল, আর টেলিফোনের কাছাকাছি দেওয়ালেও সুচরিতার মাথার তেলের ট্রেস পাওয়া গিয়েছিল।

প্রমিতা রিতুর কথা ভাবতে লাগল। ওর কান্নাটা এবার উঠে এল বটে, তবে রিতুর জন্য।

সুদেব প্রমিতার ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরাতেই ও প্রাণভরে শ্বাস নিল। একইসঙ্গে কান্নাটা ও চাপতে চেষ্টা করছিল—যাতে সুদেব ওর মনের ভাবনাটা টের না পায়।

প্রমিতার মুখ থেকে কয়েক টুকরো শব্দ বেরোল শুধু। সুদেব সেগুলোকে কান্নার টুকরো বলে বুঝতে পারল না। কারণ, ও তখন প্রমিতার গালে, গলায়, বুকে মুখ ঘষছে। প্রমিতার চোখের কোণের জল ওর দেখার সময় ছিল না।

টেলিফোন তখনও বেজে চলেছে। প্রমিতা বুঝতে পারছিল ওটা পরমেশের ফোন। কারণ, পরমেশ শুনে গেছে প্রমিতার শরীর খারাপ। আর বরাবরই ও ফোন করলে অনেকক্ষণ ধরে রিং বাজায়, অপেক্ষা করে। প্রমিতাকে হাতের কাজ সেরে এসে ফোন ধরার সময় দেয়।

সুদেব এবার আরও একধাপ এগোল। প্রমিতাকে টেনে নিয়ে গেল রিতুর বিছানার কাছে। এক ধাক্কায় পেড়ে ফেলল বিছানায়।

লোকটার শক্তির আঁচ পাচ্ছিল প্রমিতা। ওকে দেখে ওর শক্তি আন্দাজ করা মুশকিল।

প্রমিতা যে সুদেব সামন্তকে বাধা দেয়নি তার দুটো কারণ ছিল। এক : ও

বুঝতে পারছিল বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই। দুই : বাধা দিলে প্রমিতার পরের কাজগুলো পণ্ড হয়ে যাবে—রিতুর চোখের জল মুছবে না।

না, সুদেব আর সময় নষ্ট করেনি।

প্রমিতার শরীরের অর্ধেকটা এখন চিত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে—বাকিটা শূন্যে ঝুলছে। পায়ের আঙুল মেঝে ছুঁয়ে আছে। ম্যাক্সি উঠে গেছে হাঁটুর ওপরে। নীল-কালো নকশা কাটা ম্যাক্সির নীচে উদ্ধত হয়ে আছে একজোড়া সাতশো পাওয়ারের ডুম...লতিকামাসির মতো। তা হলে নিমন্ত্রণের আর কী বাকি রইল!

প্রমিতা নির্লিপ্তভাবে সুদেবকে দেখছিল। লোকটা পাগল-করা তাড়নায় ছাল ছাড়ানোর মতো করে জামা-প্যান্ট খুলছিল। বিয়ের বিশ বছরে পরমেশের দিকে কখনও এমন সময়ে এভাবে তাকাতে পারেনি প্রমিতা। লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিয়েছে। অথচ এখন কী এক অদ্ভুত নির্লজ্জতায় এই দুশ্চরিত্র খুনিটার দিকে ও তাকিয়ে রয়েছে!

নীচে টেলিফোন বাজছিল তখনও। ধন্য পরমেশের ধৈর্য! ভাবল প্রমিতা।

সুদেব এবার কাজে নামল। লতানে গাছের মতো প্রমিতার শরীর জড়িয়ে ধরল। ঠোঁট আর মুখ ঘষে যত্রতত্র আদর করতে লাগল, আর ম্যাক্সির নীচে হাতে ঢুকিয়ে চঞ্চল হাতে ওর পোশাকের বাঁধন খুলতে লাগল।

সুদেবের থরথর কাঁপুনি টের পাচ্ছিল প্রমিতা। একটা শক্ত ইটের টুকরো ওর শরীরের কোমল জায়গায় বারবার খোঁচা দিচ্ছিল। একই সঙ্গে পাউডার আর ঘামের গন্ধ ঢুকে যাচ্ছিল ওর নাকে।

প্রমিতা হিসেব কষে দেখল, ও যেখানে শুয়ে আছে চপারটা মোটামুটি সেখানেই আছে। তা হলে কী করে প্রমিতা হাত বাড়াবে ওটার দিকে? ওর শরীরের নীচে তোশক, তার নীচে চপার। অসম্ভব।

ও বিছানায় পিঠ ঘষে সরে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সুদেব সামন্তর উৎসাহ আর শক্তি ওকে একচুলও নড়তে দিল না। ও অসহায়ভাবে শুয়ে হেরে যেতে লাগল আর সুদেব জিততে লাগল। লোকটার শরীরের প্রবল ধাক্কায় প্রমিতার শরীরটা ক্রমাগত ওপরদিকে সরে যাচ্ছিল।

রিতুর ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে প্রমিতার কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু বাইরে তার এককণাও প্রকাশ পেল না। ও শুধু রিতুকে বলছিল, 'মা হলে অনেক কিছু সইতে হয় রে...।'

অবশেষে একসময় ঝড় থামল।

প্রমিতা চোখ খুলে তাকিয়ে ছিল বটে, কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না।

সুদেব উঠে দাঁড়াল ওর ওপর থেকে। অনেকক্ষণ পর প্রমিতা বুক ভরে শ্বাস নিল। কনুইয়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসল। বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল ইলেকট্রিক

pathagar.net

মিস্তিরিটার দিকে। আনমনে ব্রা ঠিক করল, এক পায়ের গোড়ালিতে আটকে থাকা প্যান্টি আর-এক পায়ে গলিয়ে টেনে ওপরে তুলল। তারপর ম্যাক্সিটাকে নীচে নামাল, ঠিকঠাক করল।

সুদেবও প্যান্ট পরে নিল। শার্টটা গায়ে দিয়ে বোতাম লাগাতে-লাগাতে বলল, 'বউদি, রাগ করলে নাকি?'

প্রমিতা কোনও কথা না বলে মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। না, ও রাগ করেনি।

সুদেব ওর কাছে চলে এল। গাল টিপে দিল, মাথা ঝুঁকিয়ে চুমু খেল কপালে : 'লক্ষ্মী বউদি আমার...।'

প্রমিতা উঠে দাঁড়াল। গুছিয়ে নেওয়া পোশাক আরও একবার দেখে নিল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে ওর।

তখনই খেয়াল করল, একতলায় টেলিফোনের বাজনা কখন যেন থেমে গেছে।

'এবার নীচে যাই?' নরম গলায় জানতে চাইল প্রমিতা। প্রশ্নের ঢংটা এমন যেন অফিসের ওপরওয়ালার কাছে অনুমতি চাইছে।

প্রমিতা আড়চোখে বিছানার তোশকের দিকে দেখছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে তোশকের তলায় হাত ঢুকিয়ে চপারটার বের করে নিয়ে শয়তানের বাচ্চাটাকে...।

কিন্তু না। ওর হিসেব বলছিল, ওর অস্ত্রসমেত হাতটা সুদেব বুনো জানোয়ারের ক্ষিপ্রতায় ধরে ফেলবে। আবার হারতে হবে প্রমিতাকে।

ও আবার বলল, 'এবার নীচে যাই?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সুদেব সামন্ত, বলল, 'চলো—।'

তখনই প্রমিতার খেয়াল হল, সুদেব ওকে 'তুমি' করে কথা বলছে।

ওরা ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরোল। দরজার চৌকাঠের কাছে এসে প্রমিতা সুচরিতার ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। তারপর সিঁড়ির কাছে এসে শ্লথ পায়ে নামতে শুরু করল।

প্রমিতাকে সামনে রেখে সুদেব পিছন-পিছন নামছিল। নামতে-নামতেই ও হাত বাড়িয়ে প্রমিতার গাল-গলায় আলতো করে আঙুল বুলিয়ে আদর করছিল। মনের ফুর্তি ও যেন কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারছিল না। বউদি আজ ওর সত্যিকারের প্রেমিকা হয়ে উঠল। এবার থেকে শরীর যখন জেগে উঠবে তখন বউদির কাছে চলে এলেই হবে। খারাপ পাড়ার চেয়ে এটা ঢের ভালো।

নীচে এসেই ডাইনিং টেবিলের কাছে চলে এল প্রমিতা। মোবাইল ফোনটা হাতে তুলে নিল। হয়তো পরমেশের 'মিস্‌ড কল' থাকতে পারে।

মোবাইলের বোতাম টিপল।

প্রথমেই ত্রিযামার মিস্‌ড কল। তার ঠিক আগেই পরমেশ।

না, মোবাইলের রিং দোতলা থেকে শুনতে পায়নি প্রমিতা।

এখন যে কী করা উচিত সে-কথাই ভাবছিল, হঠাৎই সুদেব সামন্ত ওর পাশটিতে এসে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে ওর চুলের গন্ধ শুঁকে বলল, 'বউদি, এবার আমি যাই?'

'না, না!' প্রায় আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল প্রমিতা। সুদেব চলে গেলে আজকের সব আয়োজন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। তাই খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো করে ও বলল, 'পরমেশের আসতে এখনও দেরি আছে।'

সুদেব একগাল হাসল। প্রমিতাকে আঁকড়ে ধরে গালে একটু চুমু খেয়ে বলল, 'এইজন্যেই বলেছিলাম, লক্ষ্মী বউদি—।'

প্রমিতার বুকের ভেতরে দুরমুশ পড়ছিল। কী করবে এখন? কী করবে?

সাততাড়াতাড়ি সেরকম কিছু আর ভাবতে না পেরে ও বলল, 'আমার হাজব্যান্ড ফোন করেছিল। ওকে একটা ফোন করে দেখি।'

সুদেব কোনও আপত্তি করল না। ওর মনে হল, স্বামীকে ফোন করে প্রমিতা যা প্রাণ চায় বলতে পারে। সুদেবের কথা স্বামীকে বললে প্রমিতারই বিপদ বেশি। প্রফেসারের বউ ইলেকট্রিক মিস্তিরির সঙ্গে পেয়ার-মোহাব্বতে ব্যস্ত এই চাটনিটা পাবলিক দারুণ খাবে।

সুদেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

প্রমিতা ওর দিকে অদ্ভুত চোখে ইশারা করে বলল, 'চলো, আমরা বেডরুমে গিয়ে বসি...।'

কী অদ্ভুত মোলায়েমভাবেই না ও 'তুমি'তে নেমে এল!

মনে-মনে নিজেকে তারিফ করল প্রমিতা। তারপর মোবাইল ফোন কানে চেপে সুদেবের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ওদের শোওয়ার ঘরের দিকে। কারণ, সুদেব এখন ডাইনিং টেবিলের কাছাকাছি থাকুক এটা ওর পছন্দ নয়। তা ছাড়া লম্বা ছুরিটা তো রয়েছে বেডরুমের তোশকের নীচে।

পরমেশকে ডায়াল করেছিল প্রমিতা।

একবার রিং হতেই পরমেশ ফোন ধরল।

'তুমি কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিলে?' প্রমিতা জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ। তুমি কোথায় ছিলে? ল্যান্ডলাইনেও করেছিলাম...।'

সুদেবের দিকে একবার তাকাল। ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে চোখের ইশারায় ওকে বিছানায় বসতে বলল। তারপর : 'শুনতে পাইনি। আমি দোতলায় বিতুর ঘরে শুয়ে ছিলাম...।'

'ও, আচ্ছা—' পরমেশ আশ্বস্ত হল। জিগ্যেস করল, 'এখন শরীর কেমন আছে?'

'জ্বর আসেনি, তবে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।'

'ঠিক আছে। তুমি রেস্ট নাও। খিদে পেলে হালকা কিছু খেয়ে নিয়ো...।'

pathagar.net

'সে নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। তোমাদের নেমন্তন্নের কতদূর?'

'একটু পরেই বোধহয় খেতে বসব। পাপুনটা যা দস্যি হয়েছে না! দস্যু থেকে একেবারে জলদস্যু হয়ে গেছে...।' হেসে বলল পরমেশ।

আরও দু-একটা মামুলি কথার পর ফোন ছেড়ে দিল প্রমিতা। মোবাইলটা বিছানার পাশে দাঁড়ানো খাটো টেবিলের ওপরে রেখে সুদেবের দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই সঙ্গে স্থানাঙ্ক আঁচ করে লম্বা ছুরিটার দিকে একবার তাকাল—মানে, তোশকের ঠিক যে-জায়গার নীচে অস্ত্রটা লুকোনো আছে সেই জায়গাটার দিকে।

পরমেশ মোবাইল ফোনটা পকেটে রাখতেই বুবু বললে উঠল, 'বাপি, পাপুনদাদা যেমন দস্যি, আমিও তেমন দস্যি।'

পরমেশ ওর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, 'না, না—তুমি খুব গুড বয়।'

বুবু চোখ বড়-বড় করে বলল, 'তুমি কিচ্ছু জানো না। আজ মাম আমাকে দস্যি বলেছে...।'

'কখন?' মজা করে জানতে চাইল পরমেশ।

'আজকে সন্ধেবেলা। মাম ফোনে কাকে যেন বলছিল, আমি নাকি দস্যি। আমি বাড়িতে থাকলে ওয়্যারিং চেক হবে না। ওয়্যারিং কী, বাপি?'

পরমেশের মাথায় যেন বাজ পড়ল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঝুঁকে পড়ল ছেলের ওপর। ওর দু-কাঁধ চেপে ধরে জিগ্যেস করল, 'তোর মা কার সঙ্গে কথা বলছিল?'

বুবুর কাঁধ ব্যথা করছিল। ও বলল, 'সে জানি না—। তবে মাম লোকটাকে বলছিল, তুমি আর আমি নেমন্তন্ন খেতে চলে যাব। তারপর লোকটা বাড়িতে এলে সব ঠিকমতো চেক করা যাবে...।'

পরমেশ ঘামতে শুরু করল। বুবুকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু আগেই ফোন বেজে যাচ্ছিল—ল্যান্ডলাইন, মোবাইল...সব।

কিন্তু প্রমিতা তো ওকে সুদেবের ব্যাপারে কিছু বলল না!

তা হলে কি ওই জানোয়ারটা বাড়ির দখল নিয়েছে? ছুরির ডগা দিয়ে প্রমিতাকে শাসন করছে? আবার একটা জন্মদিনে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে?

পরমেশের বুক কেঁপে উঠল। গোল্লায় যাক নেমন্তন্ন! ও বুবুর হাত ধরে টান মারল : 'শিগগির চল—আমাদের এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে।'

চব্বিশ

প্রমিতা সুদেবের সঙ্গে এলোমেলো গল্প করছিল। সুযোগের অপেক্ষায় সময় কাটাতে চাইছিল। সুদেবও সুন্দর একজন বন্ধুর মতো হেসে-হেসে কথা বলছিল। দেখে মনেই হচ্ছিল না ওর ভেতরে অন্য কিছু লুকিয়ে আছে।

প্রমিতা কথা বলতে-বলতে পরমেশেরও সমালোচনা করছিল, যাতে সুদেব খুশি হয়। অথচ ও মনে-মনে তখনও পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ভাবছিল, এভাবে সময় বয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত পরাজয় আর গ্লানি নিয়েই হয়তো বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

সুদেবের খিদে পাচ্ছিল। জলতেষ্টাও। প্রমিতার সঙ্গে এতক্ষণ কাটিয়ে ওর আর মনে হচ্ছিল না যে, এ-বাড়িতে কিছু খাওয়ার পিছনে আর কোনও ঝুঁকি আছে। তবুও সতর্কতা ওর জীবনের অভ্যাস। হয়তো সেইজন্যই প্রমিতা যখন জিগ্যেস করল, 'কিছু খাবে? ফ্রিজে রসমালাই আছে। কাল আমি তৈরি করেছি...দেব?' সুদেব দিব্যি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না—মিষ্টি খেতে আমি খুব একটা ভালোবাসি না...।'

সুদেব আর প্রমিতা বিছানায় কিছুটা দূরত্বে বসেছিল। সুদেব প্রমিতাকে নতুন চোখে দেখছিল। ভাবতেই পারছিল না, কিছুক্ষণ আগে দোতলায় ও প্রমিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছিল। মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে মেয়ের কথাও মনে পড়ছিল সুদেবের। আর একইসঙ্গে ওর শরীরের ভেতরটা পালটাচ্ছিল।

ও হঠাৎই বিছানার ওপরে ঝুঁকে পড়ে প্রমিতার কাছে চলে এল। ওর কোলে মুখ ঘষতে লাগল, ওর শরীরের গন্ধ নিতে লাগল। সেই অবস্থাতেই প্রমিতার গায়ে হাতড়াতে লাগল। ঠিক যেন জলের ওপরে উপুড় হয়ে একটা মানুষ অন্ধভাবে সাঁতার কাটছে।

অনেক চেষ্টা করে প্রমিতা শরীরটাকে কাঠ হতে দিল না। ওর ঘিনঘিনে অনিচ্ছার এককণা সূত্র টের পেলেই স-ব ভেস্তে যাবে—এত পরিকল্পনা, এত আয়োজন সব। বরং প্রমিতা ভাবছিল, কীভাবে ছুরিটা হাতে পাওয়া যায়। ও সুদেবের ক্লান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভাবছিল, সুদেব কখন শ্রান্তিতে এলিয়ে পড়বে, অন্যমনস্ক হবে, প্রমিতাকে সুযোগ করে দেবে।

সুদেবের আদরের তাড়না ক্রমশ বাড়ছিল। নিজের আচরণটা স্বাভাবিক সেটা বোঝানোর জন্য প্রমিতা দক্ষ অভিনেত্রীর মতো সুদেবের আদরের একটু-আধটু উত্তর দিচ্ছিল। আর তাতেই সুদেবের পারা চড়ে গেল দ্রুত। বিছানার ওপরে প্রমিতাকে পেড়ে ফেলে হামলা-হামলি শুরু করে দিল।

pathagar.net

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওদের পোশাক-আশাক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। ওরা লিপ্ত হল। আর উত্তেজনায় পাগল সুদেব ডিজেল ইঞ্জিনের একগুঁয়ে শক্তিতে কাজ করে চলল। ভুতুর চাপা গর্জনের মতো শব্দ ছিটকে বেরোচ্ছিল ওর মুখ দিয়ে। আর মেঝেই একটা হরিণী মুখ বুজে সব সহ্য করছিল।

সুদেবের নীচে প্রমিতার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। কোনওরকমে শ্বাস নিচ্ছিল ও। ভাবছিল, কখন এই জঘন্য ব্যাপারটা শেষ হবে। কখন?

সব যখন শেষ হল তখনও ছুরিটা হাতিয়ে নেওয়া প্রমিতার কল্পনাতেই থেকে গেছে। অসহায় ক্ষোভে ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু কাঁদলে যে চলবে না সে-কথা মরা মেয়েটা ওকে বারবার বলছিল।

প্রমিতা যেন দেখতে পাচ্ছিল, সুচরিতা ওদের লিপ্ত শরীর দুটোকে ঘিরে পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে, লাফাচ্ছে, আর বলছে, 'হাল ছেড়ো না, মাম। ছুরিটা...বিছানার তোশকের নীচে ওই ছুরিটা...আর তা না হলে অন্যকিছু। কিন্তু হাল ছেড়ো না! ছেড়ো না এই জানোয়ারটাকে...প্লিজ, মাম...।'

সুদেব যখন প্রমিতার শরীর থেকে গড়িয়ে নামল তখন প্রমিতার মনে হল, অনেকক্ষণ জলের নীচে ডুবে থাকার পর ও যেন ওপরে ভেসে উঠেছে। হাঁ করে লম্বা-লম্বা শ্বাস নিতে লাগল ও। চারপাশটা কেমন যেন ঝাপসা লাগছে। মাথার ভেতরে সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

সেই অবস্থাতেই প্রমিতার মনে হল, এইবার তো সুদেব সামন্ত চলে যাবে! কী হবে তা হলে?

বিছানায় উঠে বসল প্রমিতা। ঘরের টিউবলাইটটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই লজ্জা আর সঙ্কোচ পেয়ে বসল ওকে। তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে থাকা পোশাক কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে চাপা দিয়ে নেমে দাঁড়াল মেঝেতে। সুদেবের দিকে পিছন ফিরে পোশাক পরে নিল। সুদেব তখন বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে গাঢ় চোখে প্রমিতাকে দেখছে। ওর নির্লিপ্ত ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, ও এ-বাড়ির মালিক—এ-বাড়িতে ও গোপন অতিথি নয়।

মুখ দিয়ে শব্দ করে শ্বাস ছাড়ল সুদেব। মসৃণ গতিতে বিছানা থেকে নেমে জামা-প্যান্ট পরে নিল। এইবার শরীরটা একটু ঝিমঝিম করছে, একটু যেন ক্লান্ত লাগছে।

প্রমিতার কাছে এসে ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরল সুদেব। বলল, 'বউদি, আর দেরি করব না। রাত হয়ে গেছে...দাদাদের ফেরার সময় হয়ে গেছে—।'

হায় চপার! হায় ছুরি!

প্রমিতার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল। সুদেব সামন্ত এবার চলে যাবেই। মেয়েকে আগেই শেষ করেছিল, মাকেও আজ শেষ করে গেল।

প্রমিতার গাল টিপে নাকের ডগায় একটা চুমু খেল সুদেব। ফিসফিস করে বলল, 'আজ আসি—।'

সুদেব শোওয়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। প্রমিতা ওর পিছন-পিছন বেরিয়ে এল। একটা শেষ সুযোগ...একটা শেষ সুযোগ কি কোনওভাবে পাওয়া যাবে না?

প্রমিতা মরিয়া চেষ্টায় ঠোঁটে একচিলতে তৃপ্তির হাসি ছুঁইয়ে রাখল। ওর বুকের ভেতর ধকধকানি বেড়ে উঠল হঠাৎ। ও তাড়াতাড়ি পা ফেলে ডাইনিং টেবিলের কাছে চলে গেল।

'ওঃ, ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে—' বলে একটা জলভরতি গ্লাস তুলে নিল প্রমিতা। ঢাকনাটা বাঁহাতে সরিয়ে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিল। তারপর গ্লাস আর ঢাকনা টেবিলে রেখে তৃপ্তির ছোট্ট শব্দ করল, 'আঃ...।'

সুদেবের দিকে তাকাল প্রমিতা : 'তুমি কি জল খাবে?'

সত্যি, ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছে। ভাবল সুদেব। দু-দুবার মেহনত করার পর বুকের ভেতরটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

প্রমিতা অল্পবয়েসি মেয়ের ঢঙে হাতছানি দিয়ে ডাকল সুদেবকে, 'এই, এখানে এসে বোসো—।' ইশারায় একটা ডাইনিং চেয়ার দেখাল প্রমিতা। হেসে বলল, 'আজ প্রথম এভাবে এলে...একেবারে শুধু মুখে যেতে নেই...।'

সুদেব পায়ে-পায়ে ডাইনিং চেয়ারটায় গিয়ে বসল। প্রমিতা ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'তুমি তো বেশ পটু—।'

সুদেব প্রমিতাকে জাপটে ধরল, জিগ্যেস করল, 'বউদি, কবে আবার হবে? তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

'আমিও। তুমিই প্রথম আমার শরীরটা আমাকে চেনালে...।'

সুদেব প্রমিতার বুকের মাঝে মুখ গুঁজে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'আমি তোমাকে ফোন করব। নাও, এবারে একটু জল খাওয়াও...। একেবারে শুধু মুখে যাব না।'

প্রমিতা ওর কাছ থেকে সামান্য সরে এল। হাত বাড়িয়ে দ্বিতীয় গ্লাসটা তুলে নিল। গ্লাস ঢাকা দেওয়া প্লেটটা সরাতে যাবে, সুদেব আচমকা বলে উঠল, 'তুমি একচুমুক খেয়ে তারপর আমাকে দাও...।'

'কেন?'

'তোমার এঁটো খেতে ইচ্ছে করছে তাই...।'

সুদেবের আসল কারণটা যে প্রমিতা বোঝেনি তা নয়। তা ছাড়া সুদেব যে এমন কিছু বলতে পারে সেটাও বোধহয় ও আঁচ করেছিল। তাই ওর মুখে আহত ভাব ফুটে উঠল না।

pathagar.net

প্লেটের ঢাকনাটা সামান্য সরিয়ে সুদেবের কাছে এল প্রমিতা। হেসে বলল,

‘একচুমুক খেয়েই তোমাকে দিচ্ছি তা হলে...।’

প্লেট সরিয়ে গ্লাসটা মুখের কাছে তুলল প্রমিতা। না, এতে বিষ মেশানো নেই। চুমুক দেওয়ার আগে দেওয়ালে টাঙানো সুচরিতার ফটের দিকে আড়চোখে একবার তাকাল।

ম[illegible] মেয়েটা খুশিতে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘ফ্যান্টাস্টিক, মাম! একেবারে মাস্টার স্ট্রোক!’

সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎঝলকের মতো ঝলসে উঠল প্রমিতার হাত এবং গ্লাসের জলটা ও সরাসরি ছুড়ে ভাসিয়ে দিল সুদেব সামন্তর মুখ।

না, জল নয়—অ্যাসিড। বাথরুম পরিষ্কার করার মিউরিয়্যাটিক অ্যাসিড।

সুদেব যন্ত্রণায় বিকৃত গলায় গর্জে উঠল। চোখে-মুখে হাত চাপা দিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ডাইনিং টেবিল ধরে সামলে নিল। তারপর হিংস্র চিৎকার করে প্রমিতাকে ধরার জন্য সামনে ঝাঁপ দিল।

চোখে ও ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। তা ছাড়া অসহ্য জ্বালায় চোখ খোলাই মুশকিল। কিন্তু বুকের ভেতরে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আক্রোশ ওকে পাগল করে দিল। এই ছেনাল মাগিটার এতবড় সাহস!

তাই অনুমানে ভর করে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অন্ধ সুদেব। এবং প্রমিতার কোমল শরীরটা ও হাতের নাগালে পেয়েও গেল।

অ্যাসিড ছুড়ে দেওয়ার পর থেকে প্রমিতা যেন সিনেমা দেখছিল।

সুদেবের মুখের চামড়া পুড়ে গিয়ে সাদা অংশ বেরিয়ে পড়ছিল। কপালের ওপরদিকে কোঁকড়া চুলের কেশরেখা সরে যাচ্ছিল। ওর মুখটা পলকে ছাল-ওঠা ক্ষতবিক্ষত বিকৃত এক প্রাগৈতিহাসিক দানবের মুখ হয়ে গেল। মুখের চারপাশে কড়া অ্যাসিডের ধোঁয়া। চামড়ার এখানে-সেখানে বুদবুদ। বাতাসে ঝাঁজালো গন্ধ। তার সঙ্গে পোড়া গন্ধও।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিল প্রমিতা। অ্যাসিডের ছোট-বড় ফোঁটা যে ছিটকে এসে ওর শরীরের কোথাও-কোথাও যন্ত্রণার পিন ফোটাচ্ছিল সেদিকে ওর কোনও খেয়ালই ছিল না। বরং মনের মধ্যে আরাম আর তৃপ্তির ঢেউ উথলে উঠছিল। সুচরিতার ফটোর দিকে স্বপ্ন-দেখা মমতা মাখানো চোখে কয়েক পল-অনুপল তাকিয়ে ছিল ও।

ঠিক তখনই সুদেবের হাতের বাঁধনে ও ধরা পড়ল।

প্রমিতা চিৎকার করে ছিটকে পালাতে চাইল। কিন্তু সুদেব ওকে কোমরের কাছে ধরে থাকায় ও টাল খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। সেইসঙ্গে সুদেবও।

প্রাণপণে সুদেবের বাঁধন ছাড়াতে চাইল প্রমিতা। পাগলের মতো বেপরোয়া

হাত-পা ছুড়তে লাগল।

অ্যাসিড প্রমিতার হয়ে কাজ করেছিল। সুদেবের জানোয়ারের মতো শক্তি মানুষের চেয়েও কমে গিয়েছিল এখন। তার সঙ্গে মরিয়া এক মহিলার বেঁচে থাকার জন্য প্রতিরোধ। সব মিলিয়ে সুদেব ঠিকমতো সামাল দিতে পারছিল না। তা সত্ত্বেও ও প্রমিতার শরীরটা আঁকড়ে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল—ওর গলার কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছিল। একবার গলাটা আঁকড়ে ধরতে পারলেই মাগিটাকে ও খতম করে ছাড়বে। তারপর যা হওয়ার হবে।

এমন সময় টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

প্রমিতা পাগলের মতো ঝটাপটি করছিল, ভয়ের চিৎকার করছিল, আর হাতের কাছে লাগসই কিছু একটা খুঁজছিল। সাপের মতো শরীরটা মোচড়াতে-মোচড়াতে হঠাৎই একটা ডাইনিং চেয়ার ওর হাতের নাগালে এল। সুতরাং ও আর দেরি করল না। পায়া ধরে টান মেরে চেয়ারটা কাত করে ফেলল। তারপর কোনওরকমে ওটাকে টেনে নিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে শূন্যে তুলে ধরল। এবং শিলনোড়া দিয়ে আদা থেঁতো করার মতন প্রচণ্ড জোরে বসিয়ে দিল সুদেবের মাথায়—ওর মাথাটা থেঁতো করতে চাইল।

শব্দ হল। কিন্তু সুদেবের মাথা ফাটল কি না বোঝা গেল না।

তবে সুদেবের লড়াই থেমে গেল পলকে। ও দুপাশে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। কিন্তু প্রমিতার ম্যাক্সি খামচে ধরে রইল।

প্রমিতা অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ম্যাক্সির কাপড়ে টান লেগে ফড়ফড় শব্দ হল। বোধহয় কোথাও ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সুদেব ম্যাক্সিটা ধরে এমনভাবে টানছিল যে, প্রমিতা আবার পড়ে যাচ্ছিল।

আর ঝুঁকি নিল না প্রমিতা। দু-হাতে ম্যাক্সির গলার কাছটা ধরে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মারল। ম্যাক্সিটা কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে হাত দুটো ম্যাক্সির বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়েই ছুট লাগাল প্রমিতা। ব্রা আর প্যান্টি পরা অবস্থায় ওকে ভীষণ অদ্ভুত লাগছিল। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার মতো অবস্থা ওর ছিল না।

টেলিফোনের একটানা রিং-এর দিকে গ্রাহ্য না করে ও ছুটে গেল বাথরুমে। সেখানেই অ্যাসিডের বোতলগুলো এককোণে সাজিয়ে রাখা আছে।

ওর ভেতরে প্রতিশোধে পাগল এক মা টগবগ করে ফুটছিল।

দু-হাতে দুটো বোতল নিয়ে ডাইনিং টেবিলের কাছে ফিরে এল। প্রায় একইসঙ্গে বাদামি বোতল দুটোর লম্বাটে মুখ পরস্পরের গায়ে সজোরে ঠুকে দিল।

মুখ দুটো ভেঙে গেল। কাচের টুকরো খসে পড়ল মেঝেতে। ধোঁয়া ওঠা অ্যাসিড চলকে পড়ল—সামান্য ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। প্রমিতার গায়েও। কিন্তু মনের

pathagar.net

জ্বালা ওকে সে-জ্বালা টের পেতে দিল না।

সুদেব তখন মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছিল, ছটফট করছিল। প্রমিতা মুখ ভাঙা অ্যাসিডের বোতল দুটো ওর মাথার ওপরে সোজা উপুড় করে ধরল। গাঢ় অ্যাসিড নিঃশব্দে পড়তে লাগল। অসহ্য জ্বালাপোড়ায় সুদেব এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকাতে লাগল। ধোঁয়া আর ঝাঁজালো গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। সেইসঙ্গে শুরু হল সুদেবের ভয়ঙ্কর চিৎকার। ওর দেহটা মাথা কাটা সাপের মতো পাক খাচ্ছিল, ছটফট করছিল। ওর জামা পুড়ল, চামড়া পুড়ল, চুল খসে গেল, চোখ-মুখ বলেও আর তেমন কিছু রইল না।

প্রমিতা দু-চোখ ভরে ওর মেয়ের খুনিকে দেখছিল। আর একইসঙ্গে ভাবছিল, পরমেশকে লুকিয়ে কীভাবে ও অ্যাসিডকে জলের চেহারা দেওয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে।

গ্লাসে ঢেলে প্রমিতা দেখেছে অ্যাসিডটা অনেকটা তেলের মতো গাঢ়। রং হালকা হলদে। আর তা থেকে ঝাঁজালো ধোঁয়া বেরোয় ক্রমাগত।

এই অ্যাসিড গ্লাসে ঢেলে দিলে সুদেব নিশ্চয়ই সেটাকে জল বলে ভুল করবে না। তখন প্রমিতা গ্লাসের অ্যাসিডে অল্প-অল্প করে জল মিশিয়েছে। তাতে ধোঁয়া বেরোনোটা একসময় বন্ধ হয়েছে, ঝাঁজ কমেছে, আর হলদে রংটা আরও ফিকে হয়েছে।

কিছুটা জল মেশানো অ্যাসিডকে পুরোপুরি জল বলে চালানোর জন্য হালকা নীল রঙের কাচের গ্লাস ব্যবহার করেছে প্রমিতা। গ্লাসে ঢেলে দেখেছে ওটা জল নয় বলে সন্দেহ হয় কি না। যখন ও শতকরা একশো ভাগ সন্তুষ্ট হয়েছে তখনই ও কাজে নেমেছে। ডাইনিং টেবিলে পাশাপাশি দুটো গ্লাস সাজিয়ে রেখেছে—একটায় সত্যিকারের জল, আর অন্যটায় অ্যাসিড।

চপার, ছুরি ইত্যাদি যদি ব্যর্থ হয় তা হলে অ্যাসিড ভরতি গ্লাস দিয়েই শেষ রক্ষা করার চেষ্টা করবে প্রমিতা।

এবং তাই করেছে।

সুদেবের মুখে যে-অ্যাসিড ও ছুড়ে মেরেছিল তা ছিল সামান্য জল মেশানো। কিন্তু সেটা সুদেবকে প্রাথমিকভাবে ঘায়েল করার জন্য যথেষ্ট। তারপর বোতল ভেঙে যে-অ্যাসিড ও সুদেবের গায়ে-মাথায় ঢেলেছে সেটা মারত্মক তীব্র, অবাক করে দেওয়া তার ধ্বংসক্ষমতা।

প্রমিতা ব্রা আর প্যান্টি পরে সেই ধ্বংসলীলা দেখছিল। ওর খেয়াল ছিল না টেলিফোনের বাজনা কখন থেমে গেছে। এও খেয়াল ছিল না, খালি বোতল দুটো ও এখনও সুদেব সামন্তর শরীরের ওপরে উপুড় করে ধরে আছে।

সুদেবের কাতরানি থেমে গিয়েছিল। এক হাতে প্রমিতার ম্যাক্সিটা খামচে ধরে

ওর দেহটা চিত হয়ে পড়েছিল। তবে মুখটা আর চেনা যাচ্ছিল না। গোলাপি আর সাদা মাংসের পিণ্ড ডুমো-ডুমো হয়ে আছে নানা জায়গায়। চোখের জায়গা দুটো প্রায় অন্ধকূপ। একটা চোখের মণি আধগলা হয়ে বাইরে ঝুলে পড়েছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। সেই হাঁ-এর ভেতরে জিভ নড়ছে, আলজিভ নড়ছে। সব মিলিয়ে হরার ছবির এক বীভৎস দৃশ্য।

প্রমিতা থরথর করে কেঁপে উঠল। বোতল দুটো ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার ছুটল বাথরুমের দিকে। ফিরে এল আরও দু-বোতল অ্যাসিড নিয়ে।

ঠোকাঠুকি করে বোতল দুটোর মুখ ভাঙল। তারপর দুটো বোতলের তরল নিষ্ঠুরভাবে ঢেলে দিল সুদেবের প্যান্টের চেনের ওপরে।

সুদেবের শরীরটা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ঝটকা দিয়ে উঠল। তারপর দুটো হাত চেনের ওপরে চেপে ধরে কাটা ছাগলের মতো শরীরটাকে মোচড়াতে লাগল। একটা ফ্যাঁসফেঁসে চাপা গর্জন ওর হাঁ করা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। নরকের প্রেতাত্মার আর্তনাদের মতো সেই রক্ত-হিম-করা গর্জন কিছুতেই থামছিল না।

প্রমিতা দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরল। মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়বে। হাত ছেড়ে দিয়ে দুপাশে মাথা ঝাঁকাল ও। তারপর রুদ্ধশ্বাসে আবার দৌড়ল বাথরুমের দিকে।

বাথরুমে ঢুকে চটপট শাওয়ারের কল খুলে দিল প্রমিতা। তারপর শাওয়ারের ঝরনা-জলের নীচে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে ভিজতে লাগল। ওর শরীরের সমস্ত ক্লেদ, গ্লানি, আর ক্লান্তি ধুয়ে যেতে লাগল। জলের ঝিরঝির শব্দ ওর কানে আনন্দের গান হয়ে বাজতে লাগল।

অনেক—অনেকক্ষণ পর শাওয়ার বন্ধ করল প্রমিতা।

ড্রইং-ডাইনিং-এ বেরিয়ে এসে সুদেবের পড়ে থাকা দেহটাকে একবার দেখল। তারপর শোওয়ার ঘরে ঢুকে খাটো টেবিলের ওপরে রাখা মোবাইল ফোনটা তুলে নিল।

প্রমিতার চুল বেয়ে জল ঝরছিল। গা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। ঘরের মেঝে ভিজে গিয়ে জল জমছিল।

পরমেশের নম্বরটা ডায়াল করতেই প্রমিতার কান্না পেয়ে গেল। বুকের ভেতর থেকে একটা কান্নার ঢেউ সুনামির জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতায় বেরিয়ে এল বাইরে। প্রমিতা কাঁদতে-কাঁদতে বসে পড়ল মেঝেতে। তখন ও-প্রান্তে রিং বাজছিল।

দুবার রিং বাজতে-না-বাজতেই ফোন ধরল পরমেশ।

'হ্যালো, প্রমি—। আমি তোমাকে ল্যান্ডলাইনে ফোন করেছিলাম...।'

প্রমিতা হাউহাউ করে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেসে গেল।

'কী হয়েছে, প্রমি? কী হয়েছে?'

pathagar.net

কোনওরকমে কান্নার দমক থামিয়ে প্রমিতা বলল, 'লোকটাকে...লোকটাকে...আমি... আমি...শেষ করে দিয়েছি। শেষ...শেষ...।' আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল প্রমিতা।

'কোন লোকটাকে? কোন লোকটাকে?' মনে-মনে বুঝতে পারলেও প্রমিতার মুখ থেকে নামটা শুনে নিশ্চিত হতে চাইছিল পরমেশ।

'সুদেব,' কাঁদতে-কাঁদতে বলল প্রমিতা, 'সুদেব সামন্ত...।'

পরমেশের বুকের ভেতরে পাথর ভাঙা শুরু হয়ে গেল। ওই সাংঘাতিক খুনিটাকে শেষ করে দিয়েছে প্রমিতা? কী করে?

'তুমি একটুও চিন্তা কোরো না। আমি বাড়ির কাছে এসে গেছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। জাস্ট পাঁচ মিনিট...।

পরমেশ ফোন ছেড়ে দেওয়ার পরেও প্রমিতা মেঝেতে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর হাত বাড়িয়ে বিছানার চাদরটা টেনে নিল। ওটা কোনওরকমে গায়ে জড়িয়ে নিল। ওর শীত করছিল, হাত-পা কাঁপছিল থরথর করে। কিন্তু সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে ও সুচরিতার সঙ্গে গল্প শুরু করল।

এতক্ষণ ধরে ও দেখছিল, রিতু ড্রইং-ডাইনিং স্পেস-এর সর্বত্র ছুটোছুটি করছিল। এখন মেয়েটা আনন্দে পাগল। হা-হা করে অট্টহাসি হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে। বলছে, 'মাম, মাম, তোমার জবাব নেই। আই লাভ য়ু, মাম।'

প্রমিতা বিড়বিড় করে বলল, 'তুই আমার সব, রিতু। তুই আমার সব...।' তারপর ওর সঙ্গে হালকা মনে গল্প করতে লাগল।

প্রমিতা খেয়াল করেনি, কখন যেন কলিংবেল বেজে উঠল আর দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুরু হল। তার দু-পাঁচ মিনিট পরেই নাইটল্যাচে চাবি ঘোরাল কে যেন। দরজা খোলার শব্দ হল।

তারপরই শোনা গেল, প্রায় বিশ বছরের চেনা গলায় একটা লোক 'প্রমি, প্রমি—' বলে ডেকে উঠল। অন্যান্য লোকজনের কথাবার্তা কানে এল। আর একটা বাচ্চা ছেলে চিৎকার করে বলে উঠল, 'মাম, মাম, আমরা এসে গেছি...। তুমি কোথায়?'

প্রমিতা বিড়বিড় করে বলল, 'তোর দিদির সঙ্গে গল্প করছি—।'

তখনই ওরা বোধহয় মেঝেতে পড়ে থাকা সুদেব সামন্তকে দেখতে পেল। কারণ, ছেলের ভয়ের চিৎকার প্রমিতার কানে এল।